# বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত মাহাত্ম্য-কাহিনিমূলক গ্রন্থ: শিল্পরূপ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা

**পিএইচ.ডি (কলা) উপাধি লাভের জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ**

গবেষক: রত্নমালা নস্কর

২০২৪

তত্ত্বাবধায়ক
শেখর কুমার সমাদ্দার
অধ্যাপক

বাংলা বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা-৭০০০৩২

## Certified That The Thesis Entitled

**‘বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত মাহাত্ম্য-কাহিনিমূলক গ্রন্থ: শিল্পরূপ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা’** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of **Dr. Sekhar Kumar Sammaddar** and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

Countersigned by the Supervisor: Candidate:

**Dr. Sekhar Kumar Sammaddar** **Ratnamala Naskar**

Dated: Dated:

# সূচিপত্র


**প্রাক্‌কথন** **পৃষ্ঠা**

**ভূমিকা** **১-৯**

**প্রথম অধ্যায়: বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গ** **১০-৪৭**

১.ক. গ্রন্থ পরিচয়

১.খ. গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য

১.গ. গ্রন্থ সমূহের নামকরণ প্রসঙ্গ

১.ঘ. কবি প্রসঙ্গ

১.ঙ. পূর্বসূরির রচনা প্রসঙ্গ

১.চ. গ্রন্থের ভাষা ও ছন্দ

**দ্বিতীয় অধ্যায়: পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি, চরিত্র ও শিল্পগুণ বিশ্লেষণ** **৪৮-১২৩**

২.ক. *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ

২.খ. *পীর গোরাচাঁদ* গ্রন্থের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ

২.গ. বনবিবির কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ

২.ঘ. সত্যপিরের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ

২.ঙ. লোকদেবতাকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনির পরিবেশনগত দিক

**তৃতীয় অধ্যায়: মধ্যযুগের লিখিত গ্রন্থ, মান্যসাহিত্য ও বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিমূলক গ্রন্থের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ** **১২৪-১৮৮**

৩.ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য ও পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনি

৩.খ. বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনি ও মঙ্গলকাব্য

৩.গ. মুসলমান কবির লেখা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিতে রামায়ণ, মহাভারত, চরিত সাহিত্য, পুরাণের প্রভাব ও ইতিহাস অনুসন্ধান

৩.ঘ. *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* ও নাথ সাহিত্য

৩.ঙ. কবিগান ও পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক পালাগান

৩.চ. মান্য সাহিত্যের নিরিখে কেচ্ছা-কাহিনিগুলির পর্যালোচনা

৩.ছ. রূপকথা ও পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক সাহিত্য

**চতুর্থ অধ্যায়: পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার সমাজচিত্র** **১৮৯-২২০**

৪.ক. *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র সমাজচিত্র

৪.খ. বনবিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গ্রন্থে সমাজচিত্র

৪.গ. খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর গ্রন্থে সমাজচিত্র

৪.ঘ. সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিতে সমাজচিত্র

**পঞ্চম অধ্যায়: বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত মাহাত্ম্য-কাহিনি: কাব্যগুণ বিশ্লেষণ** **২২১-২৬৭**

৫.ক. ভাষা, ছন্দ এবং বৈয়াকরণিক পর্যালোচনা

৫.খ. আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশের ইতিহাস এবং বাংলা ভাষায় তা ব্যবহারের ব্যাপকতা

৫.গ. উপমা অলংকার প্রয়োগ

৫.ঘ. প্রবাদের ব্যবহার

**উপসংহার** **২৬৮-২৭১**

**পরিশিষ্ট: শব্দার্থ** **২৭২-২৭৭**

**গ্রন্থপঞ্জি:** **২৭৮-২৮৩**

মুখ্য গ্রন্থপঞ্জি

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

**পত্রিকাপঞ্জি:**

মুখ্য পত্রিকাপঞ্জি

সহায়ক পত্রিকাপঞ্জি

বৈদ্যুতিন তথ্য **২৮৪-২৮৭**

সাক্ষাৎকার **২৮৮**

সহায়ক গবেষণাপত্র **২৮৯**

**চিত্র সূচি** **২৯০-২৯৩**

**চিত্রপঞ্জি:**

চিত্র- ১ পালাগায়কের দল (আটঘরা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২০১৭)

চিত্র- ২ পালাগায়ক সুধীনকুমার মণ্ডল (দেবপ্রসাদ ঘোষের গৃহ প্রাঙ্গণ, আটঘরা)

চিত্র- ৩ সত্যপিরের থান (আরামবাগ- পিরতলা, হুগলি)

চিত্র- ৪ সত্যপিরের নামে মাঙ্গন (আরামবাগ, হুগলি)

চিত্র- ৫ মাথায় সত্যপিরের চামর ঠেকিয়ে আশীর্বাদ (আরামবাগ, হুগলি)

চিত্র- ৬ নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের বারা মূর্তি (বেগমপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)

চিত্র- ৭ নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের পুজো (বেগমপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)

**চিত্রপঞ্জির তথ্যসূত্র** **২৯৪**

# সংকেত সূচি

অস. ক্রি.- অসমাপিকা ক্রিয়া

আ.- আরবি

হি.- হিন্দি

ইং.– ইংরেজি

উ.– উর্দু

কৃৎ.- কৃৎপ্রত্যয়

ক্রি. বি.- ক্রিয়া বিশেষ্য

ক্রি. বিণ.- ক্রিয়া বিশেষণ

তৎ.- তৎপুরুষ

তদ্.- তদ্ভব

প্রকা.- প্রকাশক

পৃ.- পৃষ্ঠা

ফা.- ফারসি

বাং.- বাংলা

বি.- বিশেষ্য

বিণ.- বিশেষণ

সর্ব. - সর্বনাম

সমা. ক্রি – সমাপিকা ক্রিয়া

সম্পা.- সম্পাদক

সং. – সংস্কৃত

# প্রাক্‌কথন

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে একাধিক লৌকিক দেবদেবীকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনি জনগণের মধ্যে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের ধর্মপিপাসা ও কাব্যজিজ্ঞাসা মেটাবার জন্যে কবিগণ নবীন দেবতার মাহাত্ম্য-পাঁচালি রচনা করতে শুরু করেন। সেখানে ধর্মীয় ভাবনার বেড়াজাল অনেকটা শিথিল হয়ে আসে। কবিদের মধ্যে দেবদেবীর অলৌকিকতা সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে সামনে আসে। সেগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারের উদ্যোগও দেখা দেয়। ছাপাখানা বিস্তার লাভের পর লোকদেবতাকেন্দ্রিক পাঁচালিগুলি মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। বনবিবির 'জহুরা-নামা' নিয়ে তিনজন কবি যেমন- বয়নুদ্দীন, মোহম্মদ খাতের ও আব্দুর রহিম সাহেবের জনপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়।

আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-র ভাষা ও বিষয়বস্তু বিচার করলে গ্রন্থটিকে সমকালীন সমাজের দলিল বলা যেতে পারে। প্রকাশকের বর্ণনা অনুসারে উনিশ শতকের শেষদশকের রচনা। এই গ্রন্থটির বৈয়াকরণিক পর্যালোচনা করেছি এম.ফিল পড়াকালীন অধ্যাপক মহীদাস স্যারের কাছে বাংলা ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখায়। এর ভাষা ও বিষয় বৈচিত্র্য পাঠ করে আমি কৌতূহলী হই এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুত করার কথা ভাবি এবং আমার গবেষণা পরিচালক স্বতঃস্ফূর্ততার সঙ্গে অনুমোদন করেন। পরে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনির প্রতি আগ্রহী হই এবং সংগ্রহে তৎপর হই।

বিষয়টি নিয়ে গবেষণার চিন্তা মাথায় এলে বিলুপ্তপ্রায় গ্রন্থগুলি সংগ্রহে অগ্রসর হই। আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* (১৩৯৩), মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৪ ও ১৪১৬), আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩), খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ* (প্রকাশকাল-অজ্ঞাত) এবং সত্যপিরের বেশকিছু মাহাত্ম্য-কাহিনি প্রথমে সংগ্রহ করি।

*দীপন* পত্রিকায় (পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, অক্টোবর ২০১২) সত্যপিরকেন্দ্রিক বেশ কিছু কবির রচিত মাহাত্ম্য-কাহিনি সংকলিত হয়েছে। যেমন- মুনশী ওয়াজেদ আলির লেখা *সত্যপিরের পুথি*, শ্রী কবিবল্লভের *সত্য-নারায়ণের পুথি*, কৃষ্ণহরি দাসের *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*, দ্বিজ রামধনের *সত্য নারায়ণের পুথি*। এছাড়া রয়েছে *সনকার পাঁচালী* (কবি অজ্ঞাত), শিবরাম পালের *সত্যপীর পাঁচালী*, রামকিশোর ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশের *সত্যনারায়ণ কথা*, দ্বিজ রামেশ্বরের *রামেশ্বর সত্যনারায়ণ পাঁচালী*, দ্বিজ দীনরামের *নারায়ণ-দেবের পাঁচালি*। আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে এই সমস্ত মাহাত্ম্য-কাহিনি স্থান পেয়েছে।

সুজিত কুমার মণ্ডল সম্পাদিত *বনবিবির পালা* (২০১০) গ্রন্থে মরহুম মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা*-র সংকলন রয়েছে। এছাড়া এই গ্রন্থ থেকেই *বনবিবির পালা* নামক একটি নাটক, *বনবিবির একানি পালা*, এবং *দুখে যাত্রা* নামে একটি যাত্রার লেখ্যরূপ পাই।

গিরীন্দ্রনাথ দাসের গবেষণামূলক গ্রন্থ *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা* (১৯৭৬) গ্রন্থে বেশ কিছু কাহিনির সংকলন রয়েছে যা আমাকে গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সাহায্য করেছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থটিতে মঙ্গলকাব্যের বেশ কয়েকটি কাহিনি পাওয়া যায়। যেমন- কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল, শীতলামঙ্গল, কমলামঙ্গল। এখান থেকে ‘রায়মঙ্গল’ কাব্যটি গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছে। মেছুয়া বাজার স্ট্রিটে অবস্থিত গওসিয়া ও ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক বেশ কিছু গ্রন্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য লোকদেবতাকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলিকেই বেছে নিই যেগুলি নামকরণে পুথি, পাঁচালি, জহুরানামা হিসেবেও পরিচিতি পেয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হল- এই গ্রন্থগুলিতে ‘পুথি’ বানানে চন্দ্রবিন্দুর ব্যবহার নেই।

পূর্ববর্তী পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক গবেষণাধর্মী গ্রন্থগুলি আলোচনার মধ্যে দিয়ে দেখা গিয়েছে গবেষকগণ বাংলার লোকদেবতার পরিচয়, তাঁদেরকে ঘিরে বিভিন্ন

লোকবিশ্বাস, অলৌকিক কাহিনি, মেলা, মাহাত্ম্য, ভক্তদের আচরণ বিধি, পাঁচালি কাব্যের নাম, কাহিনি সংক্ষেপ তুলে ধরেছেন। তাঁরা দেবদেবীর মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গান লিপিবদ্ধ, পালাগানের আসরের পরিচয় দিয়েছেন।

আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভটি একেবারেই নতুনত্বের দাবি রাখে। কারণ এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য হল- পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক কাহিনিগুলির শিল্পরূপ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করা। সাহিত্যের সঙ্গে ভাষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে থাকায় তা আলোচনা করা হয়েছে।

প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে-

১. ভূমিকা, মূল আলোচনা, উপসংহার, পরিশিষ্ট ও গ্রন্থপঞ্জি- এই পাঁচটি পর্বে প্রদত্ত গবেষণাপত্রটি বিন্যস্ত করা হয়েছে।

২. পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনি নিয়ে সমগ্র কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। তাই প্রথমে সেই আকর গ্রন্থগুলিকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মূলত চারটি বিষয়ের উপর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করা হয়েছে। বনবিবি, পির গোরাচাঁদ, বড়খানগাজি এবং সত্যপির।

৩. সহায়ক উপাদান হিসেবে বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা, বৈদুতিন মাধ্যম থেকে তথ্যসংগ্রহ করা হয়েছে।

৪. সমগ্র গবেষণা পত্রটি কালপুরুষ ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি ১২ ফন্ট ও ইন্ডেন্ট করা হয়েছে, ফলে কোটেশন চিহ্ন বর্জিত হয়েছে।

৫. আকাদেমি বানান অভিধান ব্যবহার করা হয়েছে গবেষণা পত্রটি প্রস্তুত করতে।

বাংলা বিভাগ রত্নমালা নস্কর

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

# কৃতজ্ঞতা স্বীকার

বাংলা সাহিত্যে প্রধান স্রোতের পাশাপাশি অপ্রধান সাহিত্যের নিদর্শনগুলিও তাদের ভাষা, ছন্দ ও বিষয়বস্তুতে আমাদের অতীতকে ধরে রেখেছে। এমনি কোনো সাহিত্যের বিষয় নিয়ে কাজ করার ইচ্ছে অনেক দিন থেকে ছিল। এম.ফিল এবং পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভ প্রস্তুতি স্বাভাবিক ভাবে সেই ইচ্ছার প্রতিফলন বলা চলে। প্রথমে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও ভাষাবিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে এম.ফিল উপাধি লাভ করি। তিনি আমার অভিভাবকের মতো পাশে থেকে কাজটি সম্পূর্ণ করতে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাছে আব্দুর রহিম সাহেবের লেখা *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-র ভাষা নিয়ে কাজ করি। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

পিএইচ.ডি গবেষণা অভিসন্দর্ভটি প্রস্তুত করি অধ্যাপক শেখর কুমার সমাদ্দার মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে। তিনি সর্বদা সুপরামর্শ দিয়ে আমায় সামনে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাঁর অভিভাবকসুলভ তত্ত্বাবধান আমার সারাজীবন মনে থাকবে। তাঁকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই।

বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বরেন্দু মণ্ডল এবং তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক পার্থসারথি ভৌমিক মহাশয়কে আমার প্রণাম জানাই। এছাড়া যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপিকাকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

আমার পরিবারের প্রতিটি মানুষের উৎসাহ আমাকে উদ্দীপ্ত করেছে। আমতলা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে সমস্ত পরিচালকবৃন্দ বিভিন্ন গ্রন্থের পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন। এছাড়া আমার আত্মীয়, পরিজন, বন্ধু, সহকর্মীদের কাছ থেকে আমি নানাভাবে উৎসাহ পেয়েছি। তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। সবশেষে আমার ঠাকুরদা সেবকচন্দ্র নস্কর এবং দাদামশাই সুশীলকুমার নস্কর মহাশয়কে আমার শতকোটি প্রণাম জানাই। গবেষণা পত্রটি গ্রহণযোগ্য হলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

# ভূমিকা

পীরগুরু অভ্যাগত পূজেন্ত তৎপর।
লোক উপকার করে নাহি আত্মপর।।
রাজনীতি লোকধর্ম বুঝন্ত সকল।
মিত্রের সহায় করে শত্রু রসাতল।।[১]

লোকসংস্কৃতিবিদ ওয়াকিল আহমেদ জানিয়েছেন-

> আঠার শতকের দোভাষী পুঁথি রচয়িতারা একাধারে লৌকিক পীরকে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন, অন্যধারে নানাভাবে পীরস্তুতি করে তাঁদের মহিমা প্রচার করেছেন। ‘কালুগাজী-চম্পাবতী’, ‘সত্যপীরের পাঁচালি’, ‘মানিকপীরের গীত’, ‘বনবিবির জহুরানামা’ প্রভৃতি পুঁথিতে দেবকল্প লৌকিক পীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও পূজা প্রচার করা হয়েছে।[২]

তিনি আরও বলেছেন-

> ষোল শতকের গোড়ায় কবি কঙ্ক সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য ‘বিদ্যাসুন্দর’ রচনা করেন। সতেরো শতকের অধিকাংশ মুসলমান কবি পীর-বন্দনা করে কাব্য আরম্ভ করেছেন।[৩]

বাংলায় পির-গাজি-বিবির পালা একসময় বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ সেই পালাগান শুনতেন বা গাইতেন। মৌখিক পরম্পরায় প্রচারিত পালাগানগুলি তালপাতা, তুলট কাগজে[৪] লেখা হত। ছাপাখানা আবিষ্কারের পর কাহিনিগুলি গ্রন্থ আকারে প্রকাশ করেন। গায়েনদের মুখ থেকে গান শুনে লিখে নেওয়ার কথাও জানা যায়। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর *ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী* (২০২১) গ্রন্থে ‘গাজী সাহেবের গানে’র সংকলক নগেন্দ্র বসু মহাশয়ের গ্রন্থ সম্পর্কে জানা গিয়েছে। নগেন্দ্র বসু ভূমিকায় জানিয়েছিলেন তিনি জমিদার দেবেন্দ্রকুমারের বাড়িতে গিয়ে সীতাকুণ্ডু গ্রামস্থ কলেমুদ্দিন গায়েনকে ডেকে এনে তাঁর মুখ থেকে গাজি সম্পর্কিত গান শুনে লিখে নিয়েছেন।[৫]

পালাগানের কাহিনিগুলি লিখিত হওয়ার পর বিকৃতি বন্ধ হয়েছে। ফলত বহু বছর আগে প্রচলিত লোকদেবতাকেন্দ্রিক কাহিনি বিস্তৃত আকারে পাওয়া গিয়েছে এটি

আমাদের পরম প্রাপ্তি। এই সমস্ত গ্রন্থগুলি পুথি, পাঁচালি, জহুরানামা প্রভৃতি নাম নিয়ে প্রান্তীয় সাহিত্য বা আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে গুরুত্ব বহন করে আসছে। এগুলি ভক্তরা সংগ্রহ করে নিজেদের ধর্মীয় পিপাসা পূরণ করতেন। পরবর্তীকালে মানুষের কাছে বিনোদনের সামগ্রী দূরদর্শন, মোবাইল ফোন এসেছে। কর্মসূত্রে নারী-পুরুষ উভয়েই শহরমুখী হয়েছে। মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় অসংখ্য প্রান্তীয় অঞ্চলের মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরে আসেন।[৬] পালাগায়কেরা চান তাঁদের সন্তান পড়াশোনা করে চাকুরি পাক। তাদের বংশধরের অনেকেই পালাগান গাওয়ার পাশাপাশি অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত থাকতে দেখা গিয়েছে। ফলে পালাগানের জনপ্রিয়তা কমতে শুরু করে। অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল জানিয়েছেন-

> শিক্ষার হারবৃদ্ধি, বিজ্ঞান সচেতনতা ইত্যাদি কারণে পুরনো সংস্কার ও কুসংস্কার ছেড়ে যাচ্ছে নতুন প্রজন্মকে[৭]

যেগুলি তাদের পূর্বপুরুষের কাছে অতি মূল্যবান গ্রন্থ ছিল সেগুলি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সন্তানদের কাছে গ্রহণযোগ্য থাকেনি। আঞ্চলিক সাহিত্যের গুরুত্ব এবং মূল্য বুঝে অনুসন্ধিৎসু গবেষকবৃন্দ গ্রন্থগুলি উদ্ধার করবার বহু চেষ্টা করেছেন। ওয়াকিল আহমেদ এ বিষয়ে প্রস্তাবনা অংশে বলেছেন-

> আমাদের দেশে লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে বিদ্বান সমাজের কৌতুহল জেগেছে বলতে গেলে সাম্প্রতিককালেই।...বাংলা লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহ করে প্রথম আলোচনা ও প্রকাশ শুরু করেছিলেন ইংরেজ সুধীজন ও পণ্ডিতগণই।... আজ থেকে প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সক্রিয় প্রচেষ্টায় লোকরচনার মর্যাদা সম্বন্ধে আমাদের চেতনা জাগ্রত হয়।[৮]

লোকদেবতা এবং সেই সংক্রান্ত গ্রন্থগুলির কার্যকারিতা বোঝাতে গিয়ে ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার সম্পাদকীয় কলমে লিখেছেন-

> সময়টা মধ্যযুগ। ধর্মসমন্বয়ের লক্ষ্যে মূলত পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হল পুথি, পাঁচালি, কীর্তনের গান ও পদাবলী। উদ্দেশ্য- মানুষের কল্যাণ এবং মূলত হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমন্বয়সাধন। আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করলাম, এই মানুষজন অন্তজ শ্রেণির। এরাই সবক্ষেত্রে, সবসময়ে, সব দেশে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেণি; এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজ নিজ ধর্মের উচ্চশ্রেণির হাতে। ফলে মূলত আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটের মূল ধরে

> ব্যক্তিক ও সামাজিক উন্নয়নের তাগিদে সৃষ্টি হল লোকদেবতার, যিনি অল্পে তুষ্ট হয়ে অনুগত মানুষকে সুখ ও সমৃদ্ধি দান করবেন। ষোড়শ শতকে বাংলার প্রধান দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে সর্বধর্মের যে সমন্বয়চেতনার উন্মেষ ঘটে তার ফলে রচিত হয় একের পর এক মঙ্গলকাব্য। ঘটনাবিন্যাস ও সুর বৈচিত্র্যে দ্রুত তা সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। লোকদেবতার মহিমায় উদ্বুদ্ধ মানুষ ধর্মের বেড়া ডিঙিয়ে পরস্পরের আরও কাছে চলে আসেন। গড়ে তোলেন এমন এক সামাজিক পরিমণ্ডল যেখানে নিছক ধর্মসাধনার চেয়ে কল্যাণ অনেক বেশি গুরুত্ব পায়।[৯]

পির সাহিত্যের মাহাত্ম্য বোঝাতে গিয়ে সম্পাদক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান* (১৯৯২) গ্রন্থে জানিয়েছেন-

> পাশাপাশি বসবাসকারী এ দেশের হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় রচিত হয়েছিল পীরসাহিত্য। ...বহু শতাব্দী ধরে পাশাপাশি অবস্থানরত এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে কৃষ্টিগত ব্যাপারে তারা অনেকটা কাছাকাছি এসেছিলেন বলে ধারণা করা যায়। পীরসাহিত্যে এই রূপটাই তুলে ধরা হয়েছে।[১০]

মহম্মদ যাকারিয়া গাজি সাহিত্য সম্পর্কে জানিয়েছেন-

> গাযী সাহিত্যের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। এদেশে ইসলাম প্রচারের এক অভিনব ধরনের কাহিনী এতে দেখা যায়। শান্তির পথে অর্থাৎ বিনা প্রতিবাদে যদি কোনো অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে তবে ভাল কথা। আর তা না করে যদি কেউ ইসলামের বিরোধিতা করেন অথবা সেই ধর্মকে অবজ্ঞা করেন তবে কেরামতি থেকে শুরু করে যুদ্ধ পর্যন্ত সর্বশক্তি প্রয়োগ করে সেই অবিশ্বাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতেই হবে। গাযী কাহিনীতে অমুসলিমকে জোর করে মুসলিম করার সেই বিকৃত ও অলীক কাহিনীই তুলে ধরা হয়েছে।[১১]

এবার আসাযাক কবিদের প্রসঙ্গে। প্রত্যেক কবি বিনয়পূর্বক নিজেদেরকে বারবার হীন, ক্ষুদ্র বলেছেন। প্রথম অধ্যায় 'কবি প্রসঙ্গ' অংশে এবিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে (পৃ.- ২৯)। কবিগণ লৌকিক দেবদেবীদের প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের তুলনায় সাহিত্য সৃষ্টির দিকে বেশি মনোযোগী ছিলেন। গ্রন্থের পরিমাপ এবং পাঠকের ভালোলাগার একশো। বিষয়ে তাঁরা সর্বদা সজাগ ছিলেন। লেখায় ভুল কিছু থাকলে তাঁরা পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

দোষ খাতা ভুল চুক নাহিক ধরিবে*
মেজাজেতে নাহি ঠিক কিয়া লিখি পড়ি।।
বিরচিনু লোকের খাহেস দেখে ভারি*[১২]

এই মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির পৃষ্ঠা সংখ্যা অনধিক।

প্রাচীনযুগে লিপিকরেরা ভূর্জপত্র (ভুজ গাছের পাতলা ছাল), তালপাতা, তেরেট পত্র (তালপাতার মতো গাছের পাতা বিশেষ) ও তুলট কাগজের উপর ভূষাকালি দিয়ে খাগ বা সরের কলমে যেসব গ্রন্থ রচনা করতেন তা পুথি নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীনকালে লিপিকরেরা একাধিক পুথির অনুলিপি করতেন। সেক্ষেত্রে দেখা যেত একটি লিপির একাধিক লিপিকর। ভিন্ন হস্তাক্ষর এবং বাংলার যথার্থ হরফ না থাকায় সেই সমস্ত পুথি পরবর্তী কালে পড়াটা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে যায়। এই সমস্ত লিপির একাধিক তোলাপাঠও থাকতো। ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত লিপিকরেরা একাধিক লিপির অনুলিপি করতেন। অষ্টাদশ শতকের পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান মিশনারিরা প্রথম ছাপাখানা আবিষ্কারের পর গ্রন্থগুলি ছাপানো শুরু হয়। পুথি গবেষকগণ হস্তাক্ষর এবং যুক্ত ব্যাঞ্জন পাঠোদ্ধার করে কৌতূহলী পাঠকদের কাছে অনেক অজানা তথ্যের রহস্য উন্মোচন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য সংস্কৃত পুস্তিকা শব্দ থেকে পুথি কথাটির আবির্ভাব। পুথির নাসিক্য উচ্চারণ হল 'পুঁথি'। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যকে পুথি সাহিত্য বলা যায় কারণ তখনকার সময় ছাপাখানা ছিল না। সবই হস্তলিখিত। এশিয়াটিক সোসাইটি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এই দুই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করা। পরবর্তী সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

পুথি নামকরণের মধ্যে দেখা গিয়েছে পির-গাজি-বিবির জন্মের নানা কাহিনি দিয়ে শুরু হয়ে তাদের জীবনের নানা ওঠাপড়ার মধ্য দিয়ে সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠার কাহিনি বিবৃত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- কৃষ্ণহরি দাসের লেখা *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*[৩] (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*[৪] (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩), আব্দুর রহীম সাহেবের *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*[৫] (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩)।

এছাড়া পির-গাজি-বিবি সংক্রান্ত কাহিনিগুলিকে জহুরানামা, কেচ্ছা-কাহিনি প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। জহুরা শব্দের অর্থ- অলৌকিক শক্তি, ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ, মাহাত্ম্য।[১৬] আঞ্চলিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনি বিষয়ক গ্রন্থ হল জহুরানামা। এখানে তাঁদের জীবনের নানা ঘটনা যেমন বর্ণিত হয়েছে তেমনি মানুষের বিপদে আপদে এই সমস্ত দেবদেবী কীভাবে রক্ষা করেছেন তার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*, মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৪) গ্রন্থে বনবিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি বিবৃত হয়েছে।

কাহিনিগুলিতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে পির-গাজি-বিবির অসহায় মায়ের গর্ভে জন্ম, অথচ তাঁরা আর্ত মানুষের রক্ষাকর্তা। তাঁদের আশীর্বাদে সন্তানহীনদের সন্তান লাভ, দরিদ্র অসহায় মানুষ ধনসম্পত্তি লাভ হয়। শুধু তাই নয় তাঁরা মানুষ এবং পশুদের রোগ ও ব্যাধির নিরাময় কর্তা। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়ায় তাঁরা মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারেন। সমাজে নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বদা মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকতে হয়। অথচ নিজেদেরও নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এর মধ্য দিয়ে কবিগণ পির-গাজি-বিবির মধ্যে মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন। এখানেই কবিগণ শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। বিপদে পড়লে তাঁরা আল্লার শরণাপন্ন হন। কবিগণ পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য লিখলেও প্রথমে আল্লার বন্দনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন এবং সর্বত্র আল্লার মহিমা ব্যক্ত করেছেন।

কেচ্ছা-কাহিনিগুলির মধ্যে শিল্পের প্রয়োজনে কল্পনা এলেও সমসাময়িক সমাজজীবন উঠে এসেছে। সমাজে নারীর স্থান গৌণ তা প্রায় প্রতিটি গ্রন্থে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। বিবাহের ক্ষেত্রে পির কিংবা পরিদের ইচ্ছায় পাত্রপাত্রীর মিলন হয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের মতো স্বপ্নদর্শন, জামাইনিন্দা, জ্যোতিষচর্চা, কালনিদ্রা, দেবদেবীদের ভক্তদের বিপদ থেকে উদ্ধার, রূপের প্রশংসা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা কাহিনিগুলিতে রয়েছে। শিওরে বসে পির-গাজি-বিবিদের স্বপ্ন দিতে দেখা গিয়েছে। কাহিনির মধ্যে কান্নার প্রসঙ্গ রয়েছে। কবিগণ শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলতে পাঠক কিংবা শ্রোতাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। আবার তাঁরাই দুঃখ নিবারণের ভার নিয়েছেন।

আরাকান রাজসভার সাহিত্যের মতো রূপের প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে। কবিগণ চন্দ্রকে উপমান হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এছাড়া বিদ্যাধরী শব্দটির ব্যবহার রয়েছে। তাঁরা মানুষের রূপের প্রশংসার পাশাপাশি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পূজারি। বেল, যুথি, গন্ধরাজ, মালতি, মল্লিকা প্রভৃতি নানান ফুলের বর্ণনা দেওয়ার পর মোছান্নেফ মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে এই সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে গ্রন্থটাই অনেক বড়ো হয়ে যাবে।

একে একে করি যদি ফুলের বাগান।। রাতি পোহাইয়া যাবে হইবে বেহান*[১৭]

অন্যান্য কবিদেরও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে দেখা গিয়েছে।

মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের ইতিহাসের কথা জানতে পারা গিয়েছে। কবিগণ ভক্তির আতিশয্যের থেকে গ্রন্থগুলি কতখানি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়ে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান* (১৯৯২) গ্রন্থে পির-দরবেশকে নিয়ে বলেছেন-

> ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ এমনকি বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত সময়ে রচিত এ ধরনের সাহিত্যকে পীরসাহিত্য, গাযী সাহিত্য ইত্যাদি নামে অবিহিত করা যেতে পারে।[১৮]

কয়েকটি মুদ্রিত কাহিনিকে অবলম্বন করে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে কবি পরিচিতি, গ্রন্থ পরিচিতি, নামকরণ প্রসঙ্গ, কবি ব্যক্তিত্ব, সমসাময়িক সমাজে মুদ্রিত কাহিনি বা গ্রন্থগুলির গুরুত্ব, পূর্ববর্তী গবেষকদের গবেষণার পরিধি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে কাহিনি ও চরিত্রের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্যের কথা উঠে এসেছে। কাহিনির মধ্যে সমাজভাবনা, ইতিহাস চেতনা, জীবনবোধ যে-ভাবে উঠে এসেছে তা আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া কাহিনিগুলি লোকশিল্পীর হাতে পড়ে কীভাবে জনসমাজে পরিবেশিত হয় তা দেখানোর চেষ্টা রয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ, রূপকথাধর্মী সাহিত্যের সঙ্গে মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির তুলনামূলক আলোচনা অর্থাৎ সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দেখানো হয়েছে। মুসলমান কবি হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের লেখায়

কীভাবে পৌরাণিক সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে তার ইতিহাস অনুসন্ধানের চেষ্টা রয়েছে। তৎকালীন সমাজ কীভাবে কাহিনি নির্মাণে সহায়তা করেছে সেই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। সমাজ এবং কাহিনি একে অপরের পরিপূরক হিসেবে দেখা গিয়েছে। কাহিনি রচনাকালে ভাষার ক্ষেত্রে বিশেষ বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে। সেই ভাষার ইতিহাস এবং বৈচিত্র্য এই নিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৬

২। আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২৭৫

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

৪। তুলো থেকে তৈরি করা কাগজকে তুলট কাগজ বলে। পাট, পুরনো কাপড়, ঘাস, খড় দিয়েও তুলট কাগজ বানানো হয়। এক সময় এই তুলট কাগজে পুথি লেখা হত।

দ্রষ্টব্য:https://www.dailynayadiganta.com/daily/619546/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%9C-

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, জানিয়েছেন- ‘মদন পালা’ নামে একটি জীর্ণ পুথি তুলট কাগজে লেখা যেটি *বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ*-এর পুথিশালায় (কলকাতা-৬) নং ৯৩৪ রয়েছে। এখানে তিনজন লেখকের হস্তাক্ষর রয়েছে।

দ্রষ্টব্য: অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, *ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী,* ফেব্রুয়ারি ২০২১, রোহিনী নন্দন, কলকাতা, পৃ. ৪৯

৫। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী, *ঘুটিয়ারী শরীফের পীর মোবারক গাজী,* ফেব্রুয়ারি ২০২১, রোহিনী নন্দন, কলকাতা, পৃ. ৫৪

৬। মণ্ডল, সুজিত কুমার (সম্পা.), *বনবিবির পালা,* মার্চ ২০১০, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ.২৩৩

৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৩

৮। আহমদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, দ্রষ্টব্য: প্রস্তাবনা অংশ

৯। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন (সম্পা.), *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দ্রষ্টব্য: সম্পাদকীয় কলম।

১০। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান*, ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১০৮

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

১২। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোনবিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরি, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রিট), পৃ. ৪৩

১৩। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন (সম্পা.), *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ.৩৩২

১৪। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা,

১৫। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা,

১৬। হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান,* ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,

১৭। সাহেব, মোছান্নেফ মুনশী ওয়াজেদ আলি, 'সত্য পীরের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ২৮২

১৮। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান*, ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১০৩

# প্রথম অধ্যায়

## বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত গ্রন্থের নানা প্রসঙ্গ

### ১.ক. গ্রন্থ পরিচয়:

আঞ্চলিক লোকদেবতাকে কেন্দ্র করে যেসব কাহিনি বা গল্প লোকসমাজে প্রচলিত আছে সেগুলি সুসংবদ্ধ পালার আকারে পালাগায়ক কর্তৃক আসরে পরিবেশিত হয়। মৌখিক ধারার এই সমস্ত পালাগান গুরুশিষ্যপরম্পরায় অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ঊনবিংশ-বিংশ শতকে এইরকম কিছু ইসলামি কেচ্ছা-কাহিনি ওসমানিয়া লাইব্রেরি, গওসিয়া লাইব্রেরি[১] থেকে বেরিয়েছে। দুটিই 'লাইব্রেরি' নাম অথচ প্রকাশনাকেন্দ্রিক বই-এর দোকান। ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মুসলমান কবিদের লেখা উপন্যাস, গল্প, কোরানের অনুবাদ, অভিধান ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য প্রকাশনী থেকে পির-গাজ-বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি প্রকাশ পেয়েছে; যেমন- সিদ্দিকীয়া লাইব্রেরি, জি.কে প্রকাশনী[২] থেকে *গাজি কালু ও চাম্পাবতী*। *বড়খাঁ গাজির গান* প্রকাশ পেয়েছে লোকযান পত্রিকায়।[৩]

বিভিন্ন গবেষণামূলক গ্রন্থ থেকে বহু পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। যেমন-গবেষক গিরিন্দ্রনাথ দাসের লেখা *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা* (১৯৭৬), গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর লেখা *বাংলার লৌকিক দেবতা* (১৩৯৪), সুকুমার সেনের *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* (১৯৯৩), অধ্যাপক সুজিত কুমার মণ্ডল সম্পাদিত গ্রন্থ *বনবিবির পালা* (২০১০), অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী বিভিন্ন পির, গাজি, বিবি পালার সংগ্রাহক এবং সংকলক।

*দীপন* (২০১২) পত্রিকায়[৪] সত্যপির সংক্রান্ত বহু কাহিনি সংকলিত হয়েছে যার পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে। এখানে সত্যপিরকেন্দ্রিক অনেকগুলি প্রবন্ধরচনা ও কথকতাও রয়েছে।[৫] গানের আকারে পির, গাজি, বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি বর্ণিত রয়েছে। যেমন- শ্রী কালিদাস দত্তের লেখা 'বড়খাঁ গাজির গান'[৬] *ভারতীয় লোকযান* (১৯৬৩) পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। দীনেশচন্দ্র সেন চন্দ্রকুমার দে'র সহায়তায় অনেক পালাগান সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলি অশিক্ষিত হিন্দু-মুসলমান ব্যালাড গায়কদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে।[৭]

পয়ার এবং ত্রিপদী ছন্দে রচিত কাহিনিগুলিতে গান কিংবা ধুয়ার ব্যবহার রয়েছে। সেখানে রাগ কিংবা তালের উল্লেখ আছে। চরণের শেষে কবিগণ অন্ত্যমিল ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি বিভিন্ন ভাষার শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের শুরুতে লেখা হলেও দু-একটি জায়গা ছাড়া ইংরাজি শব্দের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়নি। সেদিক থেকে ভাবা যেতে পারে কবিগণ পাশ্চাত্য সাহিত্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেগুলির কিছু অর্থ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায় না। ওসমানিয়া, গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থের শেষ থেকে কাহিনি শুরু। তবে লাইন বাম দিক থেকে শুরু হয়ে ডান দিকে শেষ হয়েছে।

গ্রন্থগুলির গুরুত্ব এখানেই যে, লোকদেবতাকেন্দ্রিক কাহিনিগুলি দীর্ঘদিন জনসমাজে মৌখিক আকারে ঘুরে বেড়িয়েছে। বিভিন্ন শিল্পীর হাতে পড়ে সেগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। যে পালাগানগুলির গুরুত্ব আধুনিক প্রজন্মের কাছে হ্রাস পেতে শুরু করেছে সেগুলিকে কিছু কবি লিপিবদ্ধ করে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। যেগুলির মাধ্যমে গবেষকগণ বিভিন্ন কাহিনি জানতে সক্ষম হয়েছেন। গবেষক গিরীন্দ্রনাথ দাস মনে করেছেন-

> এই প্রথম গ্রন্থ যেখানে বাঙালি মুসলমানদের ঘর, সংসার, সমাজের কথা আমরা জানতে পারি।[৮]

নিম্নে আলোচ্য গ্রন্থের পরিচয় বর্ণিত হল।

**মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা)**

গ্রন্থটির কবি সমাপ্তি সূচক যে সাল এবং তারিখ উল্লেখ করেছেন তা হল-

> তামাম হইল পুথি খোদার ফজলে*
> বার শত সাতাশী সাল কার্ত্তিক মাহার।।
> সাত তারিখের বাত আছিল জুম্মার*[৯]

বিভিন্ন সময়ে এর সংস্করণ করা হয়েছে। নুরুদ্দীন আহম্মদ কর্তৃক ১৩৯৪ সালে গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা তেতাল্লিশ। প্রচ্ছদে ‘আসল’ কথাটি লেখা

না থাকলেও 'ছহি চাঁদ মার্কা ছাপা' কথাটি লেখা রয়েছে। মূল্য চার টাকা। প্রচ্ছদের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হয়েছে।

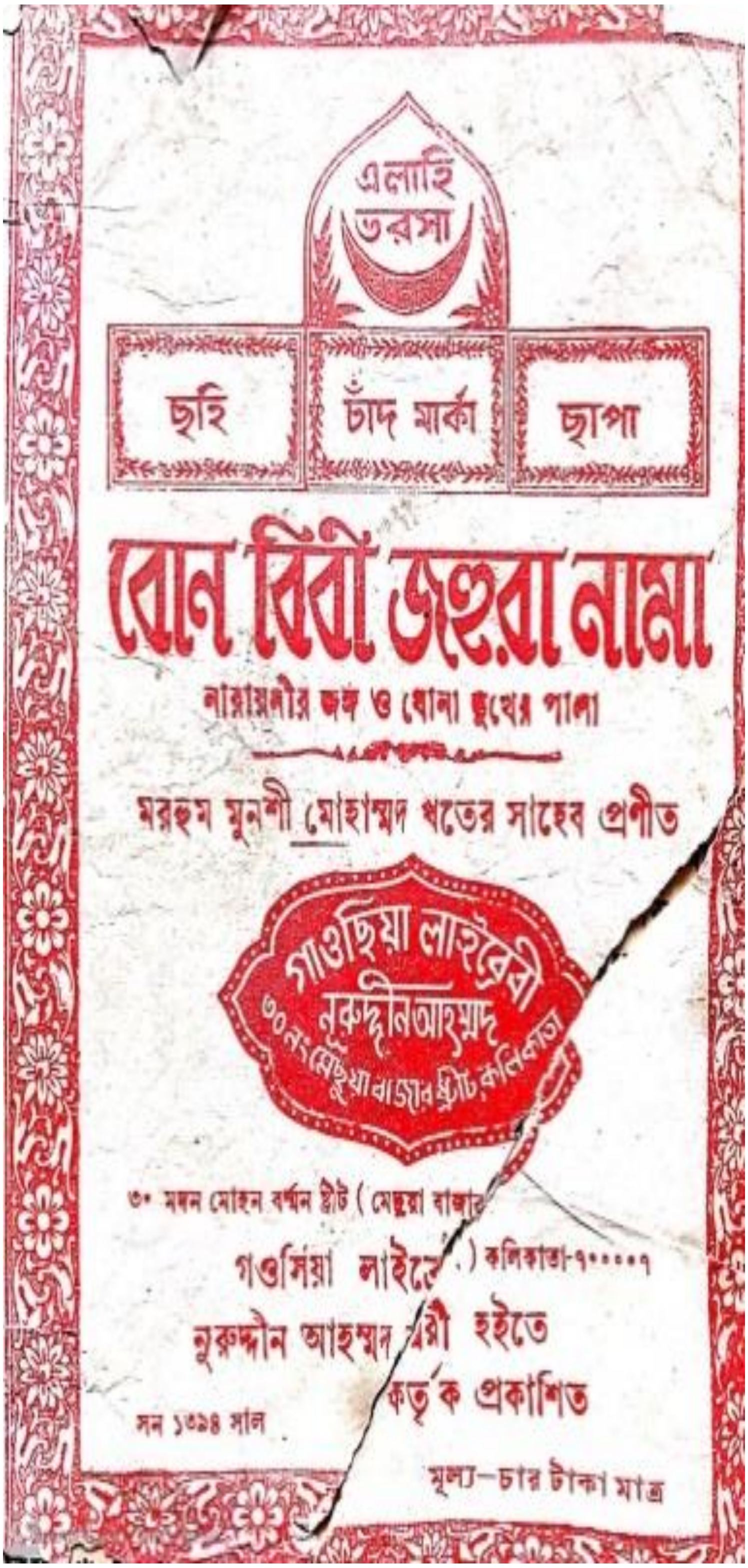

এরপর ১৪১৬-৩-২ সনে মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেবেরই লেখা একই গ্রন্থ জি. কে প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয়। কবির নাম দেওয়া আছে কেবল মোহাম্মদ খতের সাহেব। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে অর্থ মূল্য বেড়ে হয়েছে ৩০ টাকা। মূল্যের পাশে মাত্র কথাটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়নি। তবে ‘চাঁদ-তারা মার্কা’ কথাটি লেখা রয়েছে এবং প্রচ্ছদে ‘আসল’ কথাটির ব্যবহার তিনবার লক্ষ করা গিয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা- চল্লিশ। নিম্নে প্রচ্ছদের ছবি তুলে ধরা হল।

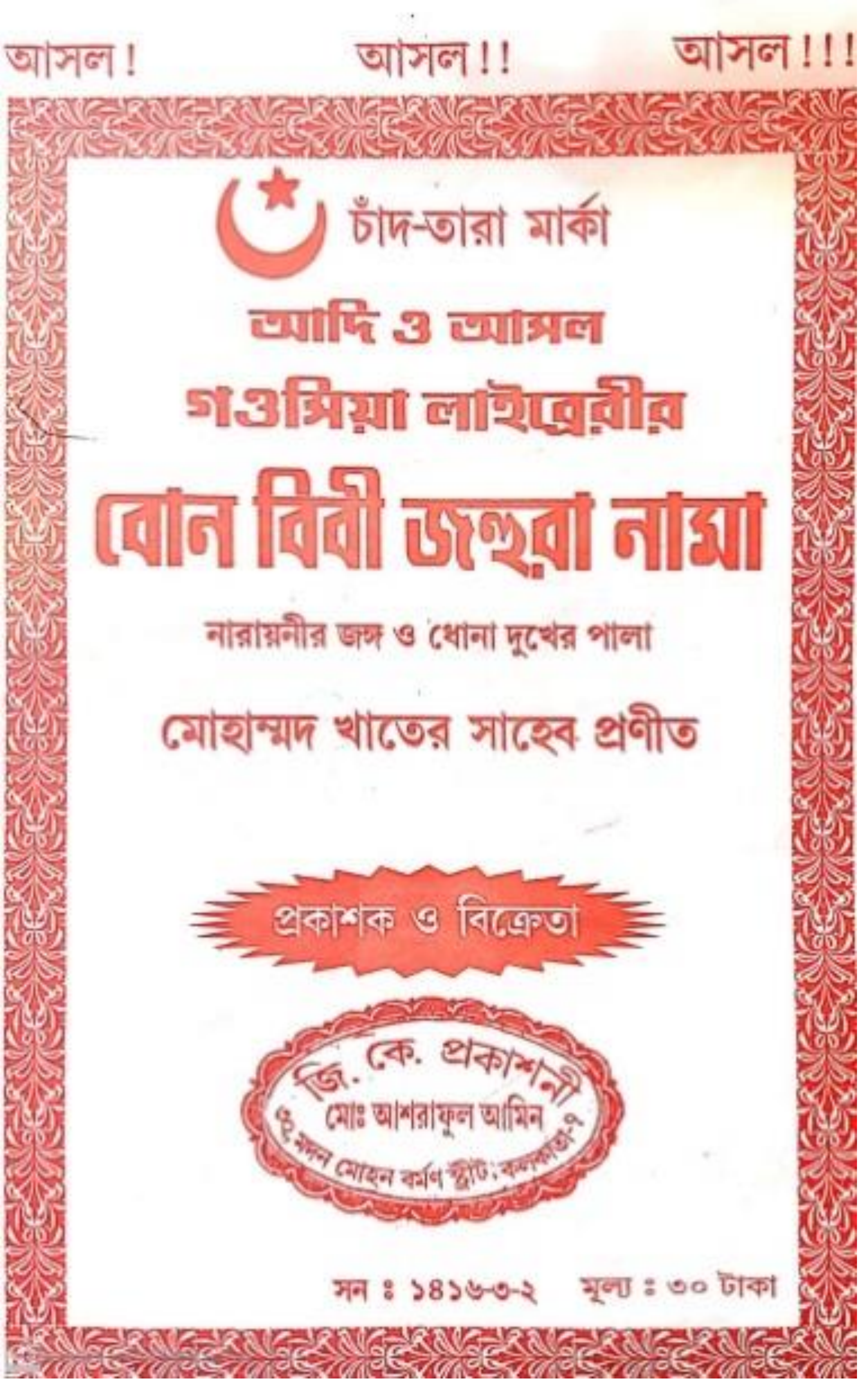

এবার আসা যাক গ্রন্থের বিষয়বস্তুতে। ১৩৯৪ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে বিষয়বস্তুর যে শিরোনামগুলি কবি ব্যবহার করেছেন সেগুলি হল- ‘নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা’, ‘বোন বিবী ও শা জঙ্গলির পয়াদেশের বয়ান’, ‘গোলাল বিবীর সহিত বেরাহিমের সাদীর বয়ান’, ‘গোলাল বিবীকে বনবাস দিবার বয়ান’, ‘বোন বিবী শাজঙ্গলি মা বাপ হইতে রোখছত হইয়া মদিনা শরিফে মুরিদ হইতে যায় তাহার বয়ান’, ‘বোন বিবী শা জঙ্গলি মদিনা শরিফ হইতে বাদাবনে আসে তাহার বয়ান’, ‘বোন বিবী ভাটির দেশে যাইয়া নারায়ণীর সঙ্গে লড়াই করে তাহার বয়ান’, ‘ধোনাই মউলে দুখেরে লইয়া বাদাবনে মহল করিতে যায় তাহার বয়ান’, ‘ধোনাই মৌলে দুখের তরে দক্ষিণা রায়কে দিয়া যায় ও বোন বিবী দয়াবান হইয়া দুখেরে উদ্ধার করে তাহার বয়ান’, ‘ধোনাই মৌলে দেশে যাইয়া পৌছে ও দুখের মা দুখের খবর শুনিয়া রোদন করে তাহার বয়ান’, ‘বোন বিবীর হুকুমে দুখে কুম্ভীর পৃষ্ঠে ঘরে যায় তাহার বয়ান’, ‘দুখে শাহার সাদীর বয়ান’। কাহিনির শিরোনামগুলিই সূচিপত্র হিসেবে দেখানো হয়েছে গ্রন্থটিতে। ১৪১৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে শিরোনামগুলিকে আলাদা করে সূচিপত্র হিসেবে দেখাননি।

১৩৯৪ সাল এবং ১৪১৬ সালের গ্রন্থের কাহিনির শিরোনামগুলি একই। তবে কিছু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত ভুল রয়েছে। সেই ভুলটি মুদ্রণকারী কৃত বলা যায়। যেমন- ‘নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা’ এই শিরোনামটি ১৪১৬ সালের গ্রন্থে রয়েছে ‘নারায়নীর জন্য ও ধোনা দুখের পালা’।[১০] দুটি সংস্করণের কাহিনি এক হলেও বানানের কিছু ভিন্নতা লক্ষ করা গিয়েছে। ফারাকটি নিম্নে প্রদত্ত হল।

১৩৯৪> ১৪১৬

ভুবন> ভূবন
পুর্ব্বদেশ> পূর্বদেশ
ভুরকুণ্ড> ভূরকুণ্ড
বিবরণ> বিবিরণ
আল্লার> আল্লাহ
আম> আমি
মদিনার> মদীনার
খোসালিত> খোশালিত

যেথা> যেখা

খাতের> খতের

তার> ভার

তরে> তবে

বেরাহিম> বেরহিম

এইরূপ বানানের ছোটো ছোটো ওলট-পালট লক্ষ করা যায়।

১৩৯৪ সনে গ্রন্থটির প্রকাশক নুরুদ্দীন আহম্মদ। ১৪১৬ সনে প্রকাশ করেন মো: আশরাফুল আমিন। বিজ্ঞাপন অংশে তাঁদের প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থের নাম রয়েছে। তবে দুটি গ্রন্থেই সেই সংখ্যা ভিন্ন। এছাড়াও ১৩৯৪-এর গ্রন্থের প্রথমেই বুনিয়াদী নামাজ শিক্ষা সংক্রান্ত গ্রন্থের বিজ্ঞাপন দেওয়া রয়েছে। কাহিনিটি শেষ থেকে শুরু হওয়ায় বিজ্ঞাপনটি গ্রন্থের প্রথমে রয়েছে। তবে তাঁদের নিয়ম অনুযায়ী শেষে রয়েছে বলা যায়।

**আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা কন্যার পুথি***

১৩৯৩ সালে মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম দ্বারা ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে গ্রন্থটি প্রকাশিত। প্রচ্ছদে আসল কথাটি তিনবার লেখা আছে। শুরুতে লেখা রয়েছে এলাহি ভরসা। বন্দনা অংশের নাম দিয়েছেন ‘হামদ নাত’। কমা (,), সেমিকোলন (;), স্টার (*), দুই দাঁড়ি (।।) প্রভৃতি বিরতি সূচক চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা আটচল্লিশটি (৪৮)। শেষ থেকে কাহিনির শুরু।[১২] প্রথমেই সূচিপত্র রয়েছে। বনবিবি, নারায়ণী এবং ধোনা দুখের কাহিনি এখানে রয়েছে।

কাহিনির শিরোনামগুলি হল- ‘বোন বিবী ও জঙ্গলী সাহার পয়াদাসের বয়ান’, ‘গুলাল বিবীর সহিত এবরাহিম ফকিরের সাদির বয়ান’, ‘গুলাল বিবীকে বনবাস দিবার বয়ান’, ‘বোন বিবী সা-জঙ্গলি মা বাপ হইতে বিদায় হইয়া মদিনা শরিফে মুরিদ হইতে যাইবার বয়ান’, ‘বোন বিবী ভাটি দেশে যাইয়া রায়মণীর সহিত জঙ্গ করিবার বয়ান’, ‘বোন বিবী রায়মণীর সঙ্গে লড়াই ফতে পাইবার বয়ান’, ‘রায়মণী বোন বিবীর তাবেদারী করিবার বয়ান’, ‘ধোনা মৌলে দুখেরে লইয়া বাদাবনে মোম মধু আনিতে যায়’, ‘ধোনা মৌলে দুঃখের তরে দক্ষিণা দেওকে দিয়া যায় ও বোন বিবী দুখেকে উদ্ধার করিবার বয়ান’, ‘ধোনা মৌলে আপনার দেশে পৌছে ও দুখের মা

দুখের মরণ খবর শুনিয়া রোদন করিবার বয়ান', 'দুখের সাদী ও বোনবিবী বঊ দেখিযা দোওয়া করিবার বয়ান'। কাহিনির শিরোনামগুলি সূচিপত্র হিসেবে দেওয়া হয়েছে এবং শেষকালে বলা হয়েছে সূচিপত্র সমাপ্ত। এই গ্রন্থে রায়মণি বলতে নারায়ণীকে বোঝানো হয়েছে। কাহিনির শেষে ওসমানিয়া লাইব্রেরির সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থের নামের সঙ্গে 'পুঁথি সাহিত্যে'র নাম দেওয়া হয়েছে। গ্রন্থগুলির নাম দেওয়া হলেও লেখকের নাম দেওয়া হয়নি।

**আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি***

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেছেন-

> এককালে বাঙালির বিশেষ করে বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনে গাযীর পুঁথি ছিল গ্রামের জনগণের যুগপৎ ধর্ম-জিজ্ঞাসা ও কাব্যরস পিপাসা মিটাবার এক বিশেষ উপকরণ। হিন্দু সমাজের রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির মতো না হলেও এগুলির প্রায় কাছাকাছি ছিল গ্রাম-বাঙ্‌লার মুসলমান সমাজে গাযীর পুঁথির জনপ্রিয়তা। বর্তমানে কালের প্রবাহে চিত্তবিনোদনের বহুবিধ উপকরণের উদ্ভাবন ও আমদানির ফলে এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগের চাপে পড়ে গাযীর পুঁথির সেই জনপ্রিয়তা বহুলাংশে কমে গেছে সত্য, কিন্তু এখনও যেটুকু আছে তাঁকে খুব অকিঞ্চিৎকর বলা যায় না।[১১]

আব্দুর রহিম সাহেবের লেখা *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-টি ১৩৯৩ সালে মোহাম্মদ নরুল ইসলাম কর্তৃক ৮ টাকা মূল্যে ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৯২। প্রচ্ছদটি পরপৃষ্ঠায় দেওয়া হল।

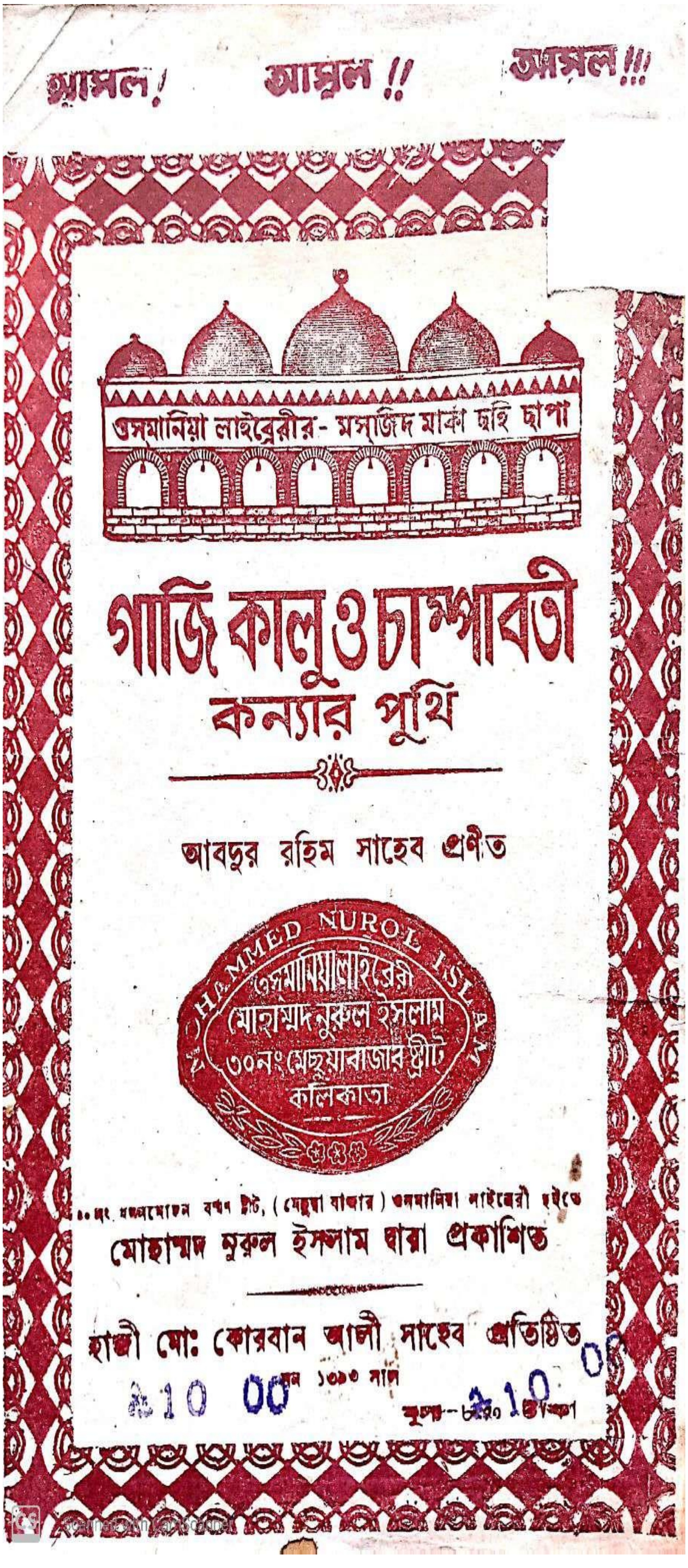
আসল! আসল!! আসল!!!
ওসমানিয়া লাইব্রেরীর- মসজিদ মার্কা ছহি ছাপা
গাজি কালু ও চাম্পাবতী
কন্যার পুথি
আবদুর রহিম সাহেব প্রণীত
MOHAMMED NUROL ISLAM
ওসমানিয়া লাইব্রেরী
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম
৩০নং মেছুয়াবাজার স্ট্রীট
কলিকাতা
মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম দ্বারা প্রকাশিত
হাজী মো: কোরবান আলী সাহেব প্রতিষ্ঠিত

বর্তমানে মো: আশরাফুল আমিন কর্তৃক প্রকাশিত ৪০ টাকা মূল্যে ৮৮ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি পাওয়া যাচ্ছে মেছুয়া বাজার থেকে, কিন্তু তার প্রকাশকাল দেওয়া হয়নি। একই কবির লেখা তাই কাহিনি অভিন্ন হলেও শব্দের অনেক পার্থক্য রয়েছে। আব্দুর রহিম সাহেব নামের পূর্বে মুনসী কথাটি সংযুক্ত হয়েছে। প্রাপ্তিস্থান জি. কে প্রকাশনী। প্রচ্ছদটি নিম্নে প্রদত্ত হল-

এখানে নতুন শব্দের সংযোগ ঘটেছে। আরেকটি বিষয় লক্ষ করবার মতো যে প্রথমে প্রকাশিত গ্রন্থে বাক্যের বিরতি সূচক চিহ্ন কমার (,) ব্যবহার নেই গ্রন্থের শুরুতে। যদিও কাহিনির মাঝপথ থেকে কমার ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। সেখানে বর্তমানে প্রকাশিত গ্রন্থের কাহিনির শুরু থেকেই ব্যাপক বিরতিসূচক চিহ্নের ব্যবহার রয়েছে। 'পুথি' বানানেও দুই গ্রন্থের ফারাক রয়েছে।

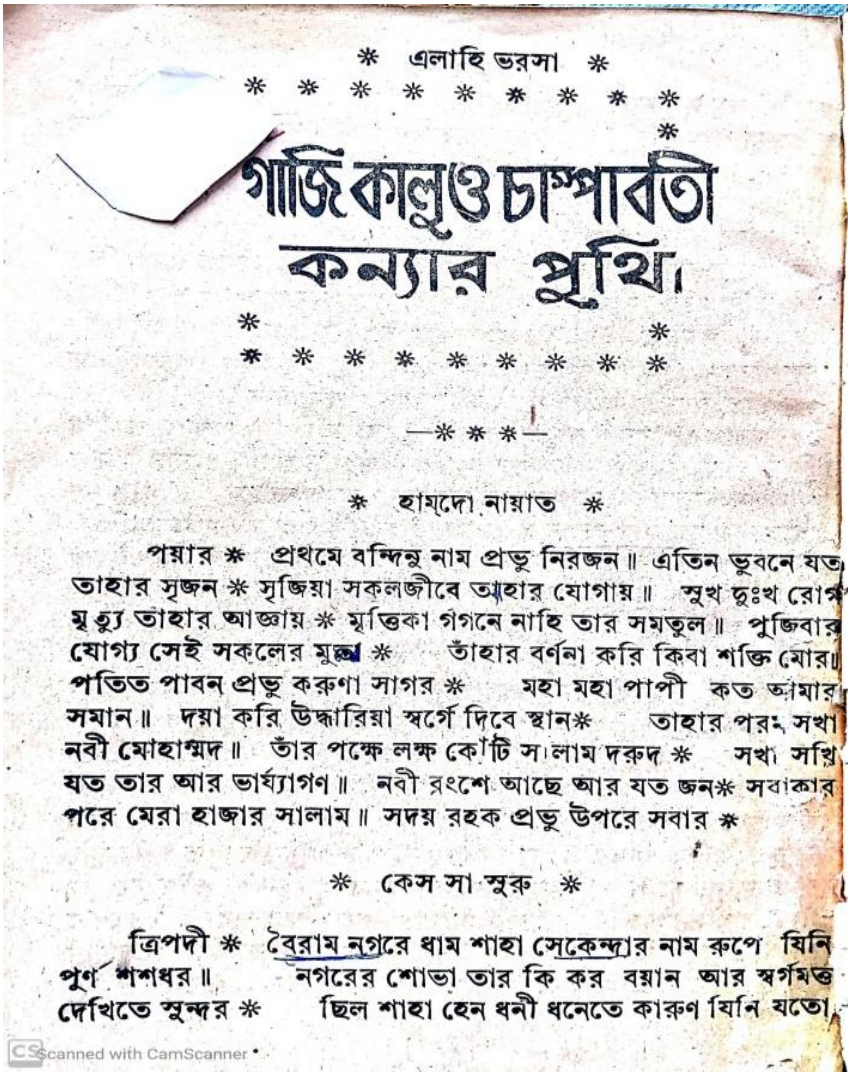

* এলাহি ভরসা *

গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি।

—* * *—

* হামদো নায়াত *

পয়ার * প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরজন॥ এতিন ভুবনে যত তাহার সৃজন * সৃজিয়া সকলজীবে আহার যোগায়॥ সুখ দুঃখ রোগ মৃত্যু তাহার আজ্ঞায় * মৃত্তিকা গগনে নাহি তার সমতুল॥ পুজিবার যোগ্য সেই সকলের মুল * তাঁহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর॥ পতিত পাবন প্রভু করুণা সাগর * মহা মহা পাপী কত আমার সমান॥ দয়া করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান* তাহার পরে সখা নবী মোহাম্মদ॥ তাঁর পক্ষে লক্ষ কোটি সালাম দরুদ * সখা সখি যত তার আর ভার্য্যাগণ॥ নবী বংশে আছে আর যত জন* সবাকার পরে মেরা হাজার সালাম॥ সদয় রহক প্রভু উপরে সবার *

* কেস সা সুরু *

ত্রিপদী * বৈরাম নগরে ধাম শাহা সেকেন্দার নাম রুপে যিনি পুর্ণ শশধর॥ নগরের শোভা তার কি কর বয়ান আর স্বর্গমর্ত্ত দেখিতে সুন্দর * ছিল শাহা হেন ধনী ধনেতে কারুণ যিনি যতো,

Scanned with CamScanner

১৩৯৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত

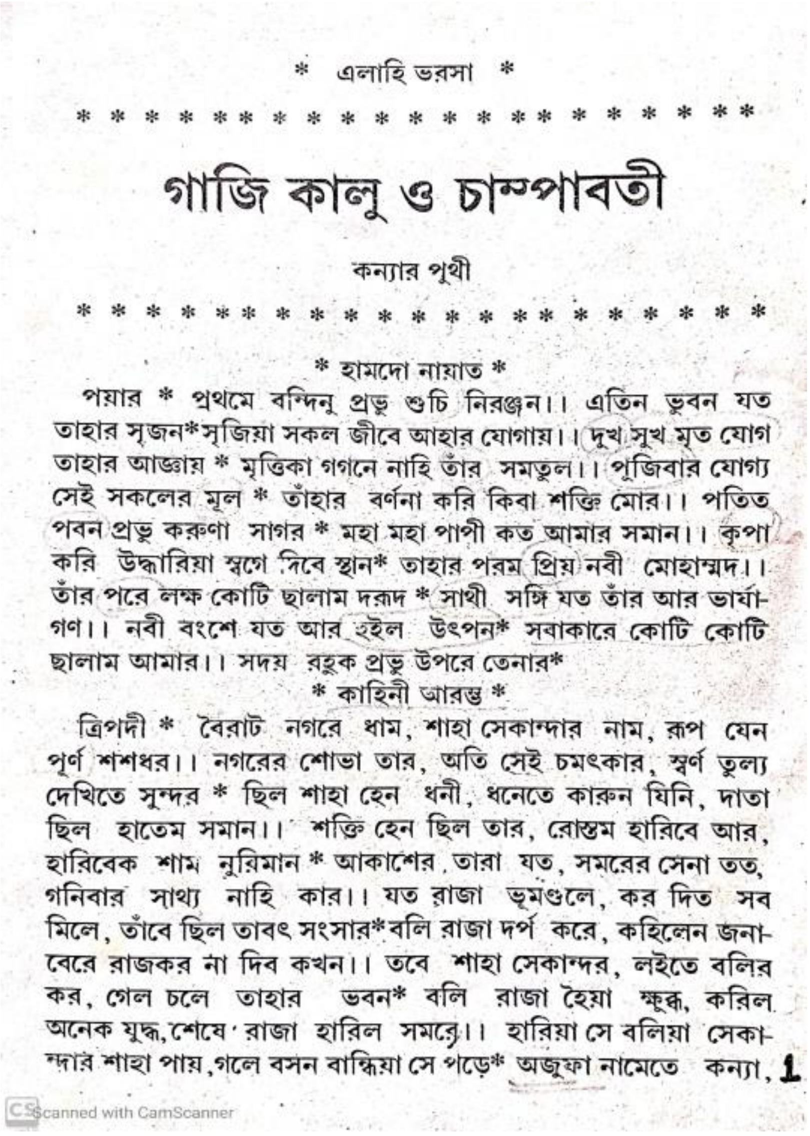

* এলাহি ভরসা *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

# গাজি কালু ও চাম্পাবতী

কন্যার পুথী

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* হামদো নায়াত *

পয়ার * প্রথমে বন্দিনু প্রভু শুচি নিরঞ্জন।। এতিন ভুবন যত তাহার সৃজন*সৃজিয়া সকল জীবে আহার যোগায়।। দুখ সুখ মৃত যোগ তাহার আজ্ঞায় * মৃত্তিকা গগনে নাহি তাঁর সমতুল।। পূজিবার যোগ্য সেই সকলের মূল * তাঁহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর।। পতিত পবন প্রভু করুণা সাগর * মহা মহা পাপী কত আমার সমান।। কৃপা করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান* তাহার পরম প্রিয় নবী মোহাম্মদ।। তাঁর পরে লক্ষ কোটি ছালাম দরূদ * সাথী সঙ্গি যত তাঁর আর ভার্যা-গণ।। নবী বংশে যত আর হইল উৎপন* সবাকারে কোটি কোটি ছালাম আমার।। সদয় রহুক প্রভু উপরে তেনার*

* কাহিনী আরম্ভ *

ত্রিপদী * বৈরাট নগরে ধাম, শাহা সেকান্দার নাম, রূপ যেন পূর্ণ শশধর।। নগরের শোভা তার, অতি সেই চমৎকার, স্বর্ণ তুল্য দেখিতে সুন্দর * ছিল শাহা হেন ধনী, ধনেতে কারুন যিনি, দাতা ছিল হাতেম সমান।। শক্তি হেন ছিল তার, রোস্তম হারিবে আর, হারিবেক শাম নুরিমান * আকাশের তারা যত, সমরের সেনা তত, গনিবার সাথ্য নাহি কার।। যত রাজা ভূমণ্ডলে, কর দিত সব মিলে, তাঁবে ছিল তাবৎ সংসার*বলি রাজা দর্প করে, কহিলেন জনা-বেরে রাজকর না দিব কখন।। তবে শাহা সেকান্দর, লইতে বলির কর, গেল চলে তাহার ভবন* বলি রাজা হৈয়া ক্ষুব্ধ, করিল অনেক যুদ্ধ, শেষে রাজা হারিল সমরে।। হারিয়া সে বলিয়া সেকা-ন্দার শাহা পায়, গলে বসন বান্ধিয়া সে পড়ে* অজুফা নামেতে কন্যা, 1

CS Scanned with CamScanner

বর্তমানে প্রকাশিত

চরিত্র কিংবা স্থানের নামের ক্ষেত্রেও বানানের বদল লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন-

বৈরামনগর (কখনও বৈরাটনগর নামটিও লক্ষ করা যায়)> বৈরাট নগর

শাহা সেকেন্দর> শাহা সেকান্দার

আজুপা> অজুফা

গাজী> গাজি

দুই গ্রন্থেই ওসমানিয়া লাইব্রেরির বিজ্ঞাপন রয়েছে, কিন্তু সেগুলি ভিন্ন। প্রথমটিতে বিজ্ঞাপিত গ্রন্থের সংখ্যা অগন্তি বর্তমানের তুলনায়।

**খোদা নেওয়াজ প্রণীত *পীর গোরাচাঁদ***

গোরাচাঁদের কাহিনি পাঁচালি কিংবা নাটকের আকারে দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ, পত্রপত্রিকাতেও গোরাচাঁদের কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। কয়েকটি সম্পূর্ণ গোরাচাঁদকেন্দ্রিক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায় ডক্টর গিরিন্দ্রনাথ দাসের *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা* (১৯৭৬) গ্রন্থে[১৩]। সেগুলি হল-

১) মহম্মদ এবাদোল্লার-*পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী*

২) মুনশী খোদা নেওয়াজের-*পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী*

৩) আব্দুল গফুর সিদ্দিকী-*বাংলা পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী*

৪) মোহাম্মদ হরমুজ আলী-*গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু*

গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত আলোচ্য খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর কাহিনিটি। এখানে গোরাচাঁদের জন্মভূমি এবং তাঁর বীরত্বের ইতিহাস জানা যায়। গ্রন্থের সূচনাতেই বলা হয়েছে 'আদি ও আসল'। 'কেচ্ছা শুরু' বলে কবি গোরাচাঁদের কাহিনি শুরু করেছেন। পৃষ্ঠা সংখ্যা বত্রিশ। কাহিনির মাঝে দুই দাঁড়ি (।।) কিংবা স্টার চিহ্নের (*) ব্যবহার থাকলেও কমা বা সেমিকোলন এবং বিরতি সূচক চিহ্নের ব্যবহার নেই। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তারই মধ্যে একটি গান এবং একটি ধুয়ার[১৪] ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। কবি প্রতিটি লাইনের শেষের শব্দের শেষ একটি কিংবা দুটি বর্ণের মিল করেছেন।

**সত্যপিরের মুদ্রিত মাহাত্ম্য-কাহিনি:**

সত্যপির হলেন বাংলার হিন্দু-ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের এক মিশ্রদেবতা। তার নামে বহু কাহিনি রয়েছে। সেগুলি পড়লে তাঁর সম্বন্ধে অনেক গালগল্পে ভরা কাহিনি যে সমাজে প্রচলিত আছে তা জানতে পারা যায়।

*দীপন* ('সত্যপীর সংখ্যা', ২০১২) পত্রিকা থেকে সত্যপিরের বেশকিছু কাহিনির সংকলন পাওয়া গিয়েছে। সেগুলি হল-

মুন্‌শী ওয়াজেদ আলির লেখা *সত্য পীরের পুথি,*

শ্রী কবিবল্লভের লেখা *সত্য-নারায়ণের পুথি,*

কৃষ্ণহরি দাস রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি,*

দ্বিজ রামধন রচিত *সত্য নারায়ণের পুথি*।

সত্যপিরের পাঁচালির সংকলনগুলি হল-

*সনকার পাঁচালী* (এই গ্রন্থের লেখক এখানে অজ্ঞাত),
শিবরাম পাল রচিত *সত্যপীর পাঁচালী,*
রামকিশোর ভট্টাচার্য্য তর্কবাগীশ রচিত *সত্যনারায়ণ কথা,*
দ্বিজ রামেশ্বর রচিত *রামেশ্বর সত্যনারায়ণ পাঁচালী,*
দ্বিজ দীনরাম রচিত *নারায়ণ-দেবের পাঁচালী*

কৃষ্ণহরি দাসের লেখা কাহিনিটি সবথেকে বড়ো। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এখানে পাওয়া যায়নি। *দীপন* পত্রিকার সহসম্পাদক তপন বাগচী ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে এই পত্রিকায় ছাপবার জন্য দেন।[১৫] মোছান্নেফ মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি সাহেব রচিত *সত্য পীরের পুথি*-টিতে 'মদন কামদেবের পালা' বর্ণিত হয়েছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে কাহিনির বিস্তার লক্ষ করা গিয়েছে। এই মুদ্রিত কাহিনিটি সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বাংলা একাডেমীর উপপরিচালক ড. তপন বাগচী।[১৬] কাহিনির বেশকিছু অংশ পাঠোদ্ধার করা যায়নি। শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত *সত্য-নারায়ণের পুথি*-টি ১১৬২ সন ১৮ই বৈশাখ লেখা সমাপ্ত হয়।[১৭] এখানে মদনসুন্দরের কাহিনি পালার আকারে বর্ণিত হয়েছে। এন জুলফিকার এই মুদ্রিত কাহিনিটি সংগ্রহ করেছেন।

## ১.খ. গ্রন্থগুলির বৈশিষ্ট্য:

স্বল্প আয়তনের মুদ্রিত গ্রন্থগুলি থেকে তৎকালীন পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনি, মানুষের বিশ্বাস, লোকাচার, দেবদেবীর মাহাত্ম্যের কথা জানা যায়। এই সমস্ত লোকায়ত দেবদেবীর পুজো সর্বধর্মসমন্বয়ের কথা বলে। হিন্দু, ইসলাম, প্রভৃতি নানা ধর্মের, নানা জাতের মানুষ এই সমস্ত লোকদেবদেবীকে পুজো করে।[১৮] আর্তমানুষ বিপদে পড়লে দেবদেবীর কাছে কাতর অনুনয় করে মুক্তি পাওয়ার জন্য। অর্থের অভাবে পিছিয়ে পড়া জাতি এইসমস্ত দেবদেবীর উপর ভরসা রাখে। মানুষের মনের বিশ্বাস থেকেই তাঁদের উৎপত্তি। কতিপয় ভক্ত কবি এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনি রচনা করেছেন।

কাহিনির মধ্যে মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারতের বিভিন্ন ঘটনার মিল থাকলেও কবিগণ নিজেদের স্বকীয়তা দেখিয়েছেন। কৃষ্ণরাম দাস *রায়মঙ্গল* রচনা করেছেন (রচনাকাল- ১৬৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) মঙ্গলকাব্যের আদলেই। বহু ক্ষেত্রে চণ্ডীমঙ্গলের সঙ্গে মিল রয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী নিজের পুজো প্রচারের জন্য কবিকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছেন কিংবা ছদ্মবেশে এসে তাঁদের মাহাত্ম্য কীর্তন করে কাব্য লিখতে বলেছেন। রামায়ণে রাম কথাই গুরুত্ব পেয়েছে। ভাগবতে কৃষ্ণের বাল্যকাল থেকে দ্বারকালীলা স্থান পেয়েছে।

পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য কীর্তন বা জাহের করা হলেও তাঁদের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাঁদেরও বিপদের সময় শরণাপন্ন হতে হয় আল্লার কাছে। কবিগণ সেই সমস্ত দেবদেবীর ভক্তও নন। তাঁদের নির্দেশ পেয়ে কাব্য লিখেছেন এমনটাও নয়। তাঁরা কাব্য লিখেছেন নিজেদের কবি ও শিল্পীসত্তার তাগিদ থেকে। মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৪) কোনো স্বপ্নাদেশ পেয়ে লেখেননি। তিনি জানিয়েছেন তাঁর কাহিনি লেখার ইচ্ছে ছিল না।

লিখিতে কাহিনী কেচ্ছা, নাহিক আছিল ইচ্ছা,
কি করিব জেদ করে সবে*
পুর্ব্বদেশ বাদাবন, সেথা হৈতে লোকজন,
আইসে যারা কেতাব লইতে
হামেসা খায়েস রাখে, জেদ কোরে কহে মোকে,
এই পুথি রচনা করিতে*
কহে সকলেতে ইহা, বোন বিবীর কেচ্ছা যাহা,
বিরচিয়া ছাপ যদি ভাই।।
সে হইলে দেশে২, পুঁথি মোরা অনায়াসে,
সকলেতে ঘরে বইসে পাই[১৭]

তাঁর এই উক্তিতে আধুনিকতার লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যযুগের মানুষ যেখানে দেবতাকে ভয় ও ভক্তি করত সেখানে মরহুম মুনশী জানাচ্ছেন তাঁর কাহিনি লেখারই ইচ্ছে ছিল না। বাদাবনের কিছু মানুষের জেদের জোরে তিনি লিখতে বাধ্য হয়েছেন। আবদুর রহীম সাহেব *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ) লেখবার প্রসঙ্গে বলেছেন-

যদিও লিখিনু কেচ্ছা খাহেস দোস্তের[২০]

খোদা নেওয়াজ পির গোরাচাঁদের কাহিনি যাতে বাংলায় সবাই জানতে পারে তার জন্যে লিখেছেন। তাঁর বন্ধু ছন্দের মিল করিয়ে দিয়ে সাহায্য করেছেন।[২১] এছাড়াও কবিগণ লোকদেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনি লিখতে বসে আল্লার বন্দনা দিয়ে গ্রন্থের সূচনা করেছেন।

কাহিনির নির্মাণকাল মধ্যযুগ হলেও চাম্পাবতী বনবিবির মধ্যে কয়েকটি ক্ষেত্রে আধুনিক নারীর প্রতিচ্ছবি উঁকি দিয়েছে। চাম্পাবতী তাঁর পছন্দের পুরুষকে বিবাহ করেছেন। প্রেমিককে পাবার জন্য তিনি ছলাকলার আশ্রয় নিয়েছেন। বনবিবি মাতা-পিতার সঙ্গে ফিরে না গিয়ে মাত্র সাত বছর বয়সে নিজ ইচ্ছাশক্তির জোরে আঠারো-ভাটির মা হয়েছেন। একটি মেয়েকে কেন্দ্রবিন্দু করে গ্রন্থের নামকরণ হয়েছে। সেই অর্থে আধুনিকতা উঁকি দিয়েছে বলা যায়।

গাজি ও চাম্পাবতীর প্রেমের মধ্য দিয়ে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছে। প্রেম সম্পর্কে কবি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এই জগৎ একে অপরে প্রেমের সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে আছে।

মৃত্তিকা গগণ শশী রবি তারা দিবা নিশি
আছে সব প্রেমের ভরেতে
সে ধন হইল ভিন্ন কার না রহিবে চিহ্ন
সর্ব্বনাশ হবে নিমিশেতে।।[২২]

আব্দুর রহিম সাহেব জীবন থাকতে প্রেম করতে বলেছেন। এখানে আধুনিকতার লক্ষণ ফুটে উঠেছে। কালু গাজিকে বুঝিয়েছেন নারীর ধ্যান করলে খোদাকে হারাতে হবে, কিন্তু গাজি তা মানতে নারাজ। গাজি সেই ধ্যানেই খোদাকে লাভ করার কথা বলেছেন। কালু জানিয়েছেন খোদার কোনো আকার নেই, কিন্তু গাজির মতে-

যত মুর্ত্তী সকলি তাঁহার।[২৩]

গাজি প্রেমের টানে ফকিরের ধর্ম ভুলেছেন।

কালু বলে প্রেমে প্রাণ যদি যায় গাজী বলে সর্গে গিয়া পাইব তাহার[২৪]

সমন্বয়ের যুগে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আপন করে নেওয়ার পাশাপাশি তাদের দেবদেবীকেও আপন করে নিয়েছে, তারই ফলস্বরূপ সৃষ্টি হয়েছে মঙ্গলকাব্য। কিন্তু পির-গাজি-বিবি এই সমস্ত দেবদেবীর উৎপত্তি অন্য এক ইতিহাসের কথা বলেছে। হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর এক হয়ে এই সমস্ত লোকদেবদেবীর উৎপত্তি ঘটিয়েছে। অষ্টাদশ শতকের শেষের দিক থেকে হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনি মুসলমান পির পিরানির কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করেছে[২৫] এই দিক থেকে এই কাহিনিগুলির গুরুত্ব রয়েছে।

লোকসংস্কৃতিবিদ গিরীন্দ্রনাথ দাস উল্লেখ করেছেন, পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলিই প্রথম দলিল যেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সংস্কৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখানে প্রথম বাঙালি মুসলমানের সমাজচিত্র আমরা লক্ষ করি। পির সাহিত্যের রসমূল্য যতই কম থাক সমাজচিত্র হিসেবে তার সাহিত্য মূল্য কোনোদিন অপাংক্তেয় হবে না।[২৬] এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাঙালি সংস্কৃতি অখণ্ড রূপে স্থান পেয়েছে।

সন্তজীবনী সাহিত্যে যেমন কোনো একজন মানুষকে ঘিরে নানা অলৌকিক কাহিনি গড়ে উঠেছে ঠিক তেমনি পির-গাজি-বিবিদের জীবনের নানা ওঠাপড়া দেখানো হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্য যখন দেবনির্ভর তখন এই সমস্ত কাহিনিগুলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হবার পাশাপাশি তাঁদের মানবিক রূপও বর্ণিত হয়েছে।

### ১.গ. গ্রন্থ সমূহের নামকরণ প্রসঙ্গ:

‘বনবিবি’ শব্দের সমাস বিশ্লেষণে বলা যায়- বনের বিবি। অথবা বনে রক্ষাকারী বিবি। কাজী রফিকুল হক ‘বিবি’ সম্বন্ধে জানিয়েছেন, বিবি মুসলমান মহিলার সাধারণ পদবি। সম্বোধনেও ব্যবহৃত হয়। স্ত্রী, বধূ, পত্নী হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। ইয়রোপীয় রমণী অর্থে (সাহেব-বিবি) ব্যবহৃত হয়। কর্ত্রী অর্থে বিবি, রমণী মূর্তি চিহ্নিত তাস বিশেষ (সাহেব, বিবি)। আরামপ্রিয় নারী অর্থে বিবি আর্থাৎ বিবিসাজা কিংবা বিবিয়ানা কথাটি ব্যবহৃত হয়। বিবিজান শব্দটি ব্যবহৃত হয় বধূর প্রতি প্রিয় সম্ভাষণ বা প্রেয়সী নারী অর্থে।[২৭] ‘বিবি’ শব্দের উৎস হল ফারসি।

বনবিবিকেন্দ্রিক আচার-অনুষ্ঠান, পুজো, হাজত ভাবনা বিশ্লেষণে জানা যায় ইনি আঞ্চলিক দেবী। সুন্দরবনের জলাজঙ্গল ও কৃষিভূমি যাঁদের জীবন-জীবিকার একমাত্র ক্ষেত্র

তাঁরাই মুখ্যত বনবিবির পুজো করে। সুন্দরবনের জঙ্গলে শ্বাপদসংকুল ও নদীনালায় কামট, কুমিরের ন্যায় হিংস্র প্রাণী বাস করে। এরাই মুখ্যত সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র ও পরিবেশ রক্ষাকারী প্রাণী। জঙ্গলজীবী ও মৎস্যজীবী মানুষ এদের কবল থেকে জলজ ও বনজসম্পদ আহরণ করতে গিয়ে হত বা আহত হয়। জীবন নির্বাহের তাগিদে বনবিবি নামক কাল্পনিক মাতৃকা শক্তির উপর ভরসা ও আস্থা রেখে নৌকা নিয়ে জঙ্গলে যায়। তাদের ধারণায় সুন্দরবন হল বনবিবির মহল বা আস্তানা। মায়ের কৃপায় তাঁর আস্তানায় কোনো প্রকার অন্যায়-অত্যাচার বা অশুচিমূলক কাজকর্ম না করলে বিপদ ঘটে না। সে কারণেই হিন্দুরা এই দেবীকে বলেন বনদেবী, বনচণ্ডী বা বনদুর্গা, মুসলমানগণ বলেন বনবিবি।

জঙ্গলে হিংস্র বাঘ, কুমিরের কবল থেকে কেবল বনবিবি বাঁচাতে পারেন এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে এক শ্রেণির জঙ্গলজীবী মানুষ বনবিবির মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে নানা গল্প, কথা, উপকথা, ইত্যাদি সৃষ্টি করেছেন এবং ভক্তির আতিশয্যে তাঁকে পুজো হাজত দিয়েছেন। বনবিবিকেন্দ্রিক প্রচলিত এই লোককথাকে অবলম্বন করে অনেক কবিই সুসংবদ্ধ কাহিনি, পালাগান রচনা করেছেন।

কাহিনির মধ্যে বনবিবি ও শাজঙ্গলির জন্মকথা, ধোনা মৌলের মহলযাত্রা, মহলযাত্রী দুখের বনবিবি কর্তৃক বাঘরূপী দক্ষিণরায়ের কবল থেকে রক্ষার কাহিনি করুণ রসঘন ভাবে বর্ণিত হয়েছে। বনবিবি দুখেকে আপন সন্তান রূপে গ্রহণ, তাকে অফুরন্ত ধনসম্পদ প্রদান ও ধোনার কন্যা চাম্পাবতীর সঙ্গে বিয়ের কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। বনবিবির কৃপা হলে মহলযাত্রীর যে কেউ বাঘের কবল থেকে প্রাণে বাঁচতে পারে, কুমির তার অনুগত হতে পারে এবং বহু সম্পদের অধিকার পেয়ে প্রতিষ্ঠা পেতে পারে বলে লোকবিশ্বাস। বনবিবি গাজি এবং দক্ষিণরায়ের কাছ থেকে দুখের জন্য ধনসম্পত্তি চেয়ে বলেছে-

বিবী বলে তুমি যদি ধন ওরে দিবে।। কহ কি রূপেতে দুখে বহিয়া লে যাবে*
গাজি বলে তার জন্যে না ভাবিও তুমি।। দুখে ঘরে গেলে বোয়ে দিব আমি*
... ... ...
রায় বলে মোম মধু আমার সৃজন।। আঠাঁর ভাটির মধ্যে এই মোর ধন।
যাহা চাবে তাহা আমি দিব অনায়াসে।[২৮]

আরেক মতে বনবিবি হলেন বোন (Sister) জ্ঞানে 'বোনবিবি'। ইসলামে পুজো নিষিদ্ধ আবার 'নারী' পুজো শাস্ত্র বিরোধী হওয়ায় ধর্মান্তরিত মুসলমানগণ কেবল সংস্কারবশত বনদেবীকে বনবিবি রূপে হাজত দেন। সম্ভবত এই কারণেই পুথিতে দেবীকে 'বোনবিবি' বলা হয়েছে।[২৯] বনবিবি শব্দটি যেভাবেই বাখ্যা করা যাক না কেন এখানে দুটি সংস্কৃতির স্রোত এসে মিলেমিশে একাকার হয়েছে তা স্পষ্ট।

কাহিনির মধ্যে বনবিবির মাহাত্ম্য জাহির অর্থাৎ প্রকাশ পেয়েছে তাই মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* নামকরণ যথাযথ। মানুষের বিপদে এই সমস্ত দেবদেবী কীভাবে রক্ষা করেছেন তার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-তে বনবিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রতি মাতা-পিতার অন্যায়-অবিচারকে তিনি মাপ করে দিয়েছেন। মা বনবিবি দক্ষিণরায় ও নারায়ণীর সৈন্যসামন্তের সঙ্গে যুদ্ধ করে আঠারো-ভাটির অধিকারিণী হয়েছেন। নারায়ণী যুদ্ধে হেরে গেলেও তাঁকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আঠারো-ভাটি কেবল নিজের অধিকারে না রেখে সমস্ত প্রধানদের মধ্যে ভাগ করেছেন। তিনি দক্ষিণরায়ের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন।

খোদা নেওয়াজ *পীর গোরাচাঁদ*-এর কাহিনিকে কেচ্ছা বলেছেন। গবেষক দেবব্রত নস্কর 'কেচ্ছাকাহিনির ধারা' সম্বন্ধে বলেছেন-

> লৌকিক স্তরে পরিবেশিত পালাগানগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমটি পাঁচালি পালার ধারা এবং দ্বিতয়টি কেচ্ছা কাহিনির ধারা। পাঁচালি পালার যে ধারা রয়েছে সেটি হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করে লেখা হয়েছে। কেচ্ছাকাহিনির যে ধারাটি লেখা হয়েছে সেটি পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যের ভিত্তিতে লিখিত।[৩০]

গোরাচাঁদের জন্মবৃত্তান্ত কিংবা পিতা-মাতার নাম জানা যায় না। কেবলমাত্র তাঁর ইসলাম ধর্মপ্রচার করে বিভিন্ন দেশ জয়, এবং জীবনের করুণ পরিণতির কথা জানতে পারা যায়। অলৌকিক ক্ষমতার বলে যুদ্ধজয়ের কাহিনি লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে নিজের জীবনের করুণ দশা মোচন করতে পারেননি। যুদ্ধে তাঁর অর্ধেক গলা কেটে যায়। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। গয়লাদের দিয়ে কবর খুলিয়ে নিজের দেহ কবরস্থ করেন। গোরস্থানে থেকেও তিনি অসহায় মানুষের পাশে সর্বদা থেকেছেন। কবি তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার কথা বারেবারে বিবৃত

করেছেন। সম্পূর্ণ কাহিনি জুড়েই পির গোরাচাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। তাই কবি গ্রন্থের নামকরণ করেছেন গোরাচাঁদের নামেই। এই অর্থে গ্রন্থটির নামকরণ স্বার্থক।

আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩) গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনি বিস্তৃত আকারে বর্ণিত হয়েছে। এই তিনটি চরিত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। গাজির জন্মবৃত্তান্ত, পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য হয়ে ফকির হওয়া, বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা, চাম্পাবতীর সঙ্গে প্রণয় ও বিবাহ, মটুক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ, ইসলাম ধর্মের প্রসার প্রভৃতি ঘটনা লিপিবদ্ধ রয়েছে। গাজির সঙ্গে কালু ও চাম্পাবতী নামটি অঙ্গাঙ্গী জড়িয়ে রয়েছে। কালুর জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনার পরে নামটি গাজির সঙ্গে স্থান পেয়েছে। তাঁরা সহদর না হলেও রাম লক্ষ্মণের মতো দুজনের ভাতৃত্ব সুলভ আচরণ লক্ষ করা গিয়েছে। গাজি রাজসুখ ত্যাগ করলে কালুও তাঁর সমস্ত সুখ ত্যাগ করে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েন। গাজি ও কালু নানা দেশ পরিভ্রমণ কালে বিচিত্র আভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাঁরা অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ান আবার কখনও নিজেদের অপমানের বদলা নেন। পরিদের সহায়তায় গাজির সঙ্গে চাম্পাবতীর মিলন হয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। হিন্দু কন্যাসন্তান চাম্পাবতী ইসলাম ধর্মাবলম্বীকে জীবনসঙ্গী করতে চাওয়ায় তাঁর জীবনে নানা ঝড় আসে। বিবাহের পরে তাঁর সুখের জীবন ভেঙে যায়। ফকিরের সঙ্গে বিয়ে করে ফকিরনি হয়ে পথেঘাটে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। গাজির কাছ থেকে পেতে হয়েছে অবহেলা। সমগ্র কাহিনিতে গাজি, কালু ও কন্যা চাম্পাবতীর কথা বিবৃত হয়েছে। তাই নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলা যায়।

সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত এবং কর্মকাণ্ডের বিবরণ রয়েছে। সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে নিজে আগ্রহী হয়ে মানুষের উপকার করেছেন। একটি ভক্তমণ্ডলীও গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। নামকরণে সত্যনারায়ণ, সত্যপির, নারায়ণদেব কথাটি পাওয়া গিয়েছে। সত্যনারায়ণ এবং সত্যপির অভিন্ন তাই এইরূপ নামকরণ। কয়েকটির নাম উল্লেখ করলেই বিষয়টি বোঝা যায়। *সত্য পীরের পুথি, সত্যপীর পাঁচালী, সত্য-নারায়ণের পুথি* (১১৬২ সন, ১৮ই বৈশাখ রচনা), *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি, সত্যনারায়ণ কথা, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ কথা, নারায়ণদেবের পাঁচালী,* প্রভৃতি। প্রতিটি নামকরণ করা হয়েছে বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে। সেক্ষেত্রে নামকরণ যথার্থ হয়েছে বলা যায়।

## ১.ঘ. কবি প্রসঙ্গ:

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক দেবদেবীর কাহিনি রচয়িতারা অত্যন্ত বিনয়ী মানুষ। কেউবা ভক্তির আতিশয্যে রচনা করেছেন। এঁদের কেউ প্রতিষ্ঠিত লেখকও ছিলেন। যাঁরা ভক্তদের বিশেষ অনুরোধে রচনা করেছেন। কবিগণ নিজেদেরকে হীন কখনও মূর্খ বলেছেন। আল্লার নাম করে সকলে কলম ধরেছেন। তাঁদের অনেকেই নিজের লেখার ভুলত্রুটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। গ্রন্থের সূচনা এবং সমাপ্তিতে আল্লা, সকল গুরুজন, পিরের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন।

### খোদা নেওয়াজ

খোদা নেওয়াজ সকলের বোঝার সুবিধার জন্যে *পীর গোরাচাঁদ*-এর (প্রকাশকাল- অজ্ঞাত) কেচ্ছা বাঙ্গালা জবানে শুরু করেছেন। তবে তাঁর জবানবন্দি শুনে মনে হয় তিনি স্বল্প অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ ছিলেন।

মুর্খ হয়ে তারিফ তার কেমনে করিব।। কহিলে জেন্দেগী ভর তবু না পারিব*[৩১]

তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর জ্ঞান নিতান্ত কম। তাই ভুল হবার সম্ভাবনাও রয়েছে।

শাহা গোরা চাঁদের কেচ্ছা বাঙ্গালা জবানে।। তৈয়ার করিব সবার বুঝিবার কারণে*[৩২]

তাঁর এই বিনয় বৈষ্ণবভক্ত কবিদের বিনয়ের সমতুল্য। বৈষ্ণব কবিগণ নামের পর দাস শব্দটি ব্যবহার করে রাধা, কৃষ্ণ কিংবা চৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেছেন। যেমন- বৃন্দাবনদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস। খোদা নেওয়াজ বলেছেন-

আমি কি লিখিব যাহা পয়ম্বর নারে*
আমি অতি মূর্খ মতি কিবা বিদ্যা জানি।[৩৩]

কবি পিরকেন্দ্রিক কাহিনি লিখতে বসেও আল্লার প্রতি ভয়, ভক্তি এবং ভরসা দেখিয়েছেন। প্রথমে তিনি আল্লাকে স্মরণ করে বন্দনা করেছেন এবং সবার উপরে আল্লার স্থান দিয়েছেন।

পহেলা আরজ করি নামেতে আল্লার।। চৌদ্দ ভুবন বিচে যার অধিকার[৩৪]

তিনি কাহিনি শুরু করার আগে সকলের পায়ে ছালাম (সালাম) জানিয়েছেন।

জেন্দেগী বেওফা বড় পারি কিনা পারি*
একারনে ছালাম করিয়া সবার পায়।।

পুথিকে করিব শুরু শোনহে সবায়*৩৫

খোদা নেওয়াজ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে জানিয়েছেন- তাঁর গৃহ বর্ধমান জেলার খেজুরহাটি গ্রামে। পিতার এক্রামদ্দীনের তিন পুত্রের মধ্যে কবি মধ্যমপুত্র ছিলেন। বড়োভাইয়ের নাম অজেদ আলি। ছোটোভায়ের নাম নবিরদ্দীন। কবির বন্ধু রমজান উল্লা তাঁকে লেখার কাজে অনেক সাহায্য করেছেন। কবি গোরাচাঁদের কেচ্ছা রচনা করে বন্ধুর বাড়ি চানক শহর বিচে পলতা পাড়ায় শোনাতে গিয়েছিলেন। কেচ্ছা শুনে কবির বন্ধু খুবই খুশি হয়েছেন। তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বাক্যের শেষের কিছু পদ মিলিয়ে দিয়ে উপযুক্ত পদ বসিয়ে দিয়েছিলেন।

বহুত মেহ্নতে তিনি দোরস্ত করিল।। পদে পদে ওজন দিয়া মেলাইয়া দিল*'৩৬

কবির এইরূপ স্বীকারোক্তির মধ্যে দিয়ে বোঝা যায় তিনি ভক্ত কম শিল্পী বেশি। তাঁর মধ্যে কবিসত্তা বেশি জাগ্রত হয়েছে।

প্রথমে আল্লার বন্দনা কিংবা পির গোরাচাঁদের মাহাত্ম্য-কাহিনি লিখলেও কোথাও তাঁকে ভক্ত মনে হয় না। তিনি ভুল-ত্রুটি, অন্ত্যমিল নিয়ে বেশি মনোযোগী। কাহিনিটি প্রকাশ এবং পাঠকদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সে বিষয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। কোনো ভুল থাকলে পাঠকদের কাছে বারংবার মাপ চেয়ে নিয়েছেন।

কোনখানে দোষ ঘাট যদি মোর পাবে।।    মেহের করিয়া মোরে মাফ যে করিবে*৩৭

কবি তাঁর লিখিত কেচ্ছা ছাপবার জন্য খুবই ব্যাকুল হলে বন্ধুই এই কাজে সাহায্য করেছেন। কেচ্ছাটি ছাপিয়েও দিয়েছেন। তাই কবিও তাঁর হয়ে গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। ছাপার কিছু ভুলভ্রান্তি থাকলে পাঠকের কাছে মাপ চেয়েছেন।

তাহার যে দোষ কেহ না ধরিবে।।    দোষ ঘাট পাইলে তার মাফ করে দিবে*৩৮

কবি মনে করেছেন তাঁর এই কেচ্ছাটি পড়লে পাঠকের ভালো লাগবে।

কাহিনি বর্ণনাকালে কবির মধ্যে সৌন্দর্য চেতনা প্রকাশ পেয়েছে। হাতিয়াগড় রাজ্যের প্রাকৃতিক শোভা তিনি বর্ণনা করেছেন। তিনি এমন একজন মানুষ যিনি সকলের মঙ্গল চেয়েছেন। পাঠকের আশীর্বাদ (দোয়া) প্রার্থনা এবং পাঠকের মঙ্গলকামনা করে তিনি কেচ্ছা শুরু করেছেন। সমাপ্তিতেও সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। তিনি কেবল মা, বাবা,

ভাই, বন্ধুরই ভালো চান তা নয়, সকল মুসলমানেরই ভালো চেয়েছেন। তাঁর প্রার্থনা সকলের আল্লা ও নবিকে ভজনা করে যেন দিন কেটে যায়।

**আব্দুর রহিম সাহেব**

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে কবি নিজেকে হীন বলে নিজের পরিচয় জ্ঞাপন করেছেন।

আবদুর রহিম আমি হীনের বচন।। পরিচয় শোন মোর কোথায় ভবন*
ময়মনসিংহ জেলা বাস গলাচিপা গ্রামে।। আসুত্ত্যার বাজারে উত্তর পশ্চিমে*
বাটি দক্ষিনে নদী নশুন্দা নালাতে।। মহকুমা কিশোর গঞ্জের অধিনেতে*
জোয়ার হোসেনপুর তার অন্তঃপাতি।। আছি কতদিন আমি করিয় বসতি*[৩৯]

কবি নিজের জন্মসাল বিষয়ে কিছু বলেননি। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান* (১৯৯২) থেকে জানা যায় আব্দুর রহিম সাহেব *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-টি রচনা করেছেন- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তিনি অনুমান করেছেন চল্লিশ বছর বয়সে তিনি কাব্যটি যদি লিখে থাকেন তবে তাঁর জন্ম হয়েছে ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে।[৪০]

কবি প্রভু সম্বোধনে কাহিনি শুরু করেছেন এবং তাঁর লেখায় পুজো কথাটির ব্যবহার রয়েছে।

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরঞ্জন'। পুজিবার যোগ্য সেই সকলের মূল[৪১]

মুসলমানদের মধ্যে পুজোর বদলে 'হাজত' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পুজো শব্দটি হিন্দুদের মধ্যে ব্যবহৃত হয়। আরেকটি বাক্য 'পতিত পাবন প্রভু করুণা সাগর'। পতিতপাবন কৃষ্ণকে বলা হয়। সেখানে কবি বন্দনা অংশে পতিতপাবন শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন-

দয়া করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান[৪২]

এখানে দেখবার বিষয় যে কবি মুসলমান হয়েও স্বর্গে স্থান পেতে চেয়েছেন। 'স্বর্গ' শব্দটি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত, মুসলমানরা বলেন বেহেস্ত। হিন্দুদের মধ্যে এই বিশ্বাস আছে যে বেঁচে থাকতে ভালো কাজ করলে মৃত্যুর পর স্বর্গে যায়। যদিও বলা হয় ভাষার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট

ধর্মভেদ নেই। তবু মনে হয় কবির পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন। কবি পাঠককে প্রণাম করে গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন।

*বোন বিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-র রচয়িতা আবদুর রহীম সাহেব

কবির নিবাস ভুরশুটের কানপুরে। তিনি মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেবের মতো গ্রন্থ রচনার কারণ বর্ণনা করেননি। তিনি বনবিবির কাহিনি লেখা শুরু করলেও বিসমিল্লা বলে কলম ধরেছেন। আল্লার প্রশংসার পর বনবিবি সংক্রান্ত কাহিনিতে প্রবেশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য খুবই সহজ সরল। এই গ্রন্থে তিনজন কবির নাম পাওয়া যায়। সেই তিনজন ব্যক্তি একই ব্যক্তি নাকি আলাদা তা জানা যায় না। গ্রন্থের প্রথমে আব্দুর রহীম সাহেবের নাম পাওয়া যায়। ধোনা মৌলে দুখেকে নিয়ে বাদাবনে মোম-মধু আনতে যাবার প্রসঙ্গে প্রবেশের পূর্বে আছিরদ্দিনের নাম পাওয়া যায়। যাঁর নিবাস চব্বিশ পরগনায়।

শোন এলে ধোনা মৌলে কাহিনী দুখের*
কহে হীন আছিরদ্দিন জনাব সবার।।
চব্বিশ পরগণা বিছে বসতি যাহার*[৪৩]

গ্রন্থ সমাপ্তিতে তিনি বলেছেন-

| | |
|---|---|
| তেরোশ পাঁচ সাল বারই ফাল্গুণে।। | কলমে বিদায় করিলম ভেবে গুণে* |
| বলে মেহাম্মদ মুনশী জনাবে সবার।। | ভুরসুট কাণপুরে বসতি আমার*[৪৪] |

এখানে আরেকটি নাম পাওয়া যায় মেহাম্মদ মুনশীর। মেহাম্মদ মুনশী কেবল নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন ভুরসুট কাণপুরে তাঁর বসতি। তিনি শায়েরী করতে জানেন না। বন্ধুর ইচ্ছায় কেচ্ছা-কাহিনিটি লিখেছেন। তিনি আল্লার দরগায় মোনাজাত বা প্রার্থনা করে নবির সাক্ষাৎ পেতে চেয়েছেন।

| | |
|---|---|
| আল্লা পাক আমায় যদি তরান হাসরে।। | আমি অতি গোনাগার খোদার দরবারে* |
| হামেসা দরগার এয়ছা করি মোনাজাত।। | হাসরেতে পাই যেন নবীর সাক্ষাত* |
| দখল না আছে মেরা এই এলেমেতে।। | সারিয়া লইবে আপনার বুজরগিতে*[৪৫] |

গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) রচয়িতা আব্দুর রহিম সাহেব এবং বোন বিবি জহুরানামা কন্যার পুথি (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ) রচয়িতা আব্দুর রহীম সাহেব একই ব্যক্তি নয়। তাঁদের বাসস্থান এবং

পরিচয় সূত্রে জানা যায়। *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* রচয়িতা আব্দুর রহীম সাহেব খোদার দরগায় সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত কালে আল্লার আদেশ পেয়েছেন এবং সেই আদেশ মতো তিনি লেখায় প্রণোদিত হন। কবি সবিনয়ে জানিয়েছেন তিনি শায়েরী (কবিত্ব, ইসলাম ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব) জানেন না। কেবল আল্লার ইচ্ছা পূরণ করতে কলম ধরেছেন। আসরে খোদার নিকট নিজের গোনাগার ব্যক্ত করে নবীর সাক্ষাৎকার প্রার্থনা করেছেন। নিজের পরিচয় দিয়েছেন একজন পালাগায়ক হিসেবে। কবি তাঁর লেখার বা বক্তব্যের ভুলভ্রান্তি বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। আসরে উপস্থিত জ্ঞানীগুণী শ্রোতাদের নিকট নিজের অক্ষমতা ব্যক্ত করেছেন। পিতৃ পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন-

কহে মোহাম্মদ মুনসী জনাবে সবার।।　　ভুরশুট কামপুরে বসতী আমার*
শেখ দারাজতুল্লা জান আমার ওয়ালেদ।।　　আল্লাতালা পুরা করে দেলের মকছেদ*[৪৬]

কবি নিজেকে নানারকম নাম এবং বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। নিম্নে তার পরিচয় দেওয়া হল-

ক) মোহাম্মদ মুনশী কহে আয় পাকজাত।। (পৃ. ১)

খ) কহে হীন করিবার ভাবিয়া রব্বানা (পৃ. ১৪)

গ) অধম ছাদেক মুনশী পয়ারে চলিল (পৃ. ১৫)

ঘ) কহে হীন গোনাগার পয়ারে রচিয়া (পৃ. ১২)

ঙ) কহে হীন আছিরদ্দিন জনাব সবার।। (পৃ. ১৯)

চ) সেখ মোহাম্মদ মুনশী শয়ারে রচিত (পৃ. ৩৪)

ছ) কহে মোহাম্মদ মুনশী আল্লা করি সার।।
বিবী যাকে বেটা বলে ভয় কি তাহার* (পৃ. ৩৬)

জ) মোহাম্মদ মুনশী কহে এলাহি ভাবিয় (পৃ. ৪৩)

এই কারণে কবির নাম নিয়ে একটা সংশয় দেখা দেয়। গ্রন্থের ওপরের পাতায় আব্দুর রহীম সাহেবের নাম রয়েছে। আবার ভেতরে এই লাইনগুলি মোহাম্মদ মুনশী এটা থেকে অনুমান যে কবি দুই নামেই পরিচিত ছিলেন। 'মুনশী' শব্দের অর্থ হল লেখক অথবা উর্দু শিক্ষক বা বিদ্বান ব্যক্তি। কবি সম্ভবত নিজেকে লেখক হিসেবেই তুলে ধরতে চেয়েছেন।

**মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব**

১৩৯৪ সালে প্রকাশিত *বোন বিবী জহুরা নামা*-য় (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) কবির নাম রয়েছে মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব, কিন্তু ১৪১৬ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে কবির নাম আছে মোহাম্মদ খতের সাহেব। তবে দুই ক্ষেত্রেই কবি একই ব্যক্তি এবং কাহিনি রচনাও এক। অর্থাৎ 'মরহুম মুনশী' কথাটি কবির উপাধি হতে পারে। কবি নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে বালিয়া গোবিন্দপুরে তাঁর বসতির কথা জানিয়েছেন।

কাহিনির সূচনায় আল্লার জয়ঘোষণা করেছেন। তিনি নিজের ক্ষমতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাঁর এমন ক্ষমতা নেই যে তিনি আল্লার প্রশংসা করতে পারেন। তিনি মনে করেছেন চৌদ্দ ভুবনে যা কিছু আছে আল্লার কৃপায় হয়েছে। কাহিনি লেখার পূর্বে তাঁর শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের প্রণাম জানিয়েছেন। মা, বাবা, গুরু, পির, মুরুব্বি, দোয়াগীর, সকলকে তিনি বন্দনা করেছেন।

সূচনায় আল্লা এবং গুরুজনের প্রতি বন্দনা দেখে মনে হয় শিল্পী কিংবা কবি হতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিনয়। খতের সাহেব কবি হিসেবে বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর কাহিনি লেখার ইচ্ছে ছিল না। বাদাবন অর্থাৎ সুন্দরবনে বনবিবির ভক্তরা তাঁর মাহাত্ম্য-কাহিনি লিখে দেওয়ার জন্য জেদ করেছিল। তাই কবি বনবিবি সংক্রান্ত কাহিনিটি লিখেছেন।

কহে সকলেতে ইহা, বোন বিবীর কেচ্ছা যাহা,
বিরচিয়া ছাপ যদি ভাই।।
সে হইলে দেশে২, পুথি মোরা অনায়াসে,
সকলেতে ঘরে বৈসে পাই*
শুনিয়া এয়ছাই কথা, দেলেতে পাইয়া ব্যথা,
ভেবে গুনে আখেরে তখন।।
বোন বিবী কেচ্ছা যাহা, আওয়াল আখেরে তাহা,
একে একে কৈনু বিরচন*[৪৭]

খতের সাহেব একজন বড়ো মাপের কবি হয়েও কাহিনি রচনাকালে সকলের কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করেছেন। সকলের মঙ্গল চেয়েছেন। নিজেকে আল্লার বান্দা বলে পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর লেখায় অদ্ভুত এক বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। কবি নিজের সম্পর্কে খুবই অল্প

কথা বলেছেন। কাহিনির পরিসমাপ্তিতে তিনি আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞ থেকেছেন। কিছু ভুল থাকলে কবি বিনয়পূর্বক পাঠকের কাছে মাপ চেয়েছেন। পরিসমাপ্তিতে তিনি বলেছেন-

মোহাম্মদ খাতের কহে দিনদার সবে।।    দোষ খাতা ভুল চুক নাহিক ধরিবে*
মেজাজেতে নাহি ঠিক কিয়া লিখি পড়ি।।    বিরচিনু লোকের খাহেস দেখে ভারি*[৪৮]

**সত্যপির কাব্যধারার কবি:**

ওয়াকিল আহমদ *বাংলার লোক-সংস্কৃতি* (১৯৮৩) গ্রন্থে বলেছেন-

> বাংলাদেশে সত্যপীরের প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক। অজ্ঞাত পরিচয় পল্লীকবি থেকে উচ্চ শিক্ষিত সভাকবি সকলেই সত্যপীরের ছড়া-কথা, পুঁথি-পাঁচালি রচনা করেছেন। শিক্ষিত কবিদের মধ্যে আছেন ষোল শতকের গোড়ার দিকে কবি কঙ্ক, শেষের দিকে ফয়জুল্লাহ, আঠারো শতকে বিদ্যাপতি, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, ভারতচন্দ্র, গরীবুল্লাহ, শঙ্কর আচার্য, কৃষ্ণ হরিদাস প্রমুখ পুঁথি ও পাঁচালি রচয়িতা। লোকসাহিত্যের ছড়া, ব্রতকথা ও পালাগানের ভেতর দিয়ে সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। কঙ্ক ময়মন সিংহের কবি। ফয়জুল্লাহ কুমিল্লার (মতান্তরে দক্ষিণ রাঢ়), ভারতচন্দ্র বর্ধমানের, গরীবুল্লাহ হুগলির, রামেশ্বর মেদিনীপুরের।[৪৯]

কবি ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২-১৭৬০) সত্যনারায়ণ উৎসব উপলক্ষে পাঁচালি রচনা করেছেন। *মৈমনসিংহ গীতিকা*-য় ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালায় সত্যপিরের প্রসঙ্গ রয়েছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ‘কঙ্ক ও লীলা’ পালাটি প্রাচীন বলেছেন। কবি কঙ্কের লেখা সত্যপির পাঁচালিটির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।[৫০] মুহম্মদ আয়ুব হোসেন *সত্যপীর প্রসঙ্গে* প্রবন্ধে সত্যপির-সত্যনারায়ণ পাঁচালি রচয়িতাদের একটি দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রায় পঁচিশটি সত্যনারায়ণ পুথি সম্পাদনের কথা বলেছেন।[৫১] ওয়াকিল আহমদ জানিয়েছেন-

> ষোল শতকের গোড়ায় কবি কঙ্ক সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক কাব্য বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন। ঐ শতকের শেষের দিকে শেখ ফয়জুল্লাহ ‘সত্যপীর কাব্য’ রচনা করেন। ...ষোল শতকের মাঝামাঝি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যে পীরের উদ্দেশ্যে শিরনী ও দরগায় বাতি দেওয়া এবং পীরের নাম জপ করার কথা বলেছেন।[৫২]

মোছান্নেফ মুন্শী ওয়াজেদ আলি রচিত *সত্য পীরের পুথি* থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি তুলে ধরলে কবির ভক্তিসুলভ আচরণের পরিচয় পাওয়া যায়। সত্যপিরের প্রতি কবির কয়েকটি উক্তি নিম্নে তুলে ধরা হল-

ক) হুকুম সত্যের যে অধিন গরিব গায়* (পৃ. ২৭৫)
খ) সত্যের কদমে যে হীন ফকির গায়।। (পৃ. ২৭৯)
গ) আধীন গরীব কহে সত্যপীরের পায়* (পৃ. ২৮৩)
ঘ) সত্যের কদম তলে/অধীন গরীব বলে/আমি বান্দা বড় গোনাগার* (পৃ. ২৮৬)
ঙ) সত্যের কৌউসতলে, অধিন গরীব বলে, আসর সহিত দিবে বর*' (পৃ.২৮৭)
চ) অধিন গরীব বলে সত্যপীর সখা।। সাক্ষাতে আসিয়া পীর মোরে দিবে দেখা*' (পৃ. ২৮৯)

এখানে তিনি বারংবার হীন এবং গরিব বলে বিনয় প্রকাশ করেছেন।

## ১.ঙ. পূর্বসূরির রচনা প্রসঙ্গ:

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনি, পুজো পদ্ধতি, মেলা, তাঁদেরকে ঘিরে যাবতীয় তথ্য একদল গবেষক ঐতিহাসিকের মতো লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাঁদেরকে ঘিরে অনেক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধও লিখেছেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন- ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, সুকুমার সেন, ওয়াকিল আহমদ, ড. দেবব্রত নস্কর, সুজিত মণ্ডল, অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। লোকায়ত দেবদেবীকেন্দ্রিক বিভিন্ন তথ্য তাঁদের গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।

### গিরীন্দ্রনাথ দাস

গবেষক তাঁর গ্রন্থে *বাংলা পীর সাহিত্যের কথা*-য় (১৯৭৬) বড়খাঁগাজির পরিচয় দিয়েছেন।[৫৩] সেখানে আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র প্রকাশকাল সম্পর্কে জানা যায়। প্রকাশকালটি হল- ১৩৭৪ সাল।[৫৪] তিনি মোবারকগাজি এবং বড়োখাঁ বা বড়খানগাজিকে বলেছেন অভিন্ন[৫৫] সেই কারণে বড়খান গাজির আলোচনা প্রসঙ্গে মোবারক গাজির আলোচনা করেছেন। আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, সতীশচন্দ্র চৌধুরীর *কালু গাজী চাম্পাবতী* নাটকের কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

সুন্দরবনে আঞ্চলিক লোকদেবতা হিসেবে দেবী বনবিবি বহুচর্চিত। ড. গিরীন্দ্রনাথ দাস বনবিবি সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন।[৫৬] মুনশী মোহম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা*-র (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ) কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। এছাড়া বনবিবি সংক্রান্ত আচার-আচরণ, পুজো পদ্ধতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বনবিবি সংক্রান্ত তিনজন পাঁচালিকারের নাম করেছেন। যেমন- বয়নদ্দিন, মুনশী মোহাম্মদ

খাতের ও মোহাম্মদ মুনশী সাহেব। মোহাম্মদ মুনশী সাহেবের পাঁচালি কাব্যের কাহিনি সংক্ষেপ, সতীশচন্দ্র চৌধুরীর *বনবিবি* নাটকের পরিচয় দিয়েছেন।

গোরাচাঁদের প্রসঙ্গ আলোচনায় গোরাচাঁদের ব্যক্তি পরিচয়, তাঁর বাড়ি, মাহাত্ম্য-কাহিনি বর্ণনা করেন।[৫৭] গোরাচাঁদের লৌকিক এবং অলৌকিক কাহিনি বিভিন্ন গ্রন্থে পাঁচালি আকারে কিংবা নাটকের আকারে বর্ণিত রয়েছে। বিভিন্ন পাঁচালি কাব্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন। যেমন- মহম্মদ এবাদোল্লার লেখা- *পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী*, মুনশী খোদা নেওয়াজের- *পীর গোরাচাঁদ পাঁচালী*, আব্দুল গফুর সিদ্দিকী প্রণীত *বাংলা পীর হজরত গোরাচাঁদ রাজী*, মোহাম্মদ হরমুজ আলী রচিত *গোরাচাঁদ ও চন্দ্রকেতু*। বিভিন্ন পত্রিকাতেও পির গোরাচাঁদের কাহিনি বর্ণিত হওয়ার কথা তিনি জানিয়েছেন। *মিহির, বাংলা গেজেট, সত্যপ্রকাশ, কুশদহ* বিভিন্ন পত্রিকাতে পির গোরাচাঁদের কাহিনি বর্ণিত হত বলে তিনি মনে করেছেন।[৫৮]

### গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু

গবেষক বাংলার বিভিন্ন লোকদেবদেবী সংক্রান্ত একটি সাধারণ ধারণা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি *বাংলার লৌকিক দেবতা* (১৩৯৪) গ্রন্থে বনবিবির পোশাক, মাহাত্ম্য, ভক্তদের বিশ্বাস সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন। এছাড়া মুন্সী বয়নদ্দীন রচিত *বোনবিবির জহুরা নামা* গ্রন্থের কাহিনি সংক্ষেপ, বনবিবি সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি কালুরায়, বড়খাঁগাজি, নারায়ণী, পিরগোরাচাঁদ, দক্ষিণরায়, সত্যনারায়ণ, সত্যপির নিয়ে আলোচনা করেছেন।

### সুকুমার সেন

গবেষক বনবিবি বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বয়নুদ্দীন ও মোহাম্মদ খাতের প্রণীত দুটি মুদ্রিত পুথির কাহিনি বিষয়ে আলোচনা করেছেন।[৫৯] তিনি ষাটজন সত্যপির রচয়িতার তালিকা দিয়েছেন।[৬০] তিনি বলেছেন-

> ক্বচিৎ হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানের পীর হয়ে গেছেন কিন্তু নাম বদলাননি। যেমন বর্ধমান ও চব্বিশ-পরগনা জেলার পীর গোরাচাঁদ[৬১]

**দেবব্রত নস্কর**

গবেষক বড়খাঁগাজি সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেও আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-টির পরিচয় খুব সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন। চব্বিশ পরগনায় বড়খান গাজির দরগা, পুজো হাজতাদি কিংবা মেলার বর্ণনা, মাহাত্ম্য ও তাঁর ভক্ত সংক্রান্ত আলোচনা করেছেন।[৬২] তিনি মোবারকগাজি ও বড়খাঁগাজিকে দুই পৃথক লৌকিক দেবতা রূপে চিহ্নিত করেছেন।[৬৩] বনবিবি জহুরানামা কিংবা আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, কৃষ্ণরাম দাসের *রায়মঙ্গল* কাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন বড়খান গাজির প্রসঙ্গে। বড়খান গাজির দোহাই দিয়ে কিছু মন্ত্র ও তুকতাক সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া *বড়খাঁ গাজির গান* নামে একটি পালা যেটি কালিদাস দত্ত মহাশয় *ভারতীয় লোকযান* (১৯৬৩) পত্রিকায় প্রকাশিত সেটির কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।[৬৪]

বনবিবি সংক্রান্ত আলোচনায় সাতবিবি, নয়বিবি, কিংবা একুশবিবির প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি বনবিবি ও শাজঙ্গলি নামের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেছেন। বনবিবির মাহাত্ম্য, পোশাক, পুজো পদ্ধতি, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাউল, বনবিবি সংক্রান্ত কেচ্ছা-কাহিনির পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষেত্রগবেষণার মাধ্যমে একাধিক পালাগান সংগ্রহ করেছেন। শ্রী সন্তোষকুমার ঘোষের কাছ থেকে সংগৃহীত *ধোনা মৌলের মহল যাত্রা*-পালাটি এই গ্রন্থে তুলে ধরেছেন।[৬৫]

তিনি পির গোরাচাঁদের কাহিনি ও ব্যক্তি পরিচয় দিয়েছেন।[৬৬] তাঁর ধারণা পির গোরাচাঁদ আরব দেশ থেকে আগত বাইশজন আউলিয়াদের মধ্যে একজন। হাড়োয়ায় অবস্থিত তাঁর মাজার, পুজো পদ্ধতি, মেলা, প্রচলিত কাহিনিও বর্ণনা করেছেন। এছাড়া পালাগান গাওয়া শিল্পীদেরও পরিচয় দিয়েছেন। চব্বিশ পরগনায় গোরাচাঁদের কোথায় কাল্পনিক দরগা আছে সে বিষয়ে পাঠককে অবগত করেছেন।

**সুজিত কুমার মণ্ডল**

অধ্যাপক *বনবিবির পালা* (২০১০) গ্রন্থে বনবিবি সংক্রান্ত বিশদ আলোচনা করেছেন। পালাগান, যাত্রা, নাটক তাঁর গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বনবিবির পালা, পালাকার, পুথি পরিচয়, ইত্যাদি প্রসঙ্গে বিস্তৃত পর্যালোচনা করেছেন। তিনি *বনবিবির একানি পালা*,[৬৭] মরহুম মুনশী মোহম্মদ

খাতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা*-র নাট্যরূপ দিয়ে রচিত *বনবিবির পালা* [৬৮], *দুখে যাত্রা* নামাঙ্কিত যাত্রাপালা সংকলন করেছেন।

**ওয়াকিল আহমদ**

*বাংলার লোক-সংস্কৃতি* (১৯৬৫) গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'লৌকিক পীরবাদ' অংশে গবেষক বিভিন্ন পিরদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। যেমন- সত্যপির, গাজিপির, মাদারপির, বদরপির, পাচপির, খোয়াজ খিজির, মানিকপির, সোনাপির, মনাইপির, ঠুনকাপির, ত্রিনাথপির, কাউয়াপির, নোরাপির, ঘোড়াপির, জঙ্গলীপির, বনবিবি, সাতবিবি, ওলাবিবি, লক্ষ্মীবিবি, হাওয়াবিবি। তিনি বনবিবি সংক্রান্ত আলোচনাও করেছেন।

**আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া**

তাঁর সম্পাদিত *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান* (১৯৯২) গ্রন্থে বিভিন্ন পির দরবেশদের বাংলায় ইসলাম ধর্মের ভূমিকা ও পির-দরবেশদের দরগাহ্‌র তালিকা দিয়েছেন। পির-সাহিত্যের উদ্ভবের কারণ বর্ণনা করেছেন।[৬৯] এছাড়া সত্যপির, একদিল শাহ্‌, মানিকপির, গোরাচাঁদ, প্রমুখ পিরদের গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। গোরাচাঁদের কাহিনি এবং গোরাচাঁদ সম্পর্কিত বিভিন্ন সমালোচকের উক্তি তুলে ধরেছেন।[৭০]

তিনি প্রায় শতাধিক সত্যপির কবির কথা বলেছেন এবং কতজন কবির উদ্ভব হয়েছে তা বিভিন্ন গবেষকের উক্তি তুলে ধরেছেন এবং সত্যপিরের জনপ্রিয়তার কারণ, উদ্ভব স্থান বর্ণনা করেছেন।[৭১]

**তুহিনময় ছাটুই**

*লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতি দর্পণে পীরগাজী বিবি* (১৯৯৮) গ্রন্থে পির গোরাচাঁদ, সত্যপির, মানিকপির এবং বিবিদের মধ্যে বনবিবি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

**মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌**

গবেষক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন গোরাচাঁদ মুসলমান এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তি।[৭২] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিরচিত *সত্যপীরের কথা* (১৩৩৬) সম্পাদনা করেন শ্রী

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। সত্যনারায়ণ কথায় সত্যনারায়ণকে নিয়ে কাহিনি নির্মিত হয়েছে। কাহিনির বর্ণনায় দেবতার মহত্বের পরিচয় নেই তবুও এই গ্রন্থ লুপ্ত না হবার কারণ হিসেবে শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত জানিয়েছেন-

> ...ইহা পূজা-পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়েছে; যেখানে সত্যনারায়ণের কথা হয় সেখানেই এই গ্রন্থের কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়, ঘরে ঘরে পাঁজিতে এই কাব্য রক্ষিত আছে, বৎসরের পর বৎসর নূতন পঞ্জিকায় মুদ্রিত হয়।[৭৩]

**দীপন পত্রিকা** ('সত্যপীর সংখ্যা' ২০১২)

এই পত্রিকায় সত্যপিরকে নিয়ে বহু কাহিনিকেন্দ্রিক পাঁচালি, পুথি সংকলিত হয়েছে এবং একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে। এখানে সত্যপিরের বেশকিছু পালা মুহম্মদ আয়ুব হোসেন[৭৪] সংগ্রহ করেছেন। সেগুলি হল- *শঙ্কর ময়রার পালা, দেলওয়ার বাদশার পালা, সনকার পাঁচালী এবং কমলার বনবাস*।[৭৫] মুহম্মদ আয়ুব হোসেন বলেছেন-

> সত্যপীর-সত্যনারায়ণ পাঁচালিকে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে ধরা হলে দেখা যাবে 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' সবচেয়ে প্রাচীন। কারণ কবি বিদ্যাপতি একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালি রচনা করে গিয়েছেন।[৭৬]

তিনি সত্যপির-সত্যনারায়ণ পাঁচালি রচয়িতাদের একটি বিস্তৃত তালিকা দিয়েছেন।[৭৭] বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে পঁচিশটি পুথি সম্পাদনার কথা তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এছাড়া মুশকিল আসান সংক্রান্ত একটি ছড়া 'সত্যপীর প্রসঙ্গে' প্রবন্ধে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

কবি ভারতচন্দ্র রায়ের লেখা দুটি সত্যপিরের পাঁচালি পাওয়া যায়। সেগুলি হল- *সত্যনারায়ণের ব্রতকথা* এবং *সত্যপীরের কথা*। *সত্যনারায়ণের ব্রতকথা* ত্রিপদী ছন্দে এবং *সত্যপীরের কথা* চৌপদী ছন্দে রচিত। প্রায় শতাধিক সত্যপির পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যায়।[৭৮]

পির-গাজি-বিবি সংক্রান্ত বহু গবেষণা অদ্যাবধি হয়েছে। স্থান সংকুলানের জন্য সেই সকল গ্রন্থ আলোচনা সম্ভব হয়নি। আমার গবেষণার বিষয় হল পির-গাজি-বিবির মুদ্রিত কাহিনিগুলির শিল্পরূপ ও তুলনামূলক পর্যালোচনা করা।

## ১.চ. গ্রন্থের ভাষা ও ছন্দ:

ওসমানিয়া ও গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত লোকদেবতাকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে আরবি, ফারসি, হিন্দি, তুর্কি, বাংলা সহ বিভিন্ন ভাষার শব্দের মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে। শব্দের মিশ্রণের ইতিহাস নিয়ে নির্দিষ্ট একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। (পঞ্চম অধ্যায়) এছাড়া ভাষায় সাধু চলিতের একত্র সমাবেশ রয়েছে।

এই জাতীয় সাহিত্যে ভাষার উপরিতলের কাঠামোটি লোকমুখের কাছাকাছি, তাই এর ভাষা উদ্দিষ্ট পাঠক বা শ্রোতার জীবনধারাতেই বয়ে চলে। সে কারণে এর ভাষায়, শব্দচয়নে যেমন ঔপভাষিক প্রভাব থাকে তেমনি তারমধ্যে আরও স্বল্পপরিসরের আঞ্চলিকতা থাকে। এটিই তারমধ্যে একধরণের অনন্যতা আনে। কাহিনির ছত্রে ছত্রে সেটি স্পষ্ট। আরও একটি বিষয় এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তা হল প্রত্যেক ভাষাভাষীই তার নিজস্ব একটি ভাষিক জগতে বাস করে। সেখানে তার ঐতিহ্য, জাতিবর্ণ, লিঙ্গগত-সামাজিক অনুভূতি, ঐক্য-অনৈক্য, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও একটি বিশেষ জীবনদর্শনের রসে জারিত হয়ে থাকে। সেগুলিই তার দৈনন্দিন জীবনের ভাষিক ছন্দে গাথায় বাইরে এসে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির আবেদন জানিয়ে যায়। এই মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সেই সাক্ষ্য বহন করছে। এই অর্থে আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ), *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩), পির গোরাচাঁদ, ঊনবিংশ শতকের আঞ্চলিক ভাষার প্রভাবকে ধরে রেখেছে।

বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক শব্দ বা পদ আপাত দৃষ্টিতে বানান ভুল জনিত ত্রুটি বলে মনে হবে। আসলে ঐ সময়ে এইরূপ উচ্চারণের পৃথকতা ছিল বলে অনুমিত হয়। সাধারণ মানুষের বা লোকসমাজের মুখের ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলি বিবেচনার যোগ্য। যেমন- জেহেল খানায়, কেলশে, হশ হারা, হসরেতে, ছেপাই প্রভৃতি। এমনি অজস্র শব্দ পাওয়া যাবে (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট- ১) কবির দৈনন্দিন জীবনের শব্দভাণ্ডার এর মধ্যে এসে ঠাঁই করে নিয়েছে। বিশেষ আঞ্চলিকতার আর একটি সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর শব্দবন্ধের ব্যবহারে। *দীপন* (২০১২) পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ করা গিয়েছে।

# তথ্যসূত্র ও টীকা

১। মেছুয়াবাজার স্ট্রিটে (৩০, মদন মোহন বর্মণ স্ট্রিট, কলকাতা- ৭) পাশাপাশি অবস্থিত ওসমানিয়া ও গওসিয়া লাইব্রেরিতে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকে কেবলমাত্র পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক পুথি প্রকাশ পেয়েছে এমনটা নয়, সেইসময় পুথি, কেচ্ছা, জহুরানামা নাম দিয়ে বহু গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন- মরহুম শেখ কামরুদ্দিন সাহেব প্রণীত *নেক বিবির কেচ্ছা*। দুটিরই লাইব্রেরি নাম অথচ বইয়ের দোকান। ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে মুসলমান কবিদের লেখা উপন্যাস, গল্প, কোরানের অনুবাদ, আভিধান প্রকাশ পেয়েছে।

২। জি. কে প্রকাশনীটি অবস্থিত ৩০ নং মদন মোহন বর্মন স্ট্রিট, মেছুয়া বাজার, কলকাতা- ৭

৩। দত্ত, শ্রী কালিদাস, ‘বড়খাঁ গাজির গান’, *ভারতীয় লোকযান,* শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.), ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, কলকাতা, পৃ. ১৯

৪। *দীপন* পত্রিকার সম্পাদক এন জুলফিকার একজন কবি, প্রাবন্ধিক, ছড়াকার। তিনি ১৯৯৭ থেকে গবেষণাধর্মী *দীপন* পত্রিকাটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করে চলেছেন। পৃ. ৪৩৫

৫। নাগ, রমাপ্রসাদ, ‘সত্যপীর পাঞ্চালী: দ্য মুকাদ্দিমা’, *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ১১

৬। দত্ত, শ্রী কালিদাস, ‘বড়খাঁ গাজির গান’, *ভারতীয় লোকযান,* শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.), ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, কলকাতা, পৃ. ১৮-২৯

৭। সেন, দীনেশচন্দ্র, ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৮৬৫

৮। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৩

৯। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ৪৩

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১১। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১১৪

১২। আরবি ফারসিতে লেখা গ্রন্থগুলি শেষ থেকে শুরু হয়।

১৩। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ.১৪৮

১৪। সুজিত কুমার মণ্ডল (সম্পা.) *বনবিবির পালা* গ্রন্থে ধুয়ো সম্বন্ধে বলেছেন-

> পালা গানে মূল-গায়েনের গাওয়া যে অংশটি দোহারের কণ্ঠে একাধিকবার পুনর্গীত হয় তাকে বলা হয় ধুয়া বা ধুয়ো। মূল গায়েন ধুয়া ধরিয়ে দেন আর দোহারের কণ্ঠে ধুয়া চলাকালীন গায়েন গানের অন্য অংশ গেয়ে কাহিনির বিস্তার ঘটান। গায়েন তাঁর সুবিধা মতো ধুয়া থামিয়ে দেন। পৃ. ২৩৫

১৫। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন,* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ৩৬১

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫, কাহিনির বেশকিছু অংশ পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯

১৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা (২০১৭) সীতাকুণ্ডুর আটঘরা অঞ্চলে ঘোষেদের বাড়িতে বনবিবি পুজো হয়।

১৯। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ১

২০। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪৭

২১। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* কলকাতা, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১

২২। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৯

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

২৫। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

২৬। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৩

২৭। হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান,* ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ২৬০

২৮। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ৩৪

২৯। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৫১

৩০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৩১। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* কলকাতা, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৩৯। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩ ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৮৯

৪০। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ৮৩

৪১। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১

৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১

৪৩। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৯

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৪৭। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ১

৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৪৯। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২০৫

৫০। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন,* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ১১৭

৫১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৫২। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২৭৫

৫৩। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২২৪

৫৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭০

৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৪

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১১

৫৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

৫৯। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

৬০। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ৩৮

৬১। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

৬২। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫১১

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১৩

৬৪। দত্ত, শ্রী কালিদাস, 'বড়খাঁ গাজির গান', *ভারতীয় লোকযান,* শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.), ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, কলকাতা, পৃ. ১৮

৬৫। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৫৯

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৮৫

৬৭। সুজিত কুমার মণ্ডল (সম্পা.) *বনবিবির পালা* গ্রন্থে একটি বনবিবির একানি পালা রয়েছে। পৃ. ৮৯

৬৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

৬৯। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* প্রথম পরিচ্ছেদের 'বাঙলায় ইসলাম প্রচার' অংশ, পৃ. ১৩ এবং দ্বিতীয় অধ্যায়- সত্যপির, মানিকপির, গোরাচাঁদ, প্রমুখ পিরদের গবেষণাধর্মী আলোচনা করেছেন। পৃ. ৩২

৭০। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ৪৩

৭১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

৭২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

৭৩। ভট্টাচার্য্য, রামেশ্বর, *সত্যনারায়ণ কথা,* শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সম্পা.), ১৩৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

৭৪। মুহম্মদ আয়ুব হোসেন তিনি একজন লোকসংস্কৃতির প্রখ্যাত গবেষক ও প্রত্ন সংগ্রাহক। দ্রষ্টব্য: *দীপন* পত্রিকার 'লেখক পরিচিতি অংশ', পৃ. ৪৩৪

৭৫। মুহম্মদ আয়ুব হোসেন, 'সত্যপীর প্রসঙ্গে' *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ১২১

৭৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৯

৭৭। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন,* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ১৩৯

৭৮। অদ্রীশ বিশ্বাস, 'ভারতচন্দ্র এবং দ্বিজ দীনরামের সত্যপীর পাঁচালি ভয়, বিশ্বাস আর মৈত্রীর কাব্য', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ১৬৩

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি, চরিত্র ও শিল্পগুণ বিশ্লেষণ

পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে তৎকালীন সমাজচিত্র, নারী-পুরুষের আকাঙ্ক্ষা, নৈরাশ্য, মানুষের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের কাহিনি উঠে এসেছে। এছাড়া বিভিন্ন কবিদের ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। এক বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের ভক্তির কথা এখানে লিপিবদ্ধ আছে। তাদের ধারণা, তাদের জীবনের নানা সমস্যা থেকে উদ্ধার করেন দেবদেবীই। কাহিনিগুলির মধ্যে সমাজভাবনা, ইতিহাসচেতনা, জীবনবোধ একত্রে মিলেমিশে গিয়েছে। কাল্পনিক বিষয়বস্তু নিয়ে এইসব সাহিত্য রচিত হলেও প্রাধান্য পেয়েছে বাস্তবতা। এভাবে কাহিনির মধ্যে শিল্পগুণ ফুটে উঠেছে। গাজি, কালু, বনবিবি, দুখে, ধোনা, দক্ষিণরায়, গোরাচাঁদ প্রভৃতি চরিত্রের মাধ্যমে সমাজবাস্তবতা ফুটে উঠতে দেখা গিয়েছে। কয়েকটি চরিত্র অসীম ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সমাজের কঠোর নিয়মে বাঁধা পড়েছে। কবিগণ কঠোর বাস্তবচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে পাঠকহৃদয়কে আন্দোলিত করেছে। সেখানে তাঁদের পর্যবেক্ষণ শক্তি, অভিজ্ঞতা ধরা পড়েছে। কাহিনিগুলিকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে গান। অপ্রধান চরিত্রগুলিও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। কয়েকটি গ্রন্থের নির্দিষ্ট সন-তারিখ পাওয়া যায়নি। তবে এগুলিকে মধ্যযুগেরই গ্রন্থ বলা যায়। হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের দলিল হিসেবে উঠে এসেছে পাঠকের সামনে।

### ২.ক. *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ:

কবি আব্দুর রহিম সাহেব কাব্যরচনার মধ্য দিয়ে একটি নিটোল গল্প পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রাজাবাদশার কাহিনি দিয়ে কাব্যটি শুরু হয়েছে। কবি পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য কাহিনির মধ্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, মঙ্গলকাব্যের টুকরো গল্প তাঁর মতো করে সাজিয়েছেন। কোথাও মনে হয় না কাহিনিগুলি হুবহু অনুকরণ করেছেন, কিন্তু পাঠকদের মনে হতে পারে গল্পগুলি তাদের পরিচিত। গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনি বর্ণিত হওয়া ছাড়াও কিছু উপকাহিনি রয়েছে। গাজি কাহিনি রচনার নেপথ্যে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া যে কারণের কথা বলেছেন তা হল-

ধর্ম হিসাবে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং সেই সঙ্গে এদেশে মুসলমানের বিশেষ আধিপত্য প্রমাণের বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল গাযীকাহিনী এবং এই গাযী কাহিনী ছিল বাস্তবের সঙ্গে পুরোপুরি সম্পর্কহীন ও সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত।[১]

মোহাম্মদ যাকারিয়ার মন্তব্য কতখানি যুক্তিযুক্ত গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেই বোঝা যাবে। এছাড়া গোরাচাঁদ, বনবিবি, সত্যনারায়ণ এর মুদ্রিত কাহিনিতে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব এবং আধিপত্য লক্ষ করা গিয়েছে।

বৈরামনগরের রাজা শাহা সেকেন্দরের বড়োছেলে জুলহাস বারো বৎসর বয়সে নিখোঁজ হওয়ার পর অজুপা স্নান করতে গিয়ে কাঠের বাক্সে সদ্যজাত কালুকে পেয়েছেন। পরে গাজি জন্মালে দুই ভাই একসঙ্গে বেড়ে উঠেছেন।

দিবা নিশি জপ করে নাম নিরাঞ্জন*
গাজী কালু দুই দেহ কিন্তু এক পরাণ।।[২]

মাত্র দশ বছর বয়সে গাজির উপর সমগ্র রাজ্যের ভার দিয়ে তাঁর পিতা নিশ্চিন্তে দিন কাটাতে চেয়েছেন, কিন্তু গাজির কাছে রাজত্ব, ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, সিংহাসন অপ্রয়োজনীয় মনে হয়েছে। দশ বছরের গাজি পিতার চরণে নিবেদন করে বলেছেন-

...মরিলে কিছুই সঙ্গে নাহিক যাইবে*
আধার কবরে একা রহিব পড়িয়া।। কিড়ায় খাইবে মাংস টানিয়া টানিয়া*
দারা পুত্র কোথা রবে সেইত সময়।। কিনের লালচেমরি কেহ কার নয়*
সকলি অসার যাই দেখিনু ভাবিয়া।। কেবা ফান্দে পড়ে গিয়া জানিয়া শুনিয়া*
যেই জন সৃজিয়াছে এ তিন ভুবন।। ফকির হইয়া যাব তাঁহারি কারণ[৩]

মারা গেলে কিছুই সঙ্গে যায় না। জগতে আপন বলে কেউ নেই। এই জগৎ আল্লার সৃষ্টি তাই তাঁর নাম করে গাজি ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়তে চান। এখানে আল্লার শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। তাঁর এই কথাগুলি গীতার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। অর্জুন যুদ্ধক্ষেত্রে স্বজনদের দেখে যুদ্ধ করতে অসম্মত হলে কৃষ্ণ তাকে বুঝিয়ে বলেছেন-

এই দেহধারী আত্মা নিত্যবস্তু ভোগরহিত ও পরিণামশূন্য, এই আত্মার দেহগুলির বিনাশ হইবে। অতএব হে অর্জুন! যুদ্ধ করো[৪]

যে সময়ে একটি বালকের সমবয়সিদের সঙ্গে খেলে বেড়ানোর কথা, সে সময়ে গাজি ফকির হয়ে গৃহ ছাড়ার কথা বলেছেন। বিষয়টি বিস্ময় জাগায়। শ্রী চৈতন্যদেব সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছেন চব্বিশ বছর বয়সে। জীবন সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞ এবং জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। এক্ষেত্রে মনে হতে পারে কবির বয়স সংক্রান্ত বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল না। পুত্রের মুখে রাজত্ব না করার কথা শুনে সেকেন্দর কুপুত্র বলে তাঁকে কাটতে গিয়েছেন। হিরণ্যকশিপু যেমন পুত্র প্রহ্লাদের কৃষ্ণভক্তি দেখে ক্রোধে অন্ধ হয়ে গিয়েছেন।[৫] সেকেন্দর পুত্রের উপর অমানবিক অত্যাচার করলে আল্লার নাম করে গাজি রক্ষা পেয়েছেন। শেষে সেকেন্দর সন্তানের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। পিতার অনুরোধ, মায়ের চোখের জলকেও উপেক্ষা করে তিনি রাজ্যত্যাগ করেছেন। যেমনভাবে নিমাই সন্ন্যাস নেওয়ার সময় তাঁর মায়ের চোখের জলকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি নিমাইকে বলেছেন-

তোমার অগ্রজ আমা' ছাড়িয়া চলিলা।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা।।
তোমা' দেখি সকল সন্তাপ পাসরিলুঁ।
তুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্ব্বথা ছাড়িমু।।[৬]

রাতের অন্ধকারে গাজি মায়ের চরণে চুম্বন করে হাতে সুবর্ণের আশা, পায়েতে খড়ম, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে ঘর ছেড়েছেন।

বাড়াইল দুই পদ প্রভু নাম লিয়া।[৭]

কালু ও গাজির সঙ্গে ফকির হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে বলেছেন-

একেলা চলেছ তুমি করে বিবর্জ্জিত*
দাসকে লইয়া যাও সাথে আপনার।।
খড়মের বোঝা আমি রহিব তোমার[৮]

তিনি রাজপ্রাসাদের সমস্ত সুখ, বৈভব ত্যাগ করে গাজির সঙ্গে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। সুন্দরবনেতে তাঁরা সাত বছর থেকেছেন। একই স্থানে বেশিদিন থাকতে অনিচ্ছুক কালু গাজিকে বলেছেন-

ফকিরের বিধি নহে থাকা এক ঠাই।। দেশ ছাড়িয়া চল অন্য দেশে যাই।[৯]

গাজির কাহিনির মাধ্যমে ফকিরের জীবনযাত্রা, উদ্দেশ্য, লক্ষ, তাঁদেরকে নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণার কথা পাঠক জানতে পারে।

নানাদেশ ভ্রমণ করে তাঁরা ছাপাই নগরে শ্রীদাম রাজার রাজ্যে গিয়েছেন। মুসলমান হওয়ায় সেখানে অনেক অপমানিত হতে হয়েছে রাজা ও প্রজাদের কাছে। পির ফকির কিংবা বিধর্মীকে রাজ্যের রাজারা কোনো জায়গা দিত না তা শ্রীদাম রাজার ব্যবহারে বোঝা গিয়েছে। কালু প্রতিশোধ নিলে রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে তাঁদের রাজ্যে সমাদরে ফিরিয়ে এনে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে সন্তুষ্ট করেছেন। বেশ কিছুদিন আরামে থাকার পর দুই ভাইয়ের ফকিরের ধর্ম মনে পড়ায় ছাপাইনগর থেকে সোনাপুর[১০] চলে গিয়েছেন।

এরপর গাজির জীবনে ঘটেছে অলৌকিক ঘটনা, যা কাহিনির শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করেছে। সোনাপুরে একদল পরি ঘুমন্ত গাজির পালঙ্ককে উড়িয়ে নিয়ে চাম্পাবতীর পালঙ্কের পাশে রেখে দিয়েছে। ঘুম ভাঙলে পরস্পরের রূপ দেখে মূর্ছিত হয়ে গিয়েছেন। গাজি ফকির হয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেও একজন সুন্দরী রূপবতী নারীকে নিজের বশবর্তী করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে যথার্থ রসিকপুরুষ বলা যায়। অপরদিকে চাম্পাবতীর প্রথমে আপত্তি থাকলেও তাঁকে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে অসুবিধে হয়নি। কবি এখানে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির দিকটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। তিনি সর্বদা স্বামীর পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন। একজন রাজকুমারী হয়েও ফকিন্নি হতে তাঁর দ্বিধা থাকেনি। চাম্পাবতী বলেছেন-

তুমিত ফকির আমি ফকিন্নি হইয়া।। ভিক্ষা মাংগি খাব গিয়া গলে মালা দিয়া*
না ছাড়িব তব অংগ জীবন থাকিতে।। যত কষ্ট হউক আমি যাব সাথে সাথে[১১]

শেষরাতে চাম্পাবতী ও গাজির বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছে। তাঁরা পরস্পর অদর্শনে বিরহে কাতর হয়ে পড়েছেন। দীর্ঘ তিনবছর অন্বেষণের পর গাজি চাম্পাবতীর পরিচয় খুঁজে বের করেছেন। গাজির করুণ অবস্থা দেখে কালু বাধ্য হয়ে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে মটুক রাজার কাছে গিয়েছেন। গাজি রাজপুত্র সুতরাং চাম্পাবতীর পাত্র হিসেবে তিনি অযোগ্য নন, কিন্তু বিধর্মী হওয়ায় মটুক রাজা বিবাহের প্রস্তাব মেনে না নিয়ে কালুকে কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। এইভাবে অলৌকিক ঘটনার মধ্যেও পাঠকের মনে উঁকি দিয়েছে বাস্তবতা।

গাজি ভাই কালুকে উদ্ধার এবং চাম্পাবতীকে পাবার জন্য মটুক রাজা ও দক্ষিণরায়ের সঙ্গে আঠারো দিন যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধে হেরে গিয়ে মটুক রাজা ও রাজ্যের প্রজারা গাজির কাছে কলেমা পড়েছে। ইসলাম বিবাহ রীতি মেনে গাজি ও চাম্পাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়েছে। এই বিবাহের মধ্য দিয়ে কবি সমাজের একটি দিক তুলে ধরেছেন। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ না-করে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সম্প্রীতির ভাব বজায়-রাখা সম্ভব। বিবাহের পর তাঁদের প্রেমলীলা দেখে কালু অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন। কালু মনে ভেবেছেন ভাই গাজির সংসার এবং নারীতে আসক্তি রয়েছে। সুতরাং আল্লার নামেতে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়া উচিত হয়নি।

বন্দি হইল ভাই ম্যের ভবের মায়ায়*
এ জাল কাটিতে তার সাধ্য নাহি আর।।
... ... ...
কেমনে দেখাবে মুখ খোদার কাছেতে।।[১২]

নাথ সাহিত্যে মীননাথ গোরক্ষনাথের সহায়তায় সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন।[১৩] গাজিও কালুর উপদেশ শুনে সংসারত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছেন।

গাজি কালু বেরিয়ে পড়লে চাম্পাবতী তাঁদের অনুবর্তিনী হয়েছেন, দুজনেই তাঁকে নিয়ে বিব্রত হয়েছেন। ফকিরের সঙ্গে নারী দেখলে লোকে হাসবে। গাজি তাঁকে নিজের সাধনার পথে জঞ্জাল মনে করেছেন। গাজিকে খানিক ভণ্ড মনে হতে পারে কারণ লোকের সামনে তিনি ফকির অথচ লোকচক্ষুর অন্তরালে একজন সংসারী মানুষ। কবি ফকিরের উচিত কাজের কথা উল্লেখ করেছেন তেমনি তিনি মানবধর্মকে অস্বীকার করতে পারেননি। এরপর গাজি তাঁর বড়োভাই জুলহাস ও তার স্ত্রীকে খুঁজে বার করেছেন। কাহিনির শেষে দেখা গিয়েছে গাজি সকলকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। কবি কাহিনির সমাপ্তিতে সুন্দর মিলন দেখিয়েছেন।

কালিদাস দত্তের লেখা *বড়খাঁ গাজির গান* প্রবন্ধে মটুক রায় নিজকন্যাকে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেবেন না ঠিক করেছেন। কালু ভাই গাজির বিয়ের কথা বলতে পৈতে কিনে ব্রাহ্মণ সেজে মটুক রাজার কাছে গিয়েছেন। গাজির পরিচয় হিসেবে বলেছেন-

মহাগুণবান আর ভাটি দেশের রাজা[১৪]

জামাইয়ের নাম বড়খাঁগাজি এবং তাঁর পিতার নাম সেকেন্দর সা। কালুর কথায় মটুক রাজা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি সমস্ত ব্রাহ্মণদের ডেকে পাঠিয়েছেন গাজি ব্রাহ্মণ কিনা জানবার জন্য। পাঁজি, পুথি নিয়ে সমস্ত ব্রাহ্মণ হাজির হয়ে এলে তিনি ছলনার আশ্রয় নিয়েছেন।

গাজি তখন একিন করে ভাবিয়া খোদায়। সোনার ভ্রমর হয়ে খনিয়াতে যায়।।
সেইকালে ঘুরি ঘুরি গাজি খনকার। সোনার ভ্রমর হয়ে পুঁথিতে দিল বার।।
পুঁথির হরপ তুলি লিখি গাজি ব্রাহ্মণ। ...পুথি পড়ে ব্রাহ্মণেরা ভড়কে উঠেছে।।[১৫]

কালুর চক্রান্তে মটুক রাজা বিবাহের জন্য রাজি হয়ে গিয়েছেন। কালুকে ডেকে বিবাহের প্রস্তুতি নিতে বলেছেন। পান খাইয়ে বিবাহের শুভসূচনা হয়েছে। *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে গাজি যুদ্ধ করে চাম্পাবতীকে লাভ করেছেন, কিন্তু *বড়খাঁ গাজির গান*-এ গাজি ভণ্ডামি করে সুভদ্রাকে পেয়েছেন। ফকিরদের ছলনা করে কার্যসিদ্ধির কথা এই কাহিনির মাধ্যমে উঠে এসেছে।

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) গাজির ইসলাম ধর্মপ্রচারের পাশাপাশি নারী-পুরুষের প্রেম প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। কাহিনির মধ্যে রোমান্টিক উপাদানে পরিপূর্ণ। এখানে মটুক রাজা দক্ষিণানগরের রাজা। তাঁর কন্যার নাম রয়েছে চাম্পাবতী, কিন্তু শ্রী কালিদাস দত্তের লেখা *বড়খাঁ গাজির গান* প্রবন্ধে মটুক রাজার কন্যার নাম আছে সুভদ্রা।

সুভদ্রা বামনের মেয়ে শিব পূজে সেই ঠাঁই। বার বছর পর পুরুষের মুখ দেখে নাই।।[১৬]

দক্ষিণানগরের বদলে সেই জায়গার নাম খনিয়া রয়েছে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার অধীন ছোটো পল্লিরূপে খনিয়া নামক স্থানটি অবস্থিত। মুসলমান শাসনকালে বড়খাঁগাজি নামক একজন মুসলমান পিরের অত্যাচারে এখানকার ব্রাহ্মণরা খনিয়া স্থান ত্যাগ করে। পরে স্থানটি ধ্বংস হয়ে যায়। এই স্থানে তিনটি পুষ্করিণীর মধ্যে একটি পুষ্করিণীর নাম 'মটুকের দীঘি'। খনিয়ার প্রায় দেড় মাইল উত্তরে ময়দা গ্রামের দক্ষিণে চণ্ডীপুর নামে একটি গ্রাম এবং গোপালগঙ্গা স্থান এখনও রয়েছে। ওখানে বড়খাঁগাজি ও চাঁপাবিবির কবরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। কবরটি ইষ্টক নির্মিত।[১৭]

খনিয়ার রাজার নাম রয়েছে মটুক রায় বা মুকুট রায়। এখানে অলৌকিক কাহিনির পাশাপাশি রয়েছে ঐতিহাসিক সত্যতা। মটুক রাজা সম্পর্কে অতি ক্ষুদ্র অংশই এখানে বর্ণিত

হয়েছে। গাজির সুভদ্রাকে দেখে ভালোলাগা, তাকে বিয়ে করতে চাওয়া এবং মটুক রাজার ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুভদ্রার বারুণির স্নানে গিয়ে গাজির সঙ্গে দেখা হয়েছে। প্রবন্ধে মটুক রাজা হিন্দু একথা বলা হয়নি ঠিকই, সেখানে বলা হয়েছে মটুক রাজা ব্রাহ্মণ। খনিয়াতে একসময় চট্টোপাধ্যায় পদবীযুক্ত বহু ব্রাহ্মণ বাস করত। এই জনপদকে ব্রাহ্মণনগর বলা হত। গাজির অত্যাচারে এই সমস্ত ব্রাহ্মণ অতিষ্ট ছিল। সেখানে গাজি ও সুভদ্রার বিয়ের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

বামন মোছনমানে বিভা কোথায় হয়েছে।।[১৮]

আব্দুর রহিম সাহেব গাজির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। গাজির জন্মেরও পূর্বের ঘটনা দিয়ে কাহিনি আরম্ভ হয়েছে। এখানে মটুক রাজাকে হিন্দু বলা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখা গিয়েছে হিন্দুদের মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহে তীব্র আপত্তি। আবার দেখা গিয়েছে যে মুসলমানের নিজেদের পরিচয় লুকিয়ে হিন্দু ঘরের মেয়েকে বিবাহের ইচ্ছা।

গাজি কাহিনির মধ্যে যে কয়টি বিষয় উঠে এসেছে তা হল- ১) ইসলাম ধর্মের বিস্তার স্থাপনের চেষ্টা। বিভিন্নভাবে সেই চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন- ক) বীরত্ব দেখিয়ে খ) ভয় দেখিয়ে গ) ধনদৌলত দান করে ঘ) যুদ্ধে জয়লাভ করে হিন্দু রাজার কন্যাকে বিবাহের মধ্য দিয়ে ঙ) কেরামতি দেখিয়ে ২) মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রভাব। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণের নানা কাহিনির প্রসঙ্গ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে এসেছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সেবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ৩) পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দের প্রচলিত রীতিতে একটি প্রেমের আখ্যান রচনার চেষ্টা। তবে উদ্দেশ্য ইসলাম ধর্ম ও আল্লার মাহাত্ম্য বর্ণনা করা।

এই গ্রন্থে প্রধান তিন ধরণের চরিত্রের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, যেমন- দেব চরিত্র, দেবপ্রায় চরিত্র এবং মানব চরিত্র। আল্লা হলেন দেব চরিত্র। যিনি অলক্ষে থেকে বারবার গাজি ও কালুকে সাহায্য এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। দেবপ্রায় চরিত্র হল গাজি ও কালু। এছাড়া মানব চরিত্রগুলি হল চাম্পাবতী, মটুক রাজা, রানি লীলাবতী, সেকন্দর, অজুপা, দক্ষিণা দেও, শ্রীদাম, জুলহাস, পাঁচতলা, পাতালের রাজা প্রমুখ। এই গ্রন্থে তিনটি চরিত্র মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। সেগুলি হল- গাজি, কালু ও চাম্পাবতী। মুখ্য চরিত্রগুলি ছাড়াও বেশকিছু চরিত্র রয়েছে যেগুলি কাহিনির প্রয়োজনে এলেও তাদের ভূমিকা কম নয়।

## বরখান গাজি

গাজিকে দেবপ্রায় চরিত্র বলা যায় এই কারণে যে, তাঁর মধ্যে অলৌকিক ঘটনা রয়েছে, কিন্তু তিনি দেবতা নন। মানবীর গর্ভে জন্ম এবং মানবধর্ম তাঁর মধ্যে বর্তমান। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেছেন-

> ...গাযীপীর সম্পূর্ণ মানবিক সত্তার অধিকারী। পুরোপুরি ঐতিহাসিক সত্তাবিশিষ্ট কোনো একক মানুষের চরিত্রের অভিব্যক্তি গাযীপীরের মধ্যে নেই সত্য, বহু ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশ ও ধর্মযোদ্ধার চরিত্রের অংশবিশেষ নিয়ে কল্পনার তুলি দিয়ে যে এই 'টাইপ' চরিত্রটিকে রূপায়ণ করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই এবং তাতে কোনো একক ব্যক্তি মানুষের পরিচয় নেই, তাও সত্য। কিন্তু এত সবের পরেও গাযীপীর রক্তমাংসের গড়া একজন মানুষ এবং পীর কাহিনীর নায়কদের মতো কোনো কাল্পনিক পীর-দেবতা স্থানীয় ব্যক্তি নন।[১৯]

গাজি কর্মের দ্বারা মানুষের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছেন। আল্লার কৃপায় অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রয়েছে। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন-

> বড় খাঁ গাজী বা 'জিন্দা পীর' কারও ব্যক্তিগত নাম নয়। ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়দের ওইরূপ বলা হত।[২০]

আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া এবং গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু এই দুইজন গবেষকের মত কতটা যুক্তিপূর্ণ তা গাজি চরিত্রটি আলোচনা করলে বোঝা যাবে। আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ) গাজির অনেকটাই পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে গাজির বংশপরিচয় থাকলেও গাজির সম্পূর্ণ নাম জানা যায় না। মহাম্মদ খাতের সাহেব *বোন বিবী জহুরা নামা*-য় গাজির নাম প্রসঙ্গে জানিয়েছেন-

> বরখান নাম যে আমার* আমার বাপের নাম শাহা সেকেন্দর।।[২১]

বিভিন্ন গ্রন্থে তাঁর বিভিন্ন নাম জানা যায়, যেমন- জিন্দাপির, গাজি সাহেব, বড়খাঁগাজি প্রভৃতি। *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে জিন্দাপির নামটি পাওয়া যায় আবার কালিদাস দত্তের লেখা *বড়খাঁ গাজির গান* প্রবন্ধে বড়খাঁ নামটি পাওয়া যায়।[২২] সেকেন্দর ও অজুপার ঘরে গাজির জন্ম হয়েছে। তিনি রূপবান ছিলেন। কবি তাঁর জন্মের সূচনা মহাপুরুষদের জন্মের

মতো করে দেখিয়েছেন। অজুপা স্বপ্নে আকাশের চন্দ্র পেটে প্রবেশ করতে দেখামাত্রই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। সেকেন্দরকে স্বপ্নের কথা বললে তিনি বলেছেন-

জন্মিবেক সু-সন্তান তোমার উদরে।।[২৩]

গাজির চরিত্রের মধ্যে অনেকগুলি সংঘাত লক্ষ করা গিয়েছে। তিনি রাজত্ব করবেন না বলে পিতার আদেশ অমান্য করে ফকির হয়েছেন। ফকির হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার অর্থ সব রকম ভোগবিলাসকে বর্জন করা, কিন্তু বারেবারে ফকিরের অনুচিত কাজ করে ফেলেছেন। চাম্পাবতীকে দেখার পর তাঁর রূপে মূর্ছা গিয়েছেন। তাঁকে পাবার জন্য উন্মাদের মতো আচরণ করেছেন। মটুক রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে চাম্পাবতীকে লাভ করেছেন। কালু তাঁর ফকির হয়ে আসার উদ্দেশ্য বিফল হয়েছে জানালে তিনি চাম্পাবতীকে ছেড়ে প্রাসাদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। স্ত্রীর কাতরতায় গাজি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য হলে দিনেরবেলা লোকজনের সামনে ফকিরের বেশ ধরেছেন। চাম্পাবতীকে শ্যাওড়া গাছ, হরিদারফুল বানিয়ে দিলেও রাতেরবেলা স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থেকেছেন। এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাঁর আকাঙ্ক্ষা প্রকট হয়েছে।

চামপার অংগেতে গাজী ফুক যবে দিল।। হরিদাফুল হইয়া তখনি গেল*[২৪]

এক্ষেত্রে তাঁকে ভণ্ড ফকির বলা যায়। লোকে কী বলবে বা লোকে কী ভাববে এ নিয়ে গাজির সর্বদা চিন্তা ছিল। তাঁকে একটি দ্বন্দ্বময় চরিত্র হিসেবে দেখা গিয়েছে। এছাড়া পির-ফকিরদের সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যায়। তারা জনগণের সামনে কীভাবে নিজেদেরকে উপস্থাপন করবে সে বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত থাকত।

কোনো কিছু পাওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে তীব্র ব্যাকুলতা ও জেদ লক্ষ করা গিয়েছে। পিতা সেকেন্দর রাজ্যভার নেওয়ার জন্য তাঁকে অমানবিক শারীরিক নির্যাতন করলেও তাঁর সিদ্ধান্তকে টলাতে পারেননি। চাম্পাবতীকে পাওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে তাঁকে লাভ করেছেন। গাজি রাজপুত্র হওয়ায় কোনো কিছুর অভাব ছিল না। যা চেয়েছেন পেয়ে এসেছেন তাই সেই পাওয়ার কামনাটি তাঁর মধ্যে বারংবার দেখা গিয়েছে। আবার সবটুকু পেয়েও ভোগ করেননি। গাজি সংসারের মায়া ত্যাগ করেও সর্বদা ভোগ করতে চেয়েছেন। সেক্ষেত্রে তিনি মিথ্যার আশ্রয় পর্যন্ত নিয়েছেন। লোক দেখানো ফকির হয়ে কালুর সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

শেষপর্যন্ত স্ত্রী, কালু, দাদা জুলহাস ও বৌদিকে নিয়ে ঘরে ফিরেছেন। আসলে গাজি ভ্রমণ পিপাসু এবং অলস ব্যক্তি। তাই রাজত্ব না-সামলে ফকির হয়ে সুন্দরবন, শ্রীদাম রাজার রাজ্য, সোনারপুর, দক্ষিণা নগর, জঙ্গ বাহাদুরের রাজ্য এবং পথেঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

গাজি মটুক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করলে তাঁর বীরত্ব সেভাবে লক্ষ করা যায়নি। সকল ক্ষেত্রে আল্লার সহায়তায় তাঁর বাঘ সৈন্য, আশাবাড়ি, খড়ম প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করেছে। গাজির মধ্যে ভীরুতাও লক্ষ করা গিয়েছে। পরিদের দ্বারা চাম্পাবতীর ঘরে এসে পড়লে চাম্পাবতী তাঁকে ভয় দেখালে গাজি ভয় পেয়ে রোদন করেছেন।

নয়নের জলে যার ভাসিল বদন।[২৫]

এই আচরণে তাঁর পৌরুষত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে। আবার কেউ বিপদে পড়লে গাজি তাঁকে রক্ষা করেছেন। বনবিবির কাহিনিতে দুখেকে খেতে চাওয়ার অপরাধে শাজঙ্গলির কাছে তাড়া খেয়ে দক্ষিণরায় গাজির কাছে আশ্রয় নিয়েছে। জংলি গরম হয়ে গাজিকে বলেছেন-

ইছলাম হইয়া নাহি ডর।
পাকজাতে ইহাদের সাথে দুস্তে বৈস এক সাথে*[২৬]

গাজি এই অপমানে বিচলিত না হয়ে তাঁকে ঠান্ডা হতে বলেছেন। জঙ্গলি প্রত্যুত্তরে বলেছেন-

তুমি ফকির হইয়া।। রাক্ষসের সঙ্গে দুস্তি কিসের লাগিয়*[২৭]

গাজি নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছেন-

মেহেরবান করিয়া হজরত নবী আপে।।
সুলতানের শাহি দিয়াছিল মেরা বাপে*
জায়গীর পাইয়া আমি আসি ভাটিশ্বরে।।[২৮]

ভুতেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার জন্য বনবিবি গাজিকে ধিক্কার দিয়েছে। গাজি প্রত্যুত্তরে জানিয়েছেন- নারায়ণী বনবিবির সই সেহেতু দক্ষিণরায় বনবিবির পুত্র সমান।

রায়মণি সই বেটা হইল তোমার[২৯]

গাজির এই ব্যাখ্যা শুনে বনবিবি দক্ষিণরায়কে ছেড়ে দিয়েছেন। বনবিবি গাজিকে বেটা বলে সম্বোধন করেছেন।

এক বেটা ছিল দুখে হৈল তিন জন*
তিন ভায়ে তবে একে কর মেলামেলি।।[৩০]

গাজি যুক্তি দিয়ে কথা বলার ক্ষমতা রাখলেও নিজের জীবনকে সুন্দর করে সাজাতে পারেননি। তাঁর কার্যকলাপ কখনও অবান্তর মনে হয়েছে। তিনি আশাদণ্ডের সাহায্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রাখতেন।

দক্ষিণা দেওয়ের সহিত লড়িবারে যাহ* বিছমিল্লা বলিয়া আশা দিলেন ছাড়িয়া।।[৩১]

তাঁর নির্দেশে পায়ের খড়ম দক্ষিণরায়কে মেরে রক্তারক্তি করে দিয়েছে।

খড়মেরে সাহাগাজী কহেন তখন।।          দক্ষীণা দেওয়ের সাথে কর গীয়া রণ*
গর্জ্জীয়া খড়ম তবে চলিল উড়ীয়া।।[৩২]

গাজি ধর্মপ্রচারের জন্য ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন তাঁর কয়েকটি কার্যকলাপ দেখে মনে হয়েছে, তবে সেগুলি জোরপূর্বক নয়। জলদেবতার তপে রত তিনশো যোগীর তপ ভেঙে দিয়েছেন। তাঁদের দেব দর্শন করিয়ে মুসলমান হওয়ার শর্তের কথা বলেছেন। গাজির কথা শুনে পির পদ্মপত্রে বসে দেখা দিয়েছেন। যোগীগণ গাজিকে প্রশংসা করে তাঁর কাছে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। তবে কাহিনির মধ্যে স্পষ্ট করে বঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে গাজি কালু খোদার সংসার দেখার জন্য ফকির হয়ে বেড়িয়ে পরেছেন।

নানা দেশ নানা স্থান করিয়া ভ্রমণ।।
খোদার সংসার দেখে ভরিয়া নয়ন*[৩৩]

তবে পীর গোরাচাঁদ বিশ্বসংসার দেখার জন্য দিল্লী শহর ছাড়েননি। তিনি ইসলাম ধর্মের প্রসারের জন্য বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছেন। নিজের বাহুবল দেখিয়ে হিন্দু রাজাদের মুসলমান হতে বাধ্য করেছেন।

কয়েকটি ক্ষেত্রে গাজির মধ্যে সততা লক্ষ করা গিয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে দেখা যায় কৃষ্ণ জোর করে রাধার সঙ্গে রতি করেছে।[৩৪] নৌকা খণ্ডে ছলনা করে রাধার দেহ সম্ভোগ করেছে। *অন্নদামঙ্গল*-এ সুন্দর বিদ্যার ঘরে সকলের অগোচরে প্রবেশ করে মিলিত হয়েছে। ফলস্বরূপ বিদ্যা গর্ভবতী হয়েছে।[৩৫] অপরদিকে গাজি চাম্পাবতী পরস্পর আংটি বিনিময় করেও সামাজিক ভাবে বিয়ের অপেক্ষা করেছেন।

গাজির চরিত্রে কিছু ব্যক্তিগত ভুলভ্রান্তি ছাড়া কিছু মহৎ কার্যকলাপ দেখা গিয়েছে। কারও দুঃখ তাঁর অসহ্য মনে হয়েছে। অপরকে সর্বদা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা গিয়েছে। যদিও নিজের পরিজনদের দুঃখকষ্ট তিনি নিবৃত্ত করতে পারেননি। তাঁর কাছে না থাকা সত্ত্বেও কাঠুরিয়াদের অনেক ধনসম্পত্তি দিয়েছেন সিন্ধুকূলের এক মাসির কাছ থেকে নিয়ে। বনবিবির নির্দেশে দুখেকেও অনেক সম্পত্তি দিয়েছেন। গাজি ও কালু পথে গোদ আক্রান্ত মানুষকে দেখে তার জ্বালা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তাকে সওদাগর হওয়ার বর এবং প্রভূত ধনসম্পত্তি দিয়ে বলেছেন-

হইবে মনাই সাধু তোমার নন্দন* তাহার বংশেতে ধনী হইবে বিস্তর।।[৩৬]

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর মতে আদি ব্যাঘ্রদেবতা এবং গাজিসাহেব মিশে গিয়েছেন। তাই তিনি ব্যাঘ্রদেবতা বড়খাঁগাজি নামে পরিচিত হয়ে আছেন।[৩৭] সুন্দরবনে থাকার সময় বনের সকল বাঘ গাজির শিষ্য হয়ে তাঁকে পির বলে মেনেছে। তিনি স্নানে গেলে বাঘে দাঁড় বাইত এবং কুমিরেতে কাণ্ডার ধরত। এছাড়াও পরিরা গাজির কাছে মুরিদ হয়েছে। ভাতৃবৎসল গাজি কালুর সব কথা মেনে চলবার চেষ্টা করেছে ।

একদিন কালু সাহা গাজীর কাছে কয়।। ফকিরের এত সুখ কভু নাহি ভাল।।
ভবের মায়ায় বুঝি তোমাকে বিড়িল।। ফকিরের শয্যা বন ধূলা মাটি ছাই।।
গাজী বলে সত্য কথা কইল কালু ভাই* অভিলাষ নাহি আর এদেশে থাকিতে।।
চলিয়া যাইবে কালি প্রভাত কালেতে।।[৩৮]

গাজি যে স্থানে সুখ পেয়েছেন সেখানে মহানন্দে থেকেছেন। ফকিরের ধর্ম তিনি ভুলে যেতেন। তাঁকে সবাই ভালোবেসেও ফেলতেন। ছাপাইনগর থেকে তাঁদের বিদায়মুহূর্তে শ্রীদাম গাজির পা জড়িয়ে বলেছেন-

তোমাতে ছাড়িয়া আমি রহিব কেমনে।।
না দেখিলে এক খন মরিব পরাণে।।[৩৯]

গাজি তাঁর ভক্তের মনস্কামনা পূরণ করেছেন। শ্রীদাম রাজাকে চোখ বন্ধ করে হৃদয়ের চক্ষু দিয়ে তাঁকে দেখতে পাওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করে বলেছেন-

বরখান গাজী বা বড় খাঁ আমাদের আলোচ্য মোবারক গাজী নন। অনেকেই তাই-ই মনে করেছেন[৪০]

গাজি চরিত্রে ভীরুতা সাহসিকতা উভয় লক্ষ করা গিয়েছে। প্রেমিক হয়েও যথার্থ প্রেমিক সুলভ আচরণ করতে পারেননি। ফকির হয়ে বিশ্বসংসার ঘুরে বেড়াবেন ভেবেও সংসারে ফিরেছেন।

**কালু**

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসুর গ্রন্থ থেকে জানা যায়- কালুরায় ব্যাঘ্রদেবতা, কোথাওবা কুম্ভীর দেবতা বলে খ্যাত হয়ে আছেন। গবেষকরা একথাও বলে থাকেন যে দক্ষিণরায়, বাঁকুড়ারায়, বনবিবি, বড়খাঁগাজি, কালুরায় অভিন্ন। আবার কোথাও তাঁকে ধর্মঠাকুরের সঙ্গেও এক করে দিয়েছেন। চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুরের কাঁথি, ঘাঁটাল, হিজলী অঞ্চলে কালুরায়ের পুজো করা হয়। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে এই কালুরায় কালুগাজি বা মগরপির নামে পরিচিত। সেখানে তিনি বড়খাঁগাজির ভাই।[৪১] *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে কালুর জন্মবৃত্তান্ত, গাজির সঙ্গে কালুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক লক্ষ করা গিয়েছে। সেখানে তাঁকে একজন লৌকিক দেবতা হিসেবে দেখা যায় না।

কেবা পিতা কেবা মাতা কেহ নাহি জানে।।[৪২]

কালু নিজেকে গাজির দাস বলে পরিচয় দিয়েছেন। তিনি গাজির খড়ম বইতে চেয়েছেন। রাজসুখ ত্যাগ করে গাজির সঙ্গে ফকির হয়ে সকলের অগোচরে পথে বেরিয়েছেন। পথে, জঙ্গলে তাঁরা জীবনের অনেকটা সময় পার করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে তাঁকেও গাজির মতো নির্দয় মনে হয়েছে। পালয়িত্রী মা অজুপা তাঁকে স্নেহ মমতায় বড়ো করে তুললেও তাঁকে ফেলে তিনি চলে গিয়েছেন। যেমনভাবে কৃষ্ণ যশোদাকে ফেলে চলে গিয়েছেন।

কালু একজন রসিক চরিত্র। গাজি ও চাম্পাবতীর বিবাহের প্রস্তাব তিনি মটুক রাজার কাছে নিয়ে গেলে রাজা অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেছেন। শাস্তির জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করেছেন। তখন কালুর উক্তি হাসির উদ্রেক করে।

কাল্লু বলে মোরে কেন ধাক্কা দেহ ভাই।। আমি নাহি আমি নহি রাজার জামাই*
ঘটক হইয়া কিবা দোষ হৈল মোর।। যে চায় করিতে বিয়া তারে গিয়া ধর*[৪৩]

গাজিকে কালু নানা ভাবে সংসারের মায়া কাটানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বোঝান নারীর ধ্যানে খোদাকে হারাবেন। পুত্রের মুখ দেখলে খোদার প্রতি ভালোবাসা অন্তর্ধান হবে। তিনি কোরানের বাণীও শুনিয়েছেন এবং গাজি চাম্পাবতীকে পাওয়ার জন্য বিলাপ করলে বুঝিয়েছেন।

কালু বলে নারী নিয়া কিবা লাভ হবে।।
মায়ার জঞ্জাল আর গলেতে পড়িবে*[৪৪]

দক্ষিণানগরে পৌঁছে চাম্পাবতী ঘাটে না-এলে গাজি চাম্পাবতীর মায়া ত্যাগ করার কথা বললে কালু বলেছেন-

বাঁচিলাম জঞ্জাল হইতে।।
ভ্রমিয়া আল্লার সৃষ্টি দেখিব চক্ষেতে*[৪৫]

এক্ষেত্রে আল্লার প্রতি তাঁর ভক্তির দিকটি লক্ষিত হয়েছে।

কালু ছিলেন আত্মসচেতন ব্যক্তি। কারও কাছে মাথা নোয়াতে তিনি ভালোবাসতেন না। গাজিকেও তিনি এ বিষয়ে সচেতন করেছেন। গাজি ছিলেন সরল সাদাসিধে মানুষ। কোনো জটিলতা তিনি পছন্দ করেন না। কালু গাজিকে বলেছেন-

আমার নিকটে আজি করিবে এ পণ*
পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কার সাথে।।

তাহাকে ছালাম তুমি নারিবে করিতে*[৪৬]

গাজি কালুর কাছে এ বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করেও রাখতে না-পেরে পথে খোওয়াজ খিজীরের পায় সালাম করেছেন। নিম্নে খোওয়াজ খিজীরের সম্পর্কে ওয়াকিল আহমদের বক্তব্য তুলে ধরা হল-

> আরবীয় পৌরাণিক দরবেশ খাজা খিজির বাংলাদেশে খোয়াজ খিজির বা খোয়াজ পীর নামে অভিহিত। তিনি সর্বত্র ‘পানির মালিক’ হিসেবে পরিগণিত ও সম্মানিত হয়ে আসছেন। সাধারণের বিশ্বাস, খোয়াজ খিজির নৌকাডুবি থেকে যাত্রীদের রক্ষা করেন। তিনি অলৌকিক শক্তির অধিকারী, ভক্তের আহবানে তিনি সশরীরে আবির্ভূত হয়ে বিপদমুক্তির পথ দেখান।[৪৭]

গাজির আচরণ কালুর পছন্দ হয় না। তিনি খোয়াজের সামনেই বলেছেন-

নিজ ক্ষমতায় নারে করিবারে কাজ*

লেখা আর আজ্ঞা মতে করেন খোদার।।
খোদা বিনে কারে আমি নাহি যানি আর*[৪৮]

কালুর বক্তব্য শুনে তাঁকে নির্ভীক ও স্পষ্টবক্তা বলেই মনে হয়।

কালুর মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহা কাজ করেছে। ছাপাইনগরের রাজা শ্রীদাম গাজি ও কালু মুসলমান বলে তাড়িয়ে দিলে কালু অপমান বোধ করেছেন। তিনি মনে মনে বলেছেন-

আগুন লাগিত এই রাজার ভবনে*
রাণীকে লইয়া আর যাইতেন জিনে।।[৪৯]

রাজা শ্রীদাম গাজি ও কালুর ক্ষমতা জানতে পেরে তাঁদেরকে রথে করে এনে রত্নসিংহাসনে বসিয়ে যত্ন করে খাইয়েছেন এবং থাকবার জন্য মসজিদ গড়ে দিয়েছেন। সোনার পালঙ্কে গাজির ভালোই কাটলেও ভবঘুরে কালুর তা ভালোলাগেনি।

গাজি প্রাণের ভাই হলেও কালু তাঁর ক্ষমতা দেখে মাঝেমধ্যে ঈর্ষান্বিত হয়েছেন। কিন্তু গাজির মধ্যে বিনয়ের অভাব নেই, তাই তিনি বলেছেন –

তোমার সমানে নয়, আমি হেন পরম ফকির।[৫০]

আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে গাজির প্রতি কালুর সাময়িক মান অভিমান দেখতে পাওয়া গেলেও তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী। গাজিকে সর্বদা সুপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। বনবিবির কাহিনিতে কালুর মতোই শাজঙ্গলী বনবির সঙ্গে, গোরাচাঁদের কাহিনিতে ছোন্দল গোরাচাঁদের সঙ্গে সর্বদা ঘুরে বেড়িয়েছে এবং কাজে সহযোগিতা করেছেন। অপ্রধান অথচ গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে তাঁরা কাহিনিতে থেকে গিয়েছেন।

**চাম্পাবতী**

চাম্পাবতী এবং পাতাল রাজকন্যা অজুপার পিতা যুদ্ধের অস্ত্র হিসেবে তাঁদের কন্যাকে ব্যবহার করেছেন। দুই রাজাই নিজের প্রাণ এবং রাজ্যকে বাঁচাতে কন্যাসন্তানকে বিধর্মীর হাতে অর্পণ করেছেন। আবার সত্যপিরের কাহিনিতে নিজেদের সম্মান বাঁচাতে সন্ধ্যাবতীর পিতা কন্যাকে বনবাস দিয়েছেন। অজুপাকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সেকেন্দর সম্মান দিলেও গাজি তা পারেননি। অনেক লাঞ্ছনা চাম্পাবতীকে পেতে হয়েছে, কিন্তু তিনি সর্বদা সতীধর্ম পালন করেছেন। তাঁর

মতো অপমান সহ্য করেছেন বনবিবির কাহিনিতে গুলালবিবি, ফুলবিবি। মেয়েদের করুণ অবস্থা ফুটে উঠেছে তাঁদের জীবনের মধ্য দিয়ে।

দক্ষিণানগরের মটুক রাজার একমাত্র কন্যা ছিলেন চাম্পাবতী। সাত ভাইয়ের একমাত্র বোন তিনি। তাঁর কোনো স্বধীনতা ছিল না রাজপ্রাসাদের বাইরে যাওয়ার। তাই সর্বদা প্রহরীরা তাঁকে পাহাড়া দিয়েছে।

বাপ ভাই বিনে আর পুরুষ কেমন।। চক্ষু মেলি চেয়ে নাহি দেখেছি কখন*[৫১]

নিজের পালঙ্কে গাজিকে প্রথম দর্শনে তাঁর রূপ দেখে মূর্ছা গিয়েছেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে গাজিকে ভয় দেখিয়েছেন। হঠাৎ নিজের ঘরে একজন পুরুষকে দেখে তাকে প্রশ্ন জালে আচ্ছন্ন করা কম সাহসিকতার পরিচয় নয়। গাজিকে তিনি চোর বলে লাঞ্ছনা করেছেন। আবার মনে করেছেন সেই চোর তাঁর হৃদয়হরণ করে নিয়েছে। এইভাবে তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলতে দেখা গিয়েছে। কেবলমাত্র একজন পুরুষের রূপ দেখে চাম্পাবতী তাঁর প্রেমে পড়েছেন। জ্যোতিষ গণনা করে দেখেছেন তাঁর সঙ্গে গাজির জীবন একসূত্রে গাথা রয়েছে।

হইবে সাহেব গাজী প্রাণেশ তাহার।। গাজী বিনে সংসারেতে পতী নাহি আর*[৫২]

গাজি স্বামী হবেন জেনে তিনি স্ত্রীধর্ম পালন করতে শুরু করেছেন। নিজের যৌবনও তাঁর চরণে সমর্পণ করতে চেয়েছেন। রাজকন্যা হয়েও গাজির দাসী এবং ফক্কিনি হয়ে ভিক্ষা করে খেতেও কোনো দ্বিধা ছিল না। তাঁকে পেয়ে চাম্পাবতী নিজের পরিজনদের পর বলেছেন।

মাতা পিতা ভাই বন্ধু সব মোর পর।। তোমা বিনে কেহ নহে জানিবে আমার*[৫৩]

এই কথার মধ্য দিয়ে তাঁকে বেশ খানিকটা স্বার্থপর মেয়ে বলা যায়। সকাল হলে দুজন দুজনকে দেখতে না পেয়ে বিরহজ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছেন। চন্দ্রাণীর লোরকে দেখার পর-মুহূর্তের অবস্থা চাম্পাবতীরর হয়েছে। দৌলতকাজি চন্দ্রাণীর যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তা নিম্নরূপ।

‘ মলিন চিকুর তনু মলিন অম্বর।
দিবস চন্দ্রিমা যেন বদন ধূসর।।
নাহি খায় তাম্বুল না করে জলপা।।
... ... ...
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে বিলাপে মন্দিরে।

স্থির নহে পদগতি ঢলি ঢলি পড়ে।।[৫৪]

চাম্পাবতী পাগলিনি বেশে চুল খুলে শাড়ির আঁচল লুটিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

গাজির জন্যে একসময় চাম্পাবতী অসীম সাহসী হয়ে গিয়েছেন। যে চাম্পাবতী কোনো দিন প্রাসাদের বাইরে পদার্পণ করেননি তিনিই স্বামীকে দেখার জন্যে নদীতে স্নানে গিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে তাঁকে দূর থেকে প্রণাম করেছেন। একজন আদর্শ সতী স্ত্রীর কর্তব্যপালনের চেষ্টায় ছিলেন। কালুর প্ররোচনায় গাজি চাম্পাবতীকে ত্যাগ করতে চাইলে চাম্পাবতী প্রতিবাদী হয়েছেন। এখানেই চাম্পাবতী চরিত্রটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।

এমন পীরিত বন্ধু শিখিলে কোথায়।। ধীক তারে প্রেম শিক্ষা যে দিল তোমায়*
আহা মরি একই রীতি, যেমন ভ্রমরের প্রীতি,
খাইয়া ফুলের মধু ফুল ছাড়ি যায়।। বসে গিয়া অন্য ফুলে, তেমনি ধারা যাই চলে,
অন্য নারী কাছে বুঝি, ছাড়িয়া আমায়*[৫৫]

ধিক্কার করেও গাজির মন পরিবর্তন করতে না-পেরে অনুনয়-বিনয় করে গাজির সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। পথে অনেক অপমান গাজির কাছে তিনি পেলেও সমস্তটাই সহ্য করেছেন।

**সেকেন্দর**

সেকেন্দর চরিত্রের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লক্ষ করা গিয়েছে। কবি এই চরিত্রটি শিল্পসম্মতভাবে গড়ে তুলেছেন। একজন বড়ো যোদ্ধা হয়েও তাঁর জীবন কষ্টে ভরা। বিভিন্ন পরিস্থিতির স্বীকার তিনি। আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে খুবই স্বল্প পরিসরে সেকেন্দর চরিত্রের পরিচয় পাই। বলি রাজার কাছে অজুপাকে পুরস্কার হিসেবে পেয়ে তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। প্রথম পুত্র জুলহাস বারো বছর বয়সে নিখোঁজ হয়ে গেলে তিনি শোকাতর হয়ে পড়েছেন। পিতা হিসেবে তিনি চেয়েছেন পুত্র গাজির উপর রাজ্য তুলে দিয়ে নিশ্চিন্তে জীবন অতিবাহিত করবেন। কিন্তু পুত্র রাজত্ব সামলাতে অনিচ্ছুক হলে, তিনি যে কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাতে তাঁকে পাষাণহৃদয় বলেই মনে হয়েছে। এই আচরণে বোঝা যায় পরপর যুদ্ধজয়ের পর তিনি পরিশ্রান্ত। একজন পিতাকে এমন নিষ্ঠুর হতে আগেও আমরা দেখেছি যখন হিরণ্যকশিপু তার পুত্রের উপর অমানবিক হয়েছে।[৫৬] তবে পুত্র গাজি গৃহ ছাড়লে

খুবই দুঃখিত হয়েছেন এবং অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছেন। চেতনা পাওয়ার পর মাথায় হাত দিয়ে উচ্চই স্বরে কেঁদেছেন এবং নিজেকে দোষারোপ করেছেন। তিনি মনে করেছেন তাঁর অমানবিক ব্যবহারের কারণেই পুত্র রাজ্য ছেড়েছেন। এমন করবে জানলে তিনি কিছু বলতেন না।

| | |
|---|---|
| শূনিল গাজীর বার্ত্তা সাহা সেকেন্দার।। | অজ্ঞান হইয়া পড়ে পালংগ উপর* |
| চেতন হইয়া সাহা কতক্ষণ পরে।। | মস্তকে হানিয়া হাত কান্দে উচ্চশ্বরে |
| কান্দিয়া কান্দিয়া বলে আক্ষেপ করিয়া।। | মোর দোষে গেল পুত্র দেশান্তর হইয়া* |
| আগে যদি জানি আমি করিবে এমন।। | কিছু নাহি বলিতাম তাঁহার কারণ* |
| এ বলিয়া কান্দে সাহা করি হাহা কার।। | শোকের সাগর মধ্যে দিলেন সাতার*[৫৭] |

তাঁর হাহাকার অমূলক লাগে কারণ তাঁর অত্যাচারে গাজি মৃত্যু যন্ত্রণা উপভোগ করেছেন। সেকেন্দর একজন বীর যোদ্ধা হলেও তিনি একজন দুঃখী মানুষ। তাঁর তিন পুত্র কেউই তাঁর মনঃকষ্ট বোঝেন নি। সেই দিক থেকে তিনি একজন ব্যর্থ, ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতা বলা যেতে পারে। অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী সেকেন্দর সম্বন্ধে বলেছেন-

> পুঁথির মধ্যে যে সেকেন্দার শাহের কথা বলা হয়েছে, তাঁর উদ্দেশ্য হলো, নামটি যদি ঐতিহাসিক সেকেন্দার শাহ হন, তাহলে নামটি গ্রহণ করা হয়েছে, ব্যাপারটিকে ঐতিহাসিক পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য, না হয় সেকেন্দার নামে অপর আর কেউ ছিলেন; কিন্তু তার পরিচয় কিছু পাওয়া যায় না।[৫৮]

অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী ইতিহাসে চারজন সেকেন্দরের কথা বলেছেন। ১) হিজলীর সেকেন্দার পালোয়ান, ২) লোদী বংশী দিল্লীশ্বর সেকেন্দার লোদী ৩) শূর বংশী সেকেন্দার শাহ শূর ৪) বঙ্গেশ্বর সেকেন্দার শাহ। শেষোক্ত সেকেন্দর সম্বন্ধে তিনি বলেছেন-

> গিয়াসুদ্দীনের পুত্র সামসুদ্দীন, এর পুত্র সেকেন্দার, এর পুত্র বরখান গাজী ও কালু গাজী। কিন্তু দুঃখের বিষয় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এঁদের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যে প্রচুর তা ধরা পড়ে।[৫৯]

**অজুপা**

আবদুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে অজুপা নামের ভিন্ন বানান লক্ষ করা গিয়েছে; যেমন- অজুপা, আজুপা, অজুফা।[৬০] তিনি পাতালের রাজা বলির কন্যা। সৌভাগ্যবশত সেকেন্দর তাঁকে স্ত্রীর মর্যাদা না দিলে রাজকন্যা হয়েও সারাজীবন দাসত্ব করে কাটাতে হত। মাতৃত্বের পরিচয়ে তাঁকে অনেকটা সময় দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কবি অজুপা

চরিত্রটি বাঙালির চিরপরিচিত মায়ের আদলে গড়ে তুলেছেন। যে মায়ের কাছে সন্তান স্নেহ বড়ো। সমস্ত বৈভব যার কাছে তুচ্ছ। রাজমহিষী হয়েও যাকে গর্ব করতে দেখা যায়নি।

প্রথম সন্তান জুলহাস তাঁকে ছেড়ে চলে গেলে পুত্রশোকে তিনি হাহাকার করে বেড়িয়েছেন। কালু, গাজিকে অতি স্নেহে বড়ো করেছেন। গাজি রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে পড়লে শূন্য শয্যায় তাঁকে দেখতে না পেয়ে অজুপার বিলাপ আমাদের বাঙালির চিরপরিচিত অভাগী মায়েদের কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। লক্ষীন্দরের মৃত্যুতে সনকার বিলাপ, রামের বনবাসে কৌশল্যার বিলাপ, চৈতন্যের সন্ন্যাসে শচীমাতার বিলাপ। তিন পুত্রহারা অজুপা ধুলায় লুটিয়ে গাজির নাম ধরে কেঁদেছেন। তিনি বিলাপ করে বলেছেন-

আর না দেখিব চোখে তোমার বদন।।　　আর না শুনিব কানে মধুর বচন*
আর না ডাকিবা মোরে জননী বলিয়া।।　　আর না লইব আমি কোলেতে তুলিয়া*
আহা আহা বিধাতারে এ কেমন বিধি।।　　কি দোষে হইনু হারা হেন প্রাণনিধি *[৬১]

অজুপা নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেছেন। তিনি কখনও কারও অনিষ্ট করেননি, ফলন্ত গাছ তোলেননি, কাউকে পুত্রখাকি বলে গালাগাল দেননি, কারও ভাণ্ডারে চুরিও করেননি সুতরাং তাঁর এমন দুঃখ পাওয়ার কথা নয়। তিনি প্রাণের গাজিকে না-পেলে প্রাণ হারাবেন। প্রথম পুত্রকে তিনি হারিয়েছেন আবার গাজিও তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। এক্ষেত্রে তাঁর সচী মাতার মতো অবস্থা হয়েছে। শচী মায়ের জেষ্ঠ্যপুত্র সন্ন্যাস নিয়ে চলে গিয়েছে আবার কনিষ্ঠ পুত্র নিমাইও তাঁকে ছেড়ে সন্ন্যাস নিয়েছে (১৫১০ খ্রিস্টাব্দে)। যে কালুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে সন্তানস্নেহে বড়ো করেছেন তিনিও পালয়িত্রী মায়ের কষ্ট বোঝেন নি। কৃষ্ণ যেমন পালয়িত্রী মা যশোদাকে ফেলে মথুরাতে চলে গিয়েছিলেন কালুও তেমনি অজুপার স্নেহের মূল্য না-দিয়ে গাজির সঙ্গে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। পুত্রশোকে অজুপার দীর্ঘজীবন অতিবাহিত হয়েছে। দীর্ঘদিন পর আবার সবাইকে পেয়ে অজুপা সুন্দরী-

আমোদ প্রমোদ রহে দিবা রাত্র ভরি*[৬২]

**দক্ষিণরায়**

সুন্দরবন বসবাসকারী মানুষজনদের কাছে দক্ষিণরায় অতি পরিচিত নাম। *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩), *গাজি*

*কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩) *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৪), *পীর গোরাচাঁদ* (রচনাকাল অজ্ঞাত), শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* (প্রকাশিত-২০১১) প্রভৃতি গ্রন্থে দক্ষিণরায়ের পরিচয় পেয়ে থাকি। সেখানে তাঁর নামের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় যেমন- দক্ষিণরায়, দক্ষিনা রায়, কোথাওবা দক্ষিণ দেও। তাঁর সম্বন্ধে বৈচিত্র্যময় কাহিনি রয়েছে।

*বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-র 'কাহিনী আরম্ভ' (পৃষ্ঠা- ২) অংশে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কবি দক্ষিণরায় চরিত্রটির মধ্যদিয়ে সুন্দরবনের ক্ষমতাসম্পন্ন অত্যাচারী মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যিনি শোষকশ্রেণির একজন। তাঁর রক্ত খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের অসহায় মানুষের উপর ক্ষমতাবাণের শোষণের চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। সম্মান এবং পাণ্ডিত্যের সঙ্গে পিতা দণ্ডবক্ষের গড়ে তোলা সাম্রাজ্যকে ভোগ করতে গিয়ে তিনি অসংযমী হয়ে পড়েছেন। তাই শেষপর্যন্ত সেই সাম্রাজ্যকে আর নিজের অধিকারে রাখতে পারেননি।

অত্যাচারী দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে মানুষ ধরে খান। বহু লোক তাঁকে ভয় পেয়ে পুজো করে। তাঁর অত্যাচার থেকে মানুষকে উদ্ধারের জন্য আল্লা বনবিবি এবং সা জংলিকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। বাদাবন দক্ষিণরায়ের জায়গির। তিনি বাদাবনে যত্রতত্র মধুর হাট বসিয়ে রেখেছেন। বনবিবি ও শা জংলি ভাটির দেশ অধিকার করতে এসেছে শুনে তিনি আগুনের মতো জ্বলে উঠেছেন। বনবিবির সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর মা নারায়ণী গিয়েছেন। যুদ্ধে বনবিবি জিতে গেলেও আঠারো-ভাটির অধিকার সকল প্রধানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। কেঁদোখালির জঙ্গলের অধিকার পেয়েছেন দক্ষিণরায়।

দতিনা রায়ের বিবী কেদো খালি দিল।[৬৩]

দক্ষিণরায়ের এলাকায় প্রবেশ করতে হলে নজরানা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। ধোনাই তাঁর সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বাদাবনে মোম-মধুর অন্বেষণে এসে কোনো নজরানা দেননি। দক্ষিণরায় ঠিক করেছেন গড়খালিতে গিয়ে লীলাখেলা দেখাবেন। সমস্ত মোম-মধু তিনি লুকিয়ে

রেখেছেন। নররক্তের বিনিময়ে তিনি তাঁর সৃজিত দ্রব্য তুলে দেবেন। দক্ষিণরায় তাঁকে স্বপ্নে দুঃখের রক্ত খাবার সাধের কথা জানিয়ে বলেছেন-

দুখেকে আমারে দিয়া মধু লয়ে যাহ।[৬৪]

দক্ষিণরায়ের এমন আবদার ধোনা রাখতে বাধ্য হয়েছেন। দুখেকে না-দিলে তিনি পুরো সাত ডিঙাই ডুবিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছেন। কেঁদোখালির জঙ্গলে দক্ষিণরায় বাঘের রূপ ধরে দুখেকে খেতে গিয়েছেন। এখানে তাঁর নর রক্তপিপাসু স্বভাবের পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। তিনি দুখের রক্ত পান করার জন্য ধোনার সঙ্গে যে চুক্তি করেছেন তা নিম্নরূপ-

চাক ভাঙিবারে যবে যাইবে বনেতে।। মেরা নাম লিবে ভাঙিবার প্রথমেতে*
তাহা বাদে দিবে হাত মধুর ভাণ্ডারে।। মৌমাছি উড়িয়া ভাগিয়া যাবে দুরে*
আর এক বাত আছে কহি তুঝে এবে।। একজন সাথে লিয়া বনেতে যাইবে*
নাহি দিব মোম মধু তোমাকে ভাঙিতে।। তামাসা দেখিবে ঘুরে ফিরে জংগলেতে*
আমার লস্কর দিয়া মধু ভাংগাইবে।। বেসেরবে তোমার ডিঙাতে পৌছাইব*
কিন্তু সেই কথা মেরা ইয়াদ রাখিবে।। যাই বার সময় দুখেকে দিয়া যাবে*[৬৫]

দুখে উদ্ধারের জন্য বনবিবির নির্দেশে শা জংগলি ঘটনাস্থলে গিয়ে দক্ষিণরায়ের মাথায় জোরে চড় মেরেছেন। চড় খেয়ে তিনি দক্ষিণের দিকে পালিয়ে গিয়েছেন। সামনে নদী পেরিয়ে ভাংগড়ে গাজির কাছে আশ্রয় নিয়েছেন। বনবিবির পালায় লক্ষ করা যায় দক্ষিণরায় এবং গাজি পরম বন্ধু। গাজি বলেছেন-

নামেতে দক্ষিনা দেও বন্ধু যে আমার।। তোমার বিবাদ কিসে সংগেতে ইহার*
শা জংলি কহে তুমি জাত ইসলামের।। রাক্ষসের সাথে দোস্তি তোমার কিসের*[৬৬]

গাজি দক্ষিণরায়কে বনবিবি ও শা জংলির কোপানল থেকে উদ্ধার করেছেন। বনবিবিকে বুঝিয়েছেন দক্ষিণরায় সম্পর্কে বনবিবির ছেলে হয়। কেননা নারায়ণী ও বনবিবি পরস্পর সখী সম্পর্ক পাতিয়েছেন।

আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে দক্ষিণরায়ের নাম দক্ষিণ দেও রয়েছে। এখানে গাজি তাঁর বন্ধু নন। মটুক রাজার বন্ধুত্ব রক্ষা করতে দক্ষিণরায় গাজির সঙ্গে আঠারো দিন ব্যাপী ভয়ানক যুদ্ধ করেছেন।[৬৭] মটুক রাজা অনেক উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে

খুশি করে যুদ্ধের জন্য রাজি করিয়েছেন। উপঢৌকনের মধ্যে সবই খাদ্য দ্রব্য দেখে তাঁর খাদ্যরসিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। মটুক রাজার আহ্বানে তিনি সম্মতি জানিয়ে বলেছেন-

এখনী যাইব আমি থাকহ নিশ্চীতে।। মারীব সকল বাঘ ফকির সহিতে*
এবলিয়া উঠে দেও রুষীয়া তখন।। সমরে যাইতে অঙ্গে পরেন বসন*[৬৮]

তাঁর মধ্যে একটি হুজুগে মনোভাব লক্ষ করা গিয়েছে। দক্ষিণরায়কে দেখে গাজির যে পতিক্রিয়া তাতেও তাদের বন্ধুত্ব আছে বলে বোঝা যায় না।

দেখিয়া সাহেব গাজী কহে বাঘগণে।। দেখহ দক্ষিণা দেও আসিতেছে রণে*
চারিদিকে বেড় গিয়া কাতার বান্ধিয়া। শুনিয়া চলিল বাঘ গর্জিয়া গর্জীয়া*[৬৯]

জলদেবীর কাছে দক্ষিণরায় সাহায্যের প্রার্থনা করেছেন গাজিকে হারানোর জন্য। গাজির পরিচয় হিসেবে তিনি বলেছেন-

পশ্চীম দেশেতে ঘর বৈরাট নগর।। তাহার পিতার নাম শাহা সেকেন্দর
অজুপা বলীয়া সুতা তাহার জননী* শুনীয়াছী লোকমুখে আমি নাহি চিনী*[৭০]

তাঁর কথা শুনে বোঝাই যায় দক্ষিণরায় এবং গাজি পরস্পর অপরিচিত। বনবিবির কাহিনিতে দক্ষিণরায়ের শক্তির পরিচয় সেভাবে পাওয়া যায় না। কারণ বনবিবির সঙ্গে নারায়ণীর যুদ্ধ হয়েছে। তাঁর যুদ্ধ না করার মধ্যদিয়ে নারীর প্রতি অসম্মান, অবজ্ঞা ফুটে উঠেছে।

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে দক্ষিণরায়ের সাহসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যুদ্ধের আগে অনেক অশুভ সংকেত পেলেও তিনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাননি। দীর্ঘ যুদ্ধের পর হেরে গিয়ে তিনি গাজির কাছে প্রাণভিক্ষা চাইতে বাধ্য হয়েছেন। চিরকাল তিনি গাজির সেবক হয়ে থাকবেন এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর কেচ্ছা-কাহিনিতে দক্ষিণরায়ের পরিচয় খুব সামান্যই পাওয়া গিয়েছে। গোরাচাঁদ একবার চন্দ্রকেতু রাজাকে হারিয়ে ছোন্দলকে নিয়ে দক্ষিণরায়ের মুলুকে যান। সেখানে দক্ষিণরায় তাঁকে যথাযথ সমাদর করেছেন। এইটুকুই যা পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

শ্রী সত্য নারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী* থেকে জানা যায় দক্ষিণরায় একজন ব্যাঘ্রদেবতা। পাশ্চাত্য বণিকদের আসার পর মধু ও লবণ সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের যাতায়াত ঘটেছে। বনে প্রবেশ করে গাছ কাটলে হিংস্র বাঘ নিকটবর্তী লোকালয়ে চলে আসে। এরফলে মানুষের মধ্যে বাঘের ভীতি বাড়ে। সেই কারণেই ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দক্ষিণবঙ্গে ব্যাঘ্রদেবতার পুজোর প্রচলন অধিক মাত্রায় আরম্ভ হয়ছে। এই গ্রন্থ থেকে আরও জানা যায় যে দক্ষিণবঙ্গে তিনটি ব্যাঘ্র-দেবতার পুজো হয়। হিন্দুদের পূজিত দক্ষিণরায়, মুসলমানদের পূজিত বড়খাঁগাজি অথবা মোবারকগাজি এবং বনবিবি। উত্তরবঙ্গের রংপুর অঞ্চলে সোনারায় নামের ব্যাঘ্রদেবতার পুজো প্রচলিত আছে। পাবনা জেলায় রয়েছেন পির সোনারায়। ময়মনসিংহ জেলায় বাঘাই, গাজিসাহেব ও শালপীন নামের ব্যাঘ্রদেবতার পুজো প্রচলিত আছে। হিন্দু ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পুজো কেবল মাত্র দক্ষিণবঙ্গেই সীমাবদ্ধ।[৭১] কৃষ্ণরাম দাস *রায়মঙ্গল* (রচনাকাল- ১৬৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দ) কাব্যে দক্ষিণরায়ের পুজোর প্রসঙ্গে বলেছেন-

নৈবেদ্য বাড়াইয়া দিল কনকের থালে। ঘৃত দধি দুগ্ধ মধু অপূর্ব্ব সকলে।।[৭২]

চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন অঞ্চলে দক্ষিণরায়ের পুজো হয়। বট, অশ্বত্থ, বেল, নিম গাছের তলায় এই দেবতাকে দেখতে পাওয়া যায়। মাটির ঢিবি কিংবা সিঁদুর মাখানো প্রস্তর খণ্ড কিংবা কল্পিত মুণ্ড প্রতিমা রূপে পুজো করা হয়। সাধারণত পৌষ সংক্রান্তির দিন এই দেবতা পুজো করা হয়ে থাকে। দক্ষিণরায়কে নিয়ে তিনখানি পাঁচালির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যার লেখকেরা হলেন- কৃষ্ণরাম দাস, হরিদত্ত এবং রুদ্রদেব।

ক্ষেত্র গবেষণায় দেখা গিয়েছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় মাঘ মাসের শনি ও মঙ্গলবারে নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের বারা মূর্তিতে পুজো করা হয়। বাস্তুর মঙ্গলকামনায় তাঁদের পুজো করা হয়। মনসা গাছের তলায় দক্ষিণ দিকে মুখ করে ঘরের বাইরে ফাঁকা স্থানে এই পুজোটি হয়। (চিত্র- ৬ ও ৭) দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বেগমপুর নিবাসী ফাল্গুনীকুমার নস্কর মহাশয়ের বাস্তুতে এই পুজো হতে দেখেছি। তিনি জানিয়েছেন চার পুরুষ আগে থেকে এই পুজো হতে তিনি শুনেছেন। তার আগে হত কিনা তিনি জানেন না। বেগমপুরে তার পৈতৃক ভিটেতে এই পুজো করা হত। পরে বেগমপুরের অন্যত্র গৃহ নির্মাণ করলে সেখানে তিনি পূর্বের মতোই পুজো করেন। তিনি এই বারা মূর্তিকে চন্দ্র সূর্য পুজোও বলেছেন।

আব্দুর রহিম সাহেব *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে দক্ষিণরায়ের চেহারা, যুদ্ধের পোশাক ও বলিষ্ঠতার বর্ণনা দিয়েছেন।

বার হাত ছিল লম্বা চুল তার মাথে*
ভয়ঙ্কর অঙ্গ অতি পর্ব্বত আকার।।
হাতীর কানের মত কান দুটি তার*[৭৩]

মটুক রাজার বিপদে তিনিই প্রথম যুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। গাজির বাঘ সৈন্য মটুক রাজার রাজ্যে ত্রাসের সৃষ্টি করলে নির্ভিক দক্ষিণরায় তা শুনে ভয় না পেয়ে হেসেছেন। তিনি মটুক রাজাকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন। যুদ্ধে গাজিকে পরাস্ত করবেন বলে রাজাকে আশ্বস্ত করে বলেছেন-

এখনী যাইব আমি থাকহ নিশ্চীতে।। মারিব সকল বাঘ ফকির সহিতে*
এবলিয়া উঠে দেও রুষীয়া তখন।। সমরে যাইতে অঙ্গে পরেন বসন*[৭৪]

তিনি গাজির বাঘ সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ভয় না পেয়ে উৎসাহী হয়েছেন। যুদ্ধ যাত্রাকালে বিভিন্ন অশুভলক্ষণ দেখে তিনি চিন্তিত হয়েছেন। তিনি অযাত্রা করাই উচিত জেনেও প্রবল আত্মসম্মান থাকায় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। চারিদিকে যুদ্ধের বাদ্য বেজে উঠেছে আর সকলেই যুদ্ধ দেখবার জন্য উদগ্রীব হয়ে আছে। সেখান থেকে পিছিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রথমে পরিল ধূতী লম্বা আশী হাত।। দশ মনী লোহার টুপী দিলেন মাথাতে*
চল্লীশ মনের এক জীঙ্গীর কোমরে।। আটিয়া বান্ধিল দেও ধুতির উপরে*
শত মন খাড়া খানী বগলে লইল* আশী মন ঢাল খানী গর্দ্দানে বান্ধিল*
তিনশ মনের গদা হাতেতে লইয়া।। যাত্রা করি যায়বীর সময়ে চলিয়া*[৭৫]

দক্ষিণরায়ের যুদ্ধের পোশাক সম্বন্ধে জেনে বিস্ময় জাগে। এখানে তাঁকে যথার্থ বীর বলে মনে হয়। অস্ত্রগুলির ওজন শুনলেই সাধারণ মানুষ ভয় পায়, কিন্তু সেগুলি নিয়ে অনায়াসেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়েছেন।

দক্ষিণরায় যুদ্ধে সাহায্যের জন্য জলদেবীর কাছে পৌঁছান। জলদেবী তাঁকে সাহায্য করতে অস্বীকার করেছেন কারণ গাজি তাঁর বোনের পুত্র। জলদেবী তাঁকে যুদ্ধ বন্ধ করার পরামর্শ দিলে তিনি জানিয়েছেন-

কেন মা তোমাকে তবে করিনু স্মরণ*

প্রাণ ভয়ে পালাইলে হাসীবেক লোকে।।[৭৬]

জয় পরাজয় তিনি কিছুই চান না, কিন্তু একজন বীরের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে-যাওয়া বড়ো অপমানের তা তিনি মনে করেছেন। যুদ্ধে হার জিত আছে। একজন জিতলে অপরজন হারবে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে গেলে তাঁকে সকলে ভীরু বলবেন তা তিনি চাননি। জলদেবীর কাছে অনেক অনুনয়-বিনয় এবং আত্মহত্যার ভয় দেখিয়ে দশ হাজার কুমির সৈন্য আদায় করে রণ স্থলে পৌঁছিয়েছেন। গাজির বাঘ সৈন্যের কাছে দক্ষিণরায়ের কুমির সৈন্য যখন হেরে গিয়ে পলায়ন করেছে তখন তিনি হায় হায় করে কেঁদেছেন। ফকির গাজির কাছে তাঁর মৃত্যু জেনেও তিনি যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করেননি।

দক্ষিণরায়ের এক বিশেষ ক্ষমতা ছিল। তিনি যেভাবেই হোক অন্যকে নিজের দলে টানতে পারতেন। প্রথমে জলদেবী পরে দানবকে। দানবের সামনে আত্মহত্যার ভয় দেখালে তিনি দেও, দান, ভূত, প্রেত, চৌষট্টি যোগিনী যুদ্ধে সাহায্যের জন্য দিয়েছেন। গাজির সঙ্গে দক্ষিণরায় এর কোনো বিরোধিতা ছিল না। শুধুমাত্র মটুক রাজার জন্য তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধ করে গিয়েছেন। গাজি আল্লার সহায়তায় জিতে ছিলেন তাই দক্ষিণরায়কে প্রকৃত বীর এবং পরোপকারী ব্যক্তি বলা যায়।

**মটুক রাজা**

মটুক রাজা দক্ষিণানগরের রাজা হলেও তিনি একজন মেরুদণ্ড হীন রাজা। রাজার দায়িত্ব প্রজাদের রক্ষা করা, কিন্তু এবিষয়ে তিনি অক্ষম। গাজি বাঘ সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করতে এলে তিনি ভয় পেয়ে দক্ষিণরায়ের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছেন। নানা উপঢৌকন নিয়ে তাঁকে যুদ্ধে সম্মত করেছেন। বিপদে পড়ে তিনি তাঁর কাছে কেঁদেছেন। একজন রাজার এমন আচরণ শোভা পায়নি।

হেন কালে গেল রাজা কান্দিয়া কান্দিয়া।। প্রণাম করিল গিয়া চরণে ধরিয়া*[৭৭]

দক্ষিণরায় তাঁকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, কিন্তু রণক্ষেত্রে মটুক রাজা তাঁকে সাহায্য না-করে উদাসীন ভাবে বসে থেকেছেন।

বসিলেন মটুক রাজা লালানের ছাতে।। দক্ষিণা দেওয়ের সমর এই দেখিতে*
সাত পুত্র নয় শালা সভাসদ লইয়া।। বসিয়া দেখেন রাজা গালে হাত দিয়া*[৭৮]

দক্ষিণরায় বাঘের ভয়ে অস্থির হওয়ার মুহূর্তেও মটুক রাজা তাঁর সাহায্যের হাত বাড়াননি। অথচ তাঁর সম্মান বাঁচানোর জন্যই তিনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি একজন ভীতু রাজা কারণ বাঘ গর্জন করলে মটুক রাজার দুই চোখে জল পড়েছে।

দক্ষিণরায় গাজির কাছে পরাস্ত হলে মটুক রাজা অসহায় হয়ে পড়েছেন। বাঘের হাতে তাঁর জাতিকুল চলে যাবার আশঙ্কায় তিনি ত্রস্ত হয়েছেন। তাঁর পাত্রমিত্ররা শান্তনা দিলেও তিনি সাহস অর্জন করতে পারেননি। গাজির বাঘ সৈন্যের কাছে পরাস্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছেন। কালুর কাছে কেঁদে কেঁদে বলেছেন-

গাজিকে কহিবে বাবা তুমি বুঝাইয়া* প্রাণ রক্ষা যদি তিনি করেন আমার।।[৭৯]

নিজের প্রাণ বাঁচাতে গাজির কাছে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে নিজ কন্যাকে তাঁর সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন। পাতালের রাজা বলির মতো তিনি একজন ব্যর্থ পিতা এবং রাজার উদাহরণ।

**জুলহাস**

কয়েকটি অপ্রধান মানব চরিত্রের মধ্যে একজন হল জুলহাস। তিনি সেকেন্দর এবং অজুপার প্রথম সন্তান। খুব অল্প বয়সে শিকারে বেরিয়ে একটি মায়ার হরিণকে ধরতে গিয়ে সুড়ঙ্গের মধ্যে জঙ্গ বাহাদুরের রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছেন। জঙ্গ বাহাদুরকে নিজের পরিচয় দিয়ে রাজ্যে ফিরতে চেয়ে বলেছেন -

বাপের দুলাল আমি মায়ের পরানি*
আমি বিনা পুত্র কন্যা নাহি আর।।
মরিবেন পিতা মাতা শোকেতে আমার*[৮০]

জুলহাসের রূপে মুগ্ধ হয়ে রাজা নিজ কন্যা পাঁচতলা এবং রাজত্ব তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। রাজত্ব ও রাজকন্যাকে পেয়ে পরিবারকে ভুলেছেন। কোনো ভাবে পরিবারের কাছে সংবাদ দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। জুলহাস চরিত্রটির তেমন কোনো গুরুত্ব না থাকলেও কাহিনির প্রয়োজনে কবি নিয়ে এসেছেন। আসলে জুলহাসের ভাই গাজির রাজত্ব ছেড়ে ফকির হয়ে যাওয়ার পথে খানিক বাধার সৃষ্টি করে কবি গাজির প্রতি আল্লার কৃপা এবং আল্লার প্রতি গাজির ভক্তি দেখিয়েছেন। একটি স্বার্থপর চরিত্র হিসেবে কবি তাঁকে তুলে ধরেছেন।

### লীলাবতী

লীলাবতী চাম্পাবতীর মা এবং সখীও বলা চলে। চাম্পাবতী কান্নায় ভেঙে পড়লে তিনি নানা প্রশ্নের মাধ্যমে কন্যার মনের কথা জানতে পারেন। প্রথমে কাঁদলেও পরে সঠিক পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি চাম্পাবতীকে মতি স্থির করে ঘরে বসে ধ্যান করতে বলেছেন। তাঁর ধারণা বিধাতা সকল কর্মের কর্তা। কপালে যা লেখা থাকে সেটাই হয়। কপালে যদি গাজির সঙ্গে মিলন লেখা থাকে তবে নিশ্চই দেখা হবে। তাঁর এই চরিত্রের পরিচয় পেয়ে বিপদের সময় অস্থির না হয়ে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রাখা যায় তার শিক্ষা পাওয়া যায়। বনবিবির কাহিনির গুলালবিবি কিংবা সত্যপিরের কাহিনির সন্ধ্যাবতীর সঙ্গে তাঁর কোনো মিল নেই। গুলালবিবি নিজের সদ্যজাত কন্যাকে জঙ্গলে ফেলে রেখে চলে গিয়েছে আর সন্ধ্যাবতী গর্ভাবস্থায় সন্তানকে আঘাত করে নিজের দুর্ভাগ্যের জন্য দোষী করেছে। আবার গাজির কাহিনিতে সন্তানদের গৃহত্যাগ করায় অজুপা শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন। পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিতে আমরা বিভিন্ন অনুভূতির মায়ের চরিত্র লক্ষ করেছি।

### পাঁচতলা

এই চরিত্রটি খুবই অল্প সময়ের জন্যে কাহিনিতে থাকলেও পাঠকের ভালোলেগে যাবার কথা। দীর্ঘদিন জুলহাসের সঙ্গে নিজের পিতৃ রাজ্যে থাকায় তাঁর প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে ওঠে। গাজির হাত ধরে হেসে জানিয়েছেন বিলম্ব না করে শ্বশুর ঘরে গিয়ে শাশুড়ি শ্বশুরকে সেবা করতে চান। মটুক রাজার কন্যা চাম্পাবতীর সঙ্গে পরিচয় কালে তিনি তাঁকে বোন বলে আলিঙ্গন করেছেন।

## ২.খ. *পীর গোরাচাঁদ* গ্রন্থের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ:

মৌখিক কাহিনি যখন লিখিত রূপ নেয় তখন তার একটি নির্দিষ্ট রূপ পায়। সেই কাহিনির বিকৃতির সম্ভবনা কম হয়ে যায়। চব্বিশ পরগনায় যে সকল পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনি নিয়ে গ্রন্থ লেখা হয়েছিল তার মধ্যে গোরাচাঁদের কাহিনি অন্যতম। গ্রন্থটি থেকে তৎকালীন সমাজচিত্র উঠে এসেছে।

খোদা নেওয়াজ গোরাচাঁদের মাহাত্ম্য দেখাতে গিয়ে ভিন্ন খণ্ডকাহিনি নিয়ে এসেছেন। সেখানে গোরাচাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, আবেগ, অনুভূতি সেভাবে দেখানো হয়নি। একজন বীর

যোদ্ধা এবং পরপকারী পির হিসেবে তাঁকে আমরা লক্ষ করেছি। গোরাচাঁদকেন্দ্রিক যে খণ্ডকাহিনিগুলি রয়েছে সেগুলি হল- চন্দ্রকেতুর ও আকানন্দ বাকানন্দের সঙ্গে গোরাচাঁদের যুদ্ধ, আকানন্দের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর গলা অর্দ্ধেক কেটে যাওয়া, বাদশার কবল থেকে গয়লাদের উদ্ধার, এরপর বাঘের আতঙ্ক থেকে মানুষদের উদ্ধার এবং বাদশাকে দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার, পেয়ারের কাহিনি, মিরখাঁকে দারিদ্র্যতা থেকে উদ্ধার কাহিনি। কবি হয়তো পালাগানের জন্যই খণ্ড খণ্ড কাহিনি নির্মাণ করে গ্রন্থ রচনা করেছেন। কিংবা সমাজে যেসব পালা করে গোরাচাঁদের মাহাত্ম্যগীত গাওয়া হত তা নিজের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছেন।

গোরাচাঁদ পিরের জন্ম একটি মুসলমান পরিবারে এবং ঘর দিল্লীতে।

ধরনি লোটায় ছির, বন্দিনু গোরাই পীর, ঘর তাঁর দিল্লীর সহরে*[৮১]

বিনয় ঘোষের *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (তৃতীয় খণ্ড, ১৯৯৪) গ্রন্থে গোরাচাঁদের পরিচয় জানা যায়। তাঁর আসল নাম পির হজরত শাহ সইয়দ আব্বাস আলী রাজী। তাঁর পিতা হলেন- হজরত করিম উল্লাহ এবং মাতা মায়মুনা সিদ্দিকা। আনুমানিক ১২৬৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মৃত্যু হয়েছে ১৩৭৩ খ্রিস্টাব্দে, ১২ ফাল্গুন, ৮০ বছর বয়সে।[৮২] মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অমায়া জঙ্গলে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন ইসলাম ধর্ম প্রসারের উদ্দেশ্যে।

গোরাচাঁদ অমায়া জঙ্গলে এসে অনাহারে আল্লার নাম করেছেন। এরপর বালেণ্ডা নগরে চন্দ্রকেতু রাজার সঙ্গে তাঁর ঝামেলা হয়। বেড়াচাঁপা চন্দ্রকেতুগড়ের[৮৩] রাজা চন্দ্রকেতুকে তাঁর অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন। রাজা তাঁকে গুরুত্ব না-দিলে হামা ও দানা নামক দুই বীরকে মেরে দুইখান করে দিয়েছেন। তিনি রাজাকে মুসলমান হতে বলেছেন, কিন্তু রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না-করলে পির তাঁকে বদ দোয়া অর্থাৎ অভিশাপ দিয়েছেন। ফকিররা ইসলাম ধর্মপ্রচার করতে আসতেন এই ঘটনা তার প্রমাণ। গোরাচাঁদ নিজেও বলেছেন –

পয়দা চৈয়দ কুলে গোরাই নাম ধরি।। তুড়িয়া কুফর যত মুসলমান করি*[৮৪]

তিনি ছোন্দলকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণরায়ের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পিরের মুখে চন্দ্রকেতু রাজার কথা শুনে খুশি মনে নিজের রাজত্ব ভাগ করে দিয়েছেন। গোরাচাঁদের ক্ষমতা শুনে দক্ষিণারায় তাঁকে ভক্তি করেছেন।

সমাজে ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের দুর্বলের উপর অত্যাচার করে প্রাণে মেরে দেওয়ার ঘটনা রয়েছে এই মুদ্রিত কাহিনিতে। দক্ষিণের দিকে হাতিয়াগড় পরগনাতে আকানন্দ নামে একজন রাক্ষস রাজা ও তাঁর ভাই বাকানন্দ শিবের বরে মহাশক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। প্রত্যহ তারা একটি করে মানুষ মেরে খেত। দুজনে একসাথে যুদ্ধ করলে সমস্ত দেবগণ এবং ত্রিভুবন কাঁপে। গোরাচাঁদ অসহায় মানুষকে উদ্ধারের জন্য হাতিয়াগড় যাওয়া মনস্থির করেছে। বিনয় ঘোষ গোরাচাঁদ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তির কথা উল্লেখ করেছেন-

> পীর গোরাচাঁদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল হাতিয়াগড় পরগণা। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহিদানন্দ। ইনি রাক্ষসদের অধিপতি বলে কথিত। এঁর দুই পুত্র আকানন্দ ও বাকানন্দ (অকানন্দ-বাকানন্দ) গোরাচাঁদের ধর্মান্তরের অভিযান প্রতিরোধ করেন।[৮৫]

হাতিয়াগড় এসে গোরাচাঁদ অনেক খুঁজে একটি মুসলমান পরিবারের সন্ধান পেয়েছেন আশ্রয়ের জন্য। যে বাড়ির মালিক ছিল মোমিন। পির গোরাচাঁদ তাকে উদ্ধার করতে চাইলেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। এই ঘটনায় ফকিরের উপর তখনকার মানুষের অনাস্থা ও অবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। মোমিন অবিশ্বাসী হয়ে পিরকে অসম্মানকর কথাও বলে।

আমার তলব চিঠি তুমি কেন যাবে।। বুঝিয়া ফিকির করে খানা পানি খাবে*[৮৬]

তিনি সমস্ত অপমানকে অগ্রাহ্য করে মোমিনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

গোরাই বলে মোমিন মেরা দেলে নাই কুট।। নিশ্চয় কারার দিলাম না হইবে ঝুট[৮৭]

গোরাচাঁদ বাকানন্দের সঙ্গে বীরের মতো যুদ্ধ করে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের পরিচয় দিয়েছেন। বড়ো নামজাদা পালোয়ানরা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। তিনি বাকানন্দকে হার স্বীকার অথবা মুসলমান হতে বলেছেন।

কলেমা পড়ে হও দীনদার।[৮৮]

বাকানন্দ হার স্বীকার করার পাত্র নয়। তার মহাতেজ দেখে পির আল্লার নাম করে জোরে তলোয়ার মেরে দ্বিখণ্ডিত করে দিয়েছেন। বাকানন্দের মৃত্যুতে আকানন্দ শোকাহত হয়ে কৈলাশ পথে শিবের ধ্যানে বসেছে। তার ধ্যানে সন্তুষ্ট হয়ে শিব তাকে চক্রবান দিয়েছেন।

মহাদেবের জটার মধ্যে চক্রবান ছিল।। এত শুনি সেই বান আকানন্দে দিল*[৮৯]

আকানন্দ শিবের দেওয়া চক্রবান নিয়ে দলবল সহ আক্রমন করেছে। যুদ্ধে গোরাচাঁদের অর্দ্ধেক গলা কেটে গিয়েছে। তাঁর এতটাই সাহস এবং সহ্যশক্তি ছিল যে এই অবস্থায়ও আকানন্দের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে নিহত করেছেন ও তার সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়েছে।

অসুস্থ অবস্থায় নিজের চিকিৎসা নিজেই করেছেন। জোর করে ছোন্দলকে ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিপদের মোকাবিলা নিজেই করেছেন। বনের মধ্যে তিনি ভেবেছেন-

কোন জন করিবে মোর দাফন কাফন[৯০]

তাঁর কষ্ট দেখে কবিলা গাই নিজের দুধ দিয়ে কষ্ট কমানোর চেষ্টা করেছে। কানু ও কিনু ঘোষ দুই গয়লা কবিলার পিরকে দুধ দিতে দেখে নিগ্রহ করেছে। পির অসন্তুষ্ট হয়ে অভিশাপ দেওয়ার কথা বললে কানু ও কিনু ঘোষ তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। তিনি জীবন্ত অবস্থায় নিজের কবর গয়লাদের দিয়ে খুলিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। গোরাচাঁদ কবরে প্রবেশ করলে গয়লারা কবরে মাটি চাপা দিয়েছে। বিনয় ঘোষের লেখা *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে (১৯৯৪) গোরাচাঁদের সমাধি স্থান হাড়োয়ার নাম প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> গোরাচাঁদের হাড় এখানে সমাধি দেওয়া হয়ছিল বলে গ্রামের নাম 'হাড়োয়া'। এখানে তাঁর পবিত্র মাজারে বা দরগাহে প্রত্যেক বছর ১১ ফাল্গুণ থেকে ১৩ ফাল্গুণ পর্যন্ত তাঁর স্মরণোৎসবে বিরাট জনসমাবেশ হয় এবং হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে ভক্তরা এখানে জিয়ারত করে থাকেন[৯১]

কানু ও কিনু ঘোষ গোরাচাঁদকে কবর দিয়েছে এমন খবর চোর মারফত রাজার কানে পোঁছায়। বাদশা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনা তৎকালীন সমাজের সুশাসন ব্যবস্থা নজরে আসে। গয়লাদের শাস্তির খবরে তাদের স্ত্রীরা গোরে গিয়ে শোক করেছে। গোরাচাঁদ বাদশাকে স্বপ্ন দিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবৃতি দিলে বাদশা তাদেরকে বেকসুর খালাস করে দিয়েছে। খুশি হয়ে সকল গয়লারা মিলে গোর পোক্ত করে দিয়েছে এবং তারপর থেকে কবরে দুধ ঢালে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে গোরাচাঁদের কবরে দুধ ঢালার ইতিহাস জানতে পারা যায়।

সেই হইতে আজতক যত গোওয়ালানে।। হামেসা ঢালেন দুধ খোসালিত মনে*[৯২]

গোরাচাঁদ কবরে শুয়ে বারগোবপুরে সকলকে স্বপ্ন দিয়েছে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবার। তিনি বাদশাকে স্বপ্ন দিয়ে প্রজা উদ্ধারের নির্দেশ দিয়েছেন।

বালেণ্ডা বিয়াবান হৈল ভাগে লোক ডরে।। জায়গীর দিয়া বাদসা পাঠাও পেয়ারে*

বালেণ্ডা আবাদ কর পাঠায়ে পেয়ার।। হামেসা করিব দোওয়া খাতেরে তোমার*[৯৩]

বাদশার নির্দেশে পেয়ার বালেণ্ডায় জঙ্গল পরিষ্কার করে জায়গির বসিয়েছেন। সেখানকার মানুষদের পেয়ার সুখে বাস করার কথা বলেছেন। তিনি সন কর মাপ করে দিয়েছেন। প্রজারা মহানন্দে বসতি স্থাপন করেছে। এখানে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'বনকীর্তন'[৯৪] অংশের ছায়া পরিলক্ষিত হয়েছে। কালকেতু গুজরাট নগরপত্তনের সময় বন কেটে পরিষ্কার করে প্রজাদের বাসযোগ্য করে তুলেছে। মানুষকে জলের জন্য অনেক দূর যেতে হত তাই গোরাচাঁদের নির্দেশে পেয়ার প্রজাদের সুবিধের জন্য দিঘিও খনন করে দিয়েছে। এ যেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর নগরপত্তন দৃশ্য। এই ঘটনাগুলি দেখানোর মধ্য দিয়ে গোরাচাঁদের কাহিনিটি মধ্যযুগের সাহিত্য হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ভিন্ন খণ্ডকাহিনিকে কেন্দ্র করে খোদা নেওয়াজ গোরাচাঁদের মাহাত্ম্য বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

## ২.গ. বনবিবির কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ:

আব্দুর রহীম সাহেবের *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩), কিংবা মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেবের *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৪) এই দুটি গ্রন্থের কাহিনি অভিন্ন। তবে কাহিনি পৃথক শিরোনামে বর্ণিত হয়েছে। মা বনবিবির পিতা-মাতার কাহিনি, বনবিবির জন্ম ও মাহাত্ম্য-কাহিনি বর্ণিত হওয়ার পাশাপাশি ধোনা-মোনা-দুখের কাহিনিও বর্ণিত হয়েছে। কবি মূল কাহিনির মধ্যে বিভিন্ন খণ্ডকাহিনি সুন্দর ভাবে সাজিয়েছেন। প্রথমে বন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু করেছেন। বন্দনা অংশের নাম দিয়েছেন 'হামদ নাত'। হামদ হল আল্লার প্রশংসা করে বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যে-কোনো ভাষায় গাওয়া গান। বনবিবির কাহিনির প্রারম্ভে তিনি পুরাতন ইতিহাস পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন।

পিতা দণ্ডবক্ষকে তাঁর গুণের জন্য মানুষ গণ্য করলেও পুত্র দক্ষিণরায় অত্যন্ত অত্যাচারী রাজা। তিনি বাঘের রূপ ধরে মানুষ খান। তাঁর হাত থেকে মানুষকে বাঁচাতে বনবিবি ও শাজঙ্গলি বাদাবনে অর্থাৎ সুন্দরবনে এসেছেন। বনবিবি গুলালবিবিকে বলেছেন-

খোদার হুকুমে মোরা যাব বাদাবনে।। তোমাদের ঘরে পয়দা হইনু তেকারণে*[৯৫]

ভাগবতে যে কারণে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন।

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানম অধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্
পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাম
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে[৯৬]

বনবিবির জন্মের কাহিনিতে দেখা গিয়েছে এবরাহিমের প্রথম স্ত্রী ফুলবিবির সঙ্গে সুখের সংসার কোনো সন্তান না থাকায় ভেঙে গিয়েছে। স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে মক্কার শহরে শাজলিল নামে এক ফকিরের কন্যা গুলালবিবিকে বিয়ে করেছেন। আল্লার হুকুমে বনবিবি ও শাজঙ্গলির জন্ম হয়েছে। গর্ভাবস্থায় এবরাহিম গুলালবিবিকে একাকী জঙ্গলের মধ্যে রেখে এসেছেন। সেখানে তিনি যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। বনবিবিকে জঙ্গলের মধ্যে একাকী ফেলে, গুলালবিবি শাজঙ্গলিকে নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। সাত বছর পর এবরাহিম স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন। গুলালবিবি স্বামীর সঙ্গে গেলেও দুই ভাইবোন মাতা-পিতার সঙ্গে না-ফিরে আঠারো-ভাটি দখলের জন্যে বেরিয়েছেন। নারায়ণীর সঙ্গে বনবির তুমুল লড়াই হয়েছে। নারায়ণী হার স্বীকার করলে তাঁদের মধ্যে সই সম্পর্ক হয়েছে। বনবিবি নারায়ণীকে বলেছেন-

সকলে আঠার ভাটি লইব বাটিয়া* কার মনে দুঃখ নাহি দিব কদাচন।।[৯৭]

বনের সকল প্রধানকে আঠারো-ভাটি ভাগ করে দিয়েছেন।

এরপর শুরু হয় ধোনা দুখের পালা। ধোনা বাদাবনে মোম-মধু সংগ্রহের জন্য সাতটি ডিঙা প্রস্তুত করেছেন। একটি লোক কম পড়ায় তিনি দুখের মাকে অনেক বুঝিয়ে দুখেকে নানা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে গিয়েছেন।

যত টাকা লাগে তোর দিইব বিবাহ।। আগে কিছু দিই টাকা তেরা মাকে দেহ*[৯৮]

বাদাবনে গেলে দক্ষিণরায়ের দুখেকে দেখে নর রক্ত খাওয়ার সাধ হয়েছে। ধোনা বাধ্য হয়ে কেঁদোখালির জঙ্গলে দুখেকে রেখে দক্ষিণরায়ের দেওয়া মোম-মধু নিয়ে ফিরে গিয়েছেন। নিজেকে বাঁচাতে গ্রামের লোককে জানিয়েছেন দুখেকে বাঘে খেয়ে নিয়েছে। সন্তান ফেরেনি শুনে তার মা শোকে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। এদিকে কেঁদোখালির জঙ্গলে দুখে ব্যাঘ্ররূপী

দক্ষিণারায়কে দেখে মা বনবিবিকে স্মরণ করেছে। বনবিবি নররাক্ষস দক্ষিণরায়কে শাস্তি দিতে শাজঙ্গলিকে পাঠিয়ে দুখেকে উদ্ধার করেছেন।

প্রভূত সম্পত্তি দিয়ে বনবিবি দুখেকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়েছেন। বনবিবির আদেশে ধোনা তাঁর মেয়ের সঙ্গে দুখের বিয়ে দিয়েছেন। দুখে শাহা বিয়ে উপলক্ষে বনবিবির নামে প্রচুর দানখয়রাত করেছে। কাহিনির শেষে দেখা গিয়েছে ধোনা সকল বাড়ি থেকে মাগুন চেয়ে মা বনবিবির পুজো করেছেন। মাগুন চাওয়ার অর্থ হল পাড়া ঘুরে লোকদেবদেবীর পুজোর উপকরণ যেমন চাল, ডাল, আলু, ফলমূল, টাকাপয়সা সংগ্রহ করা। এখানে দেবদেবীর উপর ভক্তির দিকটি নজরে আসে।[৯৯]

*বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে (১৩৯৩) তিন ধরণের চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। দেবচরিত্র, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন চরিত্র এবং সাধারণ মানব চরিত্র। দেব চরিত্র হলেন আল্লা। অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন চরিত্রগুলি হল বনবিবি, শাজঙ্গলি, নারায়ণী, দক্ষিণরায়। মানব চরিত্রগুলি হল এবরাহিম, ফুলবিবি, গুলালবিবি, শাজলিল, দুখে, দুখের মা, ধোনা, মোনা, প্রমুখ। তবে সমগ্র কাহিনিতে বনবিবির মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে।

**বনবিবি**

বনবিবি চরিত্রকে কবি ভাগ্যবিড়ম্বিত নারী হিসেবে অঙ্কন করেছেন। জন্মের পরেই মা গুলালবিবি হিংস্র পশুদের মুখের গ্রাস করে পুত্রসন্তানকে কোলে তুলে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আল্লার আদেশে বনের হরিণদের কাছে তিনি বড়ো হয়েছেন। সাত বছর পর পিতা এবরাহিম তাঁদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসলে, মা গুলালবিবি স্বামীর অন্যায় মাপ করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে ফিরতে চেয়েছেন, কিন্তু বনবিবি আবেগী হয়ে তাঁদের সঙ্গে ফেরেননি। তিনি পিতা-মাতার অন্যায় ক্ষমা করে দিয়েছেন। খোদার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে দুই ভাইবোন আঠারো-ভাটিতে গিয়েছেন। মায়ের অশ্রু বনবিবিকে টলাতে পারেনি।

আঠারো-ভাটির দখল নিতে গিয়ে নারায়ণীর সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে। নারায়ণী সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। এখানে দুই নারীর চুলোচুলি করতে দেখা যায়নি। তাঁরা যুদ্ধে পারদর্শী একথা স্বীকার করতে হয়। বনবিবি আল্লার সহায়তায় জিতে গিয়েছেন। নারায়ণী হেরে গেলেও তাঁকে প্রাণে মারেননি বনবিবি। তিনি একা কোনো কিছুই ভোগ করতে

চাননি। নারায়ণীর সঙ্গে তিনি সই সম্পর্ক পাতিয়েছেন। কাউকে দুঃখ না দিয়ে তিনি আঠারো-ভাটি সকল প্রধানকে ভাগ করে দিয়ে সকলের সর্দার হয়েছেন। তিনি নিজে সীমানা করে নারায়ণীর ছেলে দক্ষিণরায়কে আঠারো-ভাটির একটি অংশ কেঁদোখালি দিয়েছেন। অনেক বড়ো মন হলে এইভাবে নিজের দখল করা সম্পত্তি পরাজিতদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া যায়। তাঁর অন্তরে দয়ার অন্ত নেই। ক্ষমাশীলতার গুণে তিনি আঠারো-ভাটির মা হয়ে ওঠেন। দরিদ্র বালক দুখে ব্যাঘ্ররূপী দক্ষিণরায়ের কবলে পড়লে বনবিবি ভুরকুণ্ড[১০০] থেকে ছুটে এসে তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। নৌকায় দুখেকে রান্না পর্যন্ত করে দিয়ে ধোনার হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে অনেক ধনসম্পত্তি পেয়ে দুখে সমাজের গণ্যমান্য বক্তিতে পরিণত হয়েছে। দক্ষিণরায়ের দুখেকে খেতে যাওয়ার অপরাধও তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। এইভাবে মা বনবিবি সর্বদা ক্ষমাশীলতা এবং উদরতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর উদারতায় বিশ্বাসী হয়ে আঠারো-ভাটি অর্থাৎ সুন্দরবনের মানুষ এখনও বিপদে পড়লে মা বনবিবির নাম করে। দুখের মা দুখের বনে যাবার সময় বলেছেন-

> জগত জননী বোন বিবী বোনে থাকে।। বিপদে পড়িলে তুমি ডাকিও তাহাকে*
> পড়িলে মুস্কিলে তাকে ডেক মা বলিয়া।। দয়ালু মা বোনবিবী লিবে উদ্ধারিয়া*[১০১]

সুন্দরবনের মানুষের মনে প্রাণে মা বনবিবি বিরাজ করেন। ভক্তরা জঙ্গলে প্রবেশের আগে তাঁকে পুজো করে। মেয়েরা সেই কয়দিন বিভিন্ন সংস্কার পালন করে।[১০২] গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বনবিবি সম্পর্কে বলেছেন-

> বনবিবির আকৃতি অপর লৌকিক দেবতার মত উগ্র বা ভয়াবহ নয়, স্বভাবও তাদের মত প্রতিহিংসাপরায়ণ কি সদাক্রুদ্ধ বলে ভক্তরা মনে করে না। ইতি ভক্তবৎসলা ও দয়াবতী এ-ধারণা পল্লীর লোকেদের আছে, এঁর মূর্তিও গঠিত হয় অতি সুশ্রী-পৌরাণিক দেবীদের মতই লাবণ্যময়ী।[১০৩]

কবি বনবিবি চরিত্রটির মধ্যদিয়ে একটি নারীর নিজের ক্ষমতাবলে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাহিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। নিষ্ঠা, আত্মপ্রত্যয়, চেষ্টা থাকলে শত প্রতিকূলতাকে জয় করা যায় তারই উদাহরণ তিনি। তাই সুন্দরবনের মানুষ তাঁকে মানেন এবং বিশ্বাস করেন। একজন আদর্শ নারীচরিত্র তিনি। এই বনবিবির মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করেই আব্দুর রহিম সাহেব *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* (১৩৯৩), মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৪) লিখেছেন।

**গুলালবিবি**

গুলালবিবি চরিত্রটিকে কবি নির্জীব করে দেখিয়েছেন। সমাজে অজস্র নারী আছে যারা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। নিজস্ব চিন্তাভাবনা, বিবেকবুদ্ধি কিছুই থাকে না। নিজেকে পুরুষের দাস ভাবে। জীবনকে ভবিতব্যের হাতে ছেড়ে দেয়।

গুলালবিবি ভালোমন্দ বিচার না-করে পিতার পছন্দ করা পাত্রকে বিয়ে করেছেন। শাজঙ্গলি এবং বনবিবি গর্ভে থাকা অবস্থায় এবরাহিম তাঁকে বনের মধ্যে একাকী ফেলে রেখে এলে তিনি অসহায়ের মতো কান্নাকাটি করেছেন। আল্লাকে নিজের বিপদ থেকে উদ্ধার করার কথা বলেছেন। আল্লার নির্দেশে হুর এসে তাঁকে রক্ষা করেছেন। অথচ তিনি পুত্রসন্তানকে কোলে তুলে নিয়ে কন্যাসন্তানকে ত্যাগ করে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। এখানে তাঁর নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। আল্লার ইচ্ছায় প্রতিকূল অবস্থায় যদি তাঁর সন্তান সুস্থ ভাবে জন্মাতে পারে তবে তাঁর ইচ্ছায় তারা বড়োও হবে এই দূরদর্শিতা ছিল না। ফুলবিবির থেকে এখানে তিনি কম নিষ্ঠুর ছিলেন না। সাত বছর পর এবরাহিম ফিরিয়ে নিতে এলে, সাময়িক মান অভিমান করে সন্তানদেরকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে ফিরতে চেয়েছেন। এখানে নিতান্তই তাঁকে নিলজ্জ নারী বলে মনে হয়েছে। শাজঙ্গলি মাতা-পিতার সঙ্গে ফিরলে বনবিবি তাঁকে নিষেধ করেছেন। তখন বনবিবির জন্যে গুলালবিবির কান্নাটা কুমিরের কান্না বলে মনে হয়েছে। বনবিবিও তাঁর মাকে পূর্বের কৃতকর্মের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

বেটার দরদ মাগো হৈল তেরা দেলে।। করিলে দয়ামায়া বেটি লাড়কি বলে*
এক গর্ভে হইনু বহিন আর ভাই।। কার ভাগ্যে হৈল দয়া কার ভাগ্যে নাই*[১০৪]

শাজঙ্গলিকে নিয়ে বনবিবি আল্লার হুকুমে বাদাবনে যাবার প্রস্তুতি নিয়েছেন। তখন গুলালবিবি কেঁদে কেঁদে বলেছেন-

কহিল তোমরা হইলে আমার উদরে।। আর কেহ নাহি মেরা দুনিয়া ভিতরে*
জাকানদানি অক্তে এক কলেমা পড়াইবে।। মউতের বাদে গোর কাফন কেবা দিবে*[১০৫]

শেষ কথাটির মধ্য দিয়ে বনবিবির জন্য কাঁদার আসল উদ্দেশ্য বোঝা যায়। মৃতুর পরে কে গোর দেবে সেই চিন্তাতে তিনি ব্যস্ত।

**ফুলবিবি**

নিঃসন্তান নারীর অস্তিত্ব বিপন্নের উদাহরণ হল ফুলবিবি। এবরাহিম ও তাঁর সুখের সংসার নষ্ট হয়ে গিয়েছে একটি সন্তান না থাকায়। সমাজের মানুষ তাঁকে আটকুড়ো বলবে এই চিন্তায় ফুলবিবির মন অস্থির হয়েছে। তিনি মনে করেছেন-

গাছ নাহি শোভা পায় বেগর ফলেতে[১০৬]

ফুলবিবির জীবনে হঠাৎ আল্লার নিষ্ঠুর আঘাত নেমে এসেছে। স্বামীর ভালোবাসা পেলেও তাঁকে সন্তান দিয়ে সুখী করতে পারেননি। এবরাহিমের সন্তান হবে, কিন্তু-

লাড়কা না হইবে কভু ফুল বিবীর পেটেতে[১০৭]

তিনি স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। যদিও স্বামীকে শর্তের বিনিময়ে বিয়ের অনুমতি দিয়েছেন। যথাসময়ে গুলালবিবিকে গর্ভাবস্থায় এবরাহিমকে দিয়ে বনে বাস করাতে বাধ্য করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁকে নিষ্ঠুর বলা হলেও তাঁর এই আচরণ অস্বাভাবিক নয়। বনবিবি, ফুলবিবি, গুলালবিবি, চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন সমাজে নারীর স্থান বোঝা যায়।

**দুখের মা**

দুখের মা ছাড়া অন্য কোনো নাম কাহিনিতে নেই। একমাত্র সন্তানকে তিনি কিছুতেই কাছ ছাড়া করতে চাননি। প্রয়োজনে ভিক্ষা করে ছেলেকে খাওয়াতে রাজি আছেন, কিন্তু কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যেতে দিতে চাননি।

তোমার রোজগারে বাবা নাহি প্রয়োজন।। ভিক্ষা মেঙ্গে খাওয়াইব তোমার কারণ*[১০৮]

ধোনার সঙ্গে অর্থ উপার্জনের জন্য দুখেকে তিনি কিছুতেই পাঠাতে চাননি। একজন মায়ের সন্তানের প্রতি যে গভীর ভালোবাসা তা ফুটে উঠেছে তাঁর চরিত্রের মধ্যে। দুখের জেদে তার মুখ চেয়েই তিনি বাধ্য হয়েছেন ধোনার সঙ্গে ছেড়ে দিতে। বনবিবির প্রতি গ্রামীণ বিশ্বাস তাঁর মধ্যেও ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন মা বলে ডাকলে বনবিবি বিপদ থেকে আর্ত মানুষকে রক্ষা করেন। সেই বিশ্বাস তিনি তাঁর সন্তানের মধ্যেও দিয়ে দিয়েছেন। বিপদে পড়লে মা বনবিবির স্মরণ করতে বলেছেন। বাদাবন থেকে ধোনা এবং তাঁর সঙ্গীরা ফিরে এলেও দুখে আসেনি শুনে তিনি পুত্রের জন্য হাহাকার করতে করতে অন্ধ এবং বধির হয়ে গিয়েছেন। দুখের মা

বলে সমাজে তাঁর পরিচয় থাকলেও সন্তানের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও স্নেহের উদাহরণ হিসেবে কাহিনিতে তিনি অন্যতম স্থান দখল করে আছেন।

**শাজলিল**

খুবই অল্প পরিসরে শা জলিলের পরিচয় পাই। *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে (১৩৯৩) এবরাহিমের সঙ্গে তাঁর মেয়ে গুলালবিবিকে বিয়ে দিতে চেয়েছেন তার অনুমতি না নিয়ে। এবরাহিম বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এলে তিনি বলেছেন-

> সাদীর লায়েক বেটি হয়েছে আমার।। রাজি যদি হয় বিবী পরওয়া নাহি তার*
> তোমাকে শুপিব বেটি না আছে ওজর।।[১০৯]

সেক্ষেত্রে গুলালবিবির আক্ষেপ লক্ষ করা গিয়েছে। মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছের মূল্য নেই তাঁর কাছে।

মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* গ্রন্থে এবরাহিম শাজলিলকে গুলালবিবিকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলে মেয়ের অনুমতি চেয়েছেন। এক্ষেত্রে কবিকে আধুনিক মনস্ক বলা যেতে পারে। এবরাহিম শাজলিলের কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি তাঁকে বসতে দিয়ে বলেছেন-

> বেটীকে এ কথা আগে পুছে আইসি আমি*
> যদি সেহ শুনে রাজি হয় এই বাতে।।
> সাদী তেরা দেলাইব তাহার সহিতে*[১১০]

**এবরাহিম**

বনবিবির পিতা এবরাহিমের জীবন খানিক দুর্যোগপূর্ণ। কঠিন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করবার মতো ক্ষমতা তাঁর ছিল না। ফুলবিবির সঙ্গে সুখেই সংসার করছিলেন তিনি, কিন্তু ফুলবিবির গর্ভে সন্তান না আসায় তিনি হতাশগ্রস্থ হয়ে পড়েছেন। সন্তান পাবার আসায় তিনি বাধ্য হয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন। তবে দ্বিতীয় স্ত্রীর সঙ্গেও নিষ্টুর আচরণ করেছেন তিনি। ফুলবিবির শর্ত পূরণ করতে গর্ভাবস্থায় গুলালবিবিকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছেন। পিতা হবার জন্য তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন ঠিকই, কিন্তু পিতার দায়িত্ব একবিন্দুও পালন করেননি। স্ত্রীদের সুরক্ষা তিনি দিতে পারেননি। এক্ষেত্রে তাঁকে আদর্শ পিতা কিংবা আদর্শ স্বামী কিছুই বলা যায় না। দীর্ঘ

সাত বছর তিনি গুলালবিবি ও তাঁর সন্তানদের অসহায় অবস্থায় জঙ্গলে ফেলে রেখেছেন। তারপর নিজের দুঃখ দূর করার জন্যই গুলালবিবি ও তার সন্তানদের ফিরিয়ে আনতে গিয়েছেন।

**শাজঙ্গলি**

বনবিবির যমজ ভাই হলেন শাজঙ্গলি। জন্মানোর সাত বছর পর দিদির সঙ্গে দেখা হলেও তিনি দিদির কথাতেই পিতা-মাতার সঙ্গ ত্যাগ করেছেন। তাঁকে সর্বদা বনবিবির আজ্ঞাবহ হিসেবে দেখা গিয়েছে। ওয়াকিল আহমদ জানিয়েছেন-

> বনে বাঘ, সাপ, কীটপতঙ্গ, কুমির, এমনকি, ভূত-প্রেতেরও ভয়। এ অবস্থায় মানুষের জীবন বিপদমুক্ত ছিল না। গোরু-বাছুরের জীবনও বিপন্ন হত। বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য জঙ্গলীপীর, বনবিবি, দক্ষিণরায় প্রভৃতি বনের অধিপতি পিরপিরানীর ও দেবদেবীর কল্পনা লোকমানস থেকে সহজেই উৎপন্ন হয়েছে।[১১১]

**ধোনা ও মোনা**

বারিজহাটিতে দুই ভাইয়ের ঘর। ধোনার ইচ্ছা বড়োলোক হবে। সেক্ষেত্রে সাত ডিঙা নিয়ে বাদাবন থেকে মোম-মধু সংগ্রহ করে আনতে চান। তাঁর মধ্যে মনসামঙ্গল কাব্যের চাঁদ সওদাগরের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। বাদাবনে সর্বদা বাঘ, সাপ, কুমির এছাড়া আরও হিংস্র জন্তুর দ্বারা বিপদ ঘটতে পারে তাই মোনা ভাইকে আপত্তি জানিয়েছেন। ধোনা নির্ভীক একজন মানুষ। ভয় পেয়ে গুটিয়ে থাকার মানুষ নন। বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বিপদকে উপেক্ষা করে বাদাবনে গিয়েছেন। তাঁর মধ্যে কোনো কিছু করে দেখানোর মতো দৃঢ়তা ছিল। মোনা ভাইকে যেতে বাঁধা দিলে ধোনা বলেছেন-

> বসিয়া খাইলে টুটে রাজার ভাণ্ডার।। মানা নাহি আছে কিছু করিতে রোজগার*
> শুস্তি করিলে হয় আওকাত খারাব।। আক্কেল খারাপ হয় পিইলে শারাব*[১১২]

ধোনায়ের কথার মধ্যে দিয়ে কাজ করার প্রেরণা চলে আসে। তাঁর কথায় বাস্তববাদিতা খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। মোনা ধোনায়ের দৃঢ় সঙ্কল্পের কাছে দমে গিয়ে সাত ডিঙা তৈরি করে দিতে বাধ্য হয়েছেন। ডিঙা উঠলে এক লোকের অভাব হয়েছে। তাতে ধোনা দমে না গিয়ে দুখেকে স্মরণ করেছে। দুখের মায়ের অনুমতি নিয়ে ছলাকলা করে দুখেকে নিয়ে গিয়েছেন।

তিন দিন ধরে তাঁরা মোম-মধুর অন্বেষণ করেছেন, কিন্তু দক্ষিণরায়ের ছলনায় তা উধাও হয়ে গিয়েছে। ধোনা হতাশ হয়ে কান্নাকাটি করেছেন। দক্ষিণারায় তাঁকে স্বপ্ন দিয়েছেন নররক্ত না-পেলে মোম-মধু কিছুই দেখা পাবেন না। ধোনা বিবেক বর্জিত মানুষ নন। গরিব লোকজন কিছু অর্থ উপার্জনের জন্য এসেছে তার সঙ্গে। তাদের কিছুতেই নরখাদক দক্ষিণরায়ের হাতে তুলে দিতে তিনি পারবেন না। দুখে তার মায়ের একমাত্র সন্তান। বুড়ি বিধবা মাকে অনেক আশাভরসা দিয়ে তিনি দুখেকে তার সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। গরিব মানুষদের জীবনের পরিবর্তে তিনি কিছু চান না। দক্ষিণরায় ভয় দেখিয়েছে সকলকে মাঝনদীতে ডুবিয়ে দেওয়ার। ধোনা অন্যের জীবনের পরিবর্তে নিজের জীবনকে তাঁর কাছে উৎসর্গ করে দিতে চেয়েছেন। গরিব মানুষগুলিকে যে-কোনো মূল্যে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এখানেই তাঁর মহানুভবতার পরিচয় আমরা পাই। দক্ষিণরায় এবং তাঁর কথোপকথন খানিক তুলে ধরা হল।

রায় বলে ওরে ধোনা কি বলিব আর।। রক্ত খেতে-ওরে বাসনা আমার*
এক লোক মোর যদি দিতে পার তুমি।। মোম মধু সাত ডিঙা দিব তোরে আমি*
রায়ের এই কথা ধোনা যখন শুনিল।। আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল*
গরীবের ছেলে সব লিয়া আইনু রায়।। কার রক্ত খেতে চাও বলনা আমায়*
মোম মধু আর মেরা না আছে দরকার।। কিস্তি লিয়া ফিরে যাই ঘরে আপনার*
ধোনার বাতে রায় গোশ্বায় ভরিয়া।। কহে তেরা নাও সব দিব ডুবাইয়া*
যত লোক আনিয়াছ খাওয়াব কুমিরে।। দেখি বেটা কেমনেতে যাও দেশে ফিরে*
রায়ের এ বাতে ধোনা ডরাইয়া দেলে।। মাত্র করে দেহ মোকে জোড় হাত বলে*
দক্ষিণ রায় বলে বেটা খুবি যদি চাহ।। দুখেকে আমারে দিয়া মধু লয়া যাহ*
ধোনা বলে না পারিব দুখেকে দিইতে।। অনাথ দুখেরে শুপে দিছে মোর হাতে*
নেহাত গরীব দুখে শোন রায় মনি।। কেন্‌দে কেন্‌দে মারা যাবে দুখের জননী*
একা এক নর রক্ত খেতে যদি চাহ।। সকলে বালক ঘরে মোর তরে লেহ*[১১৩]

শেষ দুই লাইনের মধ্য দিয়ে কবি ধোনাকে পাঠকের কাছে আরও মহান করে দিয়েছেন। ধোনা নিজের সন্তান দিতে চেয়ে গরিবদুঃখী মানুষদের প্রাণভিক্ষা করেছেন। সাধারণ মানুষ হয়ে একজন রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। শেষপর্যন্ত তিনি বাধ্য হয়েছেন দুখেকে নর রক্তপিপাসু দক্ষিণরায়ের হাতে তুলে দিতে। বনবিবির কৃপায় দুখে বাড়ি ফিরে এলে তিনি দুখের সঙ্গে তাঁর মেয়ে চম্পাকে বিয়ে দিয়ে পূর্বের প্রতিশ্রুতি পালন করেছেন।

বনবিবি বাদাবন দখল করতে যাওয়ার মধ্যে মুসলমান আধিপত্যের দিকটি উঠে এসেছে। প্রথমে তাঁরা খড়্গাহস্ত ধারণ করেছেন। নারায়ণীর সঙ্গে তাঁর দোর্দণ্ডপ্রতাপ যুদ্ধ তারই সাক্ষ বহন করে। বনবিবি প্রচণ্ড শক্তিশালী রমণী। নারায়ণীও কম শক্তিশালী নন। বনবিবি আল্লার নির্দেশেই বাদাবন জয় করতে এসেছেন আবার আল্লার সহায়তায় যুদ্ধে জয়লাভ করেছেন। এখানে প্রশ্ন জাগে আল্লা কে যার নির্দেশে বনবিবি বাদাবন দখল করতে এসেছেন। আল্লা শাসকশ্রেণির ক্ষমতার চূড়ান্তে বসে থাকা ব্যক্তি বলে মনে হয়েছে। যিনি সমগ্র দেশে তাঁর আধিপত্য বিস্তার করে বেড়িয়েছেন। বাদাবনে ক্ষমতার শীর্ষে বসে ছিলেন নারায়ণী। দণ্ডবক্ষ নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তির স্ত্রী তিনি। বহু লোকজন ডণ্ডবক্ষকে সমীহ করে চলতেন। তাঁর মধ্যে হরেকরকম বিদ্যা ছিল। বাদাবনের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ তাঁর কথা শুনে চলত। নিজের ক্ষমতাবলে নারায়ণী তাঁর রাজত্ব গড়ে তুলেছিল। বনবিবি এসে সেই সাম্রাজ্য দখল করেছেন। এখানে হিন্দু মুসলমান সংঘাতের দিকটি চোখে পড়েছে। আবার যুদ্ধের শেষে তাঁদের সখী সম্পর্ক পাতানোর মধ্যে দিয়ে সম্প্রীতির দিকটি উঠে এসেছে। বনবিবির দুখেকে রক্ষা করার মধ্য দিয়ে এদেশে মুসলমান শাসকের হিন্দু প্রজাদের রক্ষার দিকটি চোখে পড়েছে। পির গোরাচাঁদ মৃত্যুর পরে কবরে গিয়ে হিন্দুদের নানান বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। তাদের নানান সমস্যা থেকে উদ্ধারের মধ্য দিয়ে হিন্দু মুসলমান সৌভাতৃত্বের সম্পর্কটি চোখে পড়েছে।

*গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে বরখানগাজি আল্লার সহায়তায় তাঁর পিতার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন। সমগ্র দেশ জুড়ে তিনি ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটিয়েছেন। যেখানে হিন্দুরা তাঁকে মানেনি সেখানে তিনি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে আল্লার সহায়তায় পরাজিত করেছেন। গাজির ক্ষমতা দেখে তারা কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছে। কখনও যুদ্ধ করে, কখনও আর্থিক সহায়তা করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে দেখা গিয়েছে। সুন্দরবনে অনেকেই তাঁর শিষ্য হয়েছে। সেখানে মানুষেরা তাঁকে পির বলে মেনেছে। বাঘ এবং পরি তাঁর কাছে মুরিদ[১১৪] হয়েছে। দুইভাই ছাপাই নগরে শ্রীদাম রাজার রাজ্যে গিয়েছেন। যবন দেখে রাজা কোটালদের দিয়ে বের করে দিয়েছেন। গাজি ও কালু তাদের আচরণে রুষ্ট হয়ে প্রতিশোধ নিয়েছেন। শ্রীদাম রাজা নিজের ভুল বুঝতে পেরে গাজির কাছে কলেমা পড়েছেন এবং সমস্ত রাজ্যবাসী মুসলমান হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। এরপর গাজি কালু অতি ভয়ংকর কাননের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়

আল্লার নাম নিয়ে নিজেদের ভয় দূর করেছেন। আল্লা তাঁদের একমাত্র সহায়। গাজি বনের মধ্যে গরিব কাঠুরিয়াদের দুঃখ দূর করেছেন। বিপুল ধনসম্পত্তি দিয়ে কাঠুরিয়াদের জন্য সুন্দর প্রাসাদ এবং বড়ো করে মসজিদ বানিয়ে দিয়েছেন। এখানে আবার ইসলাম ধর্মের প্রসারের দিকটি লক্ষ করা গিয়েছে। গরিব মানুষদের আর্থিক সাহায্য করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতের দিকটি চোখে পড়েছে।

*পীর গোরাচাঁদ*-এর কাহিনিতে দেখা যায় আল্লা গোরাচাঁদের সখা। বালেণ্ডায় চন্দ্রখেতু অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। সহজে রাজত্ব, নিজের সম্মান বিকিয়ে দেওয়ার ছিলেন না। গোরাচাঁদ তাঁর মহিমা অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছেন।

পাকাইল লোহারকলা, বেড়ায় ফুল ফুটিল চাপার।।[১১৫]

চন্দ্রখেতু রাজা তাতেও নিজের গৌরব বিসর্জন দিতে চাননি তাই হামাদানা দুই বীরকে পাঠিয়েছেন। পিরের মারে তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছে। চন্দ্রখেতু রাজাকে পির বাধ্য করেছেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে। গোরাচাঁদ আকানন্দ ও বাকানন্দকে হারিয়ে দিয়েছেন।

পির গাজিরা বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়েও ইসলাম ধর্মের প্রচার করেছেন। গাজি মটুক রাজাকে হারিয়ে তাঁর কন্যা চাম্পাবতীকে বিয়ে করেছেন। মটুক রাজা সহ দক্ষিণানগরের সমস্ত রাজ্যবাসী কলেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন।

পির ফকিরেরা যুদ্ধ করে, নিজেদের ক্ষমতা দেখিয়ে, রাজ্য জয় করেছেন। কিন্তু কাহিনিগুলিতে সেই রাজ্য নিজেদের দখলে রাখতে দেখা যায়নি। বনবিবি আঠারো-ভাটি জয় করেছেন, কিন্তু তা নিজের দখলে রাখেননি। নিজে সীমানা করে প্রধানদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। কেউ কারও সীমানায় প্রবেশের অধিকার ছিল না।

ধোনার মাগুন চেয়ে পুজো করা এবং দুখের দানখয়রাতের মধ্য দিয়ে বনবিবির প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসের দিকটি উঠে এসেছে। ভক্তরা মনে করেছেন বনবিবি আঠারো-ভাটিতে মানুষের রক্ষাকর্ত্রী। তিনি অন্যায়ের দমন করেছেন। পির গোরাচাঁদের কবরে গয়লারা দুধ ঢেলে ভক্তি নিবেদন করেছেন। গোরাচাঁদকে তাদের কাছে মুশকিল আসানের দেবতা মেনেছেন।

## ২.ঘ. সত্যপিরের কাহিনি ও চরিত্র বিশ্লেষণ:

সত্যপির হলেন বাংলার হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের এক মিশ্রদেবতা। 'সত্য' আরবি 'হক' শব্দের প্রতিশব্দ।[১১৬] সুফি গুরুরা ঈশ্বরকে এই নামে ডাকেন। মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান* (১৯৯২) গ্রন্থে বলেছেন-

> সত্য পীর, মানিক পীর, একদিল শাহ্, মোবারক গাযী প্রভৃতি নায়কগণ মূলতঃ কাল্পনিক পীর-দেবতা, তাঁরা রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ নন। কোনো কোনো সত্যপীর কাহিনীতে পীরকে একজন কুমারী কন্যার কানীন পুত্র রূপে দেখানো হলেও তাঁকে ঠিক রক্তমাংসের মানুষ বলে ধরা যায় না। তিনি দেবতা স্থানীয় একজনই রয়ে গেছেন।[১১৭]

লোকসংস্কৃতি গবেষক গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু মনে করেন, ফকির বেশধারী ধর্মঠাকুর সপ্তদশ শতকের শেষদিক থেকে সত্যপির এবং সত্যনারায়ণের সঙ্গে মিশে গিয়েছেন।[১১৮]

সত্যনারায়ণ কিংবা সত্যপিরের নামে বহু পুথি সাহিত্য এবং পাঁচালি কাব্য রয়েছে। রমাপ্রসাদ নাগ এন জুলফিকার *দীপন* (২০১২) পত্রিকায় সম্পাদকীয় অংশে বলেছেন-

> সত্যপীর পুথিসাহিত্য রচনা হয়েছিল মধ্যযুগে। সেই সময়ে লিখিত কিছু সত্যপীর পুথির উল্লেখ পাওয়া গেলেও অধিকাংশ পুথিরই কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতারা সত্যপীর সাহিত্যের যথাযথ মূল্যায়ন করেন নি। অথচ বাংলা লোকজীবনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে, তাই একে বাদ দিলে বাংলার লোকসংস্কৃতি অনেকটাই অজানা থেকে যাবে এবং এই পুথি রচয়িতাদের সাহিত্য-দক্ষতাও পাঠকের অগোচরে রয়ে যাবে।[১১৯]

সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিগুলি পড়লে তাঁর সম্বন্ধে অনেক গালগল্পে ভরা কাহিনি যে সমাজে পুথি ও পাঁচালি আকারে প্রচলিত আছে তা জানতে পারা যায়। সত্যনারায়ণ-সত্যপির কাহিনি নিয়ে কাব্যরচনা করেছেন প্রায় শতাধিক কবি এবং কয়জন মুসলমান ছাড়া তাঁরা বেশিরভাগই হিন্দু। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়ার মতে পির কাহিনির সৃষ্টি সর্বপ্রথম মুসলমান কবি শেখ ফয়জুল্লার দ্বারা হয়েছিল। সেই কারণে-

> হিন্দু-মুসলমান মিশ্র পীর দেবতা হলেও সত্যপীরের মধ্যে ইসলামের প্রভাব বেশি।[১২০]

*দীপন* (২০১২) পত্রিকা থেকে[১২১] সত্যপিরের বেশকিছু কাহিনি নিয়ে আলোচিত হয়েছে এই অধ্যায়ে। যেখানে সত্যনারায়ণ-সত্যপিরের মাহাত্ম্য, জন্ম পরিচয় রয়েছে। এছাড়াও সমাজে

তাঁর গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তার পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে। সবগুলির রচনাকাল পাওয়া যায়নি।

১) মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি- *সত্য পীরের পুথি*
২) শ্রী কবিবল্লভ- *সত্যনারায়ণের পুথি* (পালা সমাপ্ত- সন ১১৬২সাল ১৮ই বৈশাখ)
৩) কৃষ্ণহরি দাস- *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*
৪) দ্বিজ রামধন- *সত্য নারায়ণের পুথি* (খণ্ডিত)

### কৃষ্ণহরি দাস রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*

উপরিউল্লিখিত কাহিনিগুলির মধ্যে উত্তরবঙ্গের কৃষ্ণহরি দাসের লেখা মুদ্রিত কাহিনিটি সবথেকে বড়ো। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলেও এখান থেকে পাওয়া যায়নি। *দীপন* (২০১২) পত্রিকার সহসম্পাদক তপন বাগচী ঢাকা থেকে সংগ্রহ করে *দীপন* (২০১২) পত্রিকায় ছাপবার জন্য দেন। ২১-২২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাওয়া গিয়েছে। প্রথম এবং শেষদিকের পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি। সুকুমার সেন কৃষ্ণহরি দাসের লেখা কাহিনিটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লেখা বলেছেন এবং গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু বলেছেন-মধ্যযুগের পাঁচালিকার।[১২২]

ওসমানিয়া লাইব্রেরি কিংবা গওসিয়া লাইব্রেরিতে প্রকাশিত গ্রন্থগুলির থেকে সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিগুলির পার্থক্য রয়েছে। বিশেষ করে ভাষার দিক থেকে এই পার্থক্যটি পরিলক্ষিত হয়েছে। ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে যেসব গ্রন্থ নিয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে সেইসবগুলিতে বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, তুর্কি শব্দের আধিক্য লক্ষ করা গিয়েছে। এছাড়া এখানে ইসলাম ধর্মের প্রসার এবং মাহাত্ম্য বেশি করে প্রচারিত হয়েছে। অপরদিকে সত্যনারায়ণ-সত্যপিরের কাহিনিতে ধর্মসমন্বয়ের দিকটি বেশি করে দেখানো হয়েছে।

কৃষ্ণহরি দাসের লেখা *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*-তে সত্যনারায়ণের জন্ম পরিচয় দেওয়া রয়েছে। সন্ধ্যার উদরে সত্যনারায়ণের জন্ম হয়েছে। এখানে রামায়ণের প্রভাব রয়েছে। মধ্যযুগের কবিমাত্রই পুরাণকে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে নিজেদের গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন।

বিবাহের পূর্বে সন্ধ্যাবতীর গর্ভসঞ্চারের কথা জানতে পেরে তার পিতা তাকে বনবাস দিতে চাইলে সে বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছে, কিন্তু শেষপর্যন্ত পিতার কথা শুনতে বাধ্য হয়েছে।

কোটালকে দিয়ে পিতার কাছে বনবাসে যাওয়ার জন্য কয়েকটি দাসী চেয়ে পাঠিয়েছে। মায়ের কান্না শুনে সত্যপির মা মা বলে ডেকে সান্তনা দিয়েছে। গর্ভে থেকেই মাকে আশ্রয় দেওয়ার কথা বললেও সন্ধ্যাবতী এমনই নিষ্ঠুর মা যে দুই হাত দিয়ে জোরে জোরে নিজের পেটে চাপড় মেরেছে। কুমারী অবস্থায় গর্ভধারণ সমাজের কাছে কুরুচিকর। বনের মধ্যে একাকী গর্ভাবস্থায় দিনযাপন করতে বাধ্য হয়েছেন। গর্ভভার তাঁর কাছে বারবার অসহ্য মনে হয়েছে। যথাসময়ে সত্যপিরের জন্ম হয়েছে। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম দিতে না-পারায় সন্ধ্যাবতী বাধ্য হয়েছে সন্তানকে জলে ভাসিয়ে দিতে। এখানে নানা কাহিনি ও উপকাহিনি রয়েছে। শিরোনামে সত্যপির ও সন্ধ্যাবতীর কথা থাকলেও সম্পূর্ণ কাহিনিতে সত্যপিরের মাহাত্ম্যের কথা রয়েছে। সেখানে সত্যপির প্রধান হয়ে উঠেছেন। তিনি সাধারণ মানুষকে যেচে উপকার করেছেন। দরিদ্র ব্যক্তিকে ধন দান করে ধনীলোক করেছেন। কিংবা কোনো পতিতাকে তার পাপ কাজ থেকে উদ্ধার করে জীবনে সঠিক পথে চলতে শিখিয়েছেন। তিনি ভক্তের ভক্তির পরীক্ষা নিয়েছেন বারেবারে। তাঁকে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তির উপর রুষ্ট হয়ে তার ধনসম্পত্তিও চিরকালের মতো কেড়ে নিয়েছেন। আবার তাদেরই পরিবারের কেউ একজন তাকে ভক্তি ভরে পুজো দিয়ে বিলুপ্ত সম্পত্তি ফিরে পেয়েছেন। কালকেতুকে চণ্ডী সম্পত্তি দান করার মতো হীরা মুচিকে সত্যপির ধন দিয়েছেন। হীরামুচির স্ত্রীকে অলংকার দিয়েছেন। অপরাধীকে শাস্তি দিয়েছেন।

কৃষ্ণহরি দাস প্রথমে সত্যনারায়ণ এবং সত্যপিরের পরিচয় দিয়েছেন। কবি বলেছেন যিনি সত্যনারায়ণ তিনিই সত্যপির অর্থাৎ এই মুদ্রিত কাহিনিটি হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের কথা বলে। কবি বলেছেন-

চারি প্রাণে নারায়ণ অবতার করে।। সকল প্রমাণ নারায়ণ সত্যনাম ধরে*
সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর।। দুই কুলে লৈছে সেবা করিয়া জাহির*
দুই পথ নাহি যার এক পথ বিনে।। একি নামে তরে যাইবে বৈকুণ্ঠ ধামে*[১২৩]

সত্যনারায়ণের পরিচয় প্রসঙ্গেই সন্ধ্যাবতীর প্রসঙ্গ এসেছে। কবি গুরুকেও সম্মান প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন-

ব্রহ্মজ্ঞান বিচারিয়া কিছু নাহি ফল।। গুরুকে ভজিলে তত্ত্ব জানিবা সকল*[১২৪]

পিতা হয়ে গর্ভবতী কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতীর করুণ আর্তনাদ শোনেননি। সখীদের সঙ্গে সন্ধ্যাবতী নুর নদীর কূলে স্নান করতে গিয়ে জলের স্রোতে একটি ফুল ভেসে আসতে দেখে

শুঁকে নিয়েছিলেন। তার ফলেই সে গর্ভবতী হয়ে গিয়েছে। কাহিনিটি অলৌকিক হলেও সন্ধ্যাবতীর জীবনের পরিণতি বাস্তবসম্মত। এখানেই কবি শিল্পরূপ ফুটিয়ে তুলেছেন। তার কাছে পতি ঈশ্বর তুল্য। অথচ পতি ছাড়াই সে গর্ভবতী হয়েছে। তাই তার মুখে বিশাদের স্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছে। সব অপমান সহ্য করে দশমাস গর্ভে সন্তান ধারণ করেও সে পূর্ণাঙ্গ সন্তানের জন্ম দিতে পারেনি। সেই দুঃখও কম নয়। সন্ধ্যাবতী বিধির এই পরিহাসে সমস্ত প্রিয়জনকে হারিয়েছে। পিতা বনবাস দিয়েছে আর মা তাকে কলঙ্কিনী বলে দূরে সরিয়েছে। রাজকন্যা হয়েও দাসীদের পা ধরে সেধেছেন তার সঙ্গে যাবার জন্য। বনবাসে যাবার সময় ভাই শামসুন্দর ও দামুদর তার মুখ পর্যন্ত দেখতে চায়নি।

শামসুন্দর বলে সন্ধ্যা এক্ষনে মরুক।। কি লাজে দেখাতে চাহে তার ছার মুখ*[১২৫]

ভাইদের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় সন্ধ্যাবতীর রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের কথা মনে এসেছে। রাম ও লক্ষ্মণ যখন বনবাসে গিয়েছেন তখন তাদের প্রিয় ভাই ভরত উপস্থিত ছিলেন না। বিদায়ের সময় মায়ের পাশে একসঙ্গে খেতে চাইলে রানিমা তার বিরোধিতা করে বলেছেন-

জাতি মজাইল তুই হইয়া গর্ভধারী।। তোমার সঙ্গে ভোজন আমি করিতে না পারি*[১২৬]

মায়ের কথা শুনে সন্ধ্যাবতীর ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয়েছে। চোখের জলে থালা ভেসে গিয়েছে। গর্ভাবস্থায় সত্যনারায়ণ সব জানতে পেরে মাকে আশ্বাস দিয়েছেন, মায়ের এই কষ্ট তিনি একদিন দূর করবেন। কিন্তু ভগবানেরও সেই সাধ্য নেই যে, সমাজে কলঙ্কিনী নারীর কলঙ্ক দূর করবেন। মেয়েদের ধনসম্পত্তি, প্রভূত ঐশ্বর্য কোনো কিছুই সুখ এনে দিতে পারে না যদি তার সমাজে কলঙ্ক থাকে। কোটাল এসে সন্ধ্যাবতীকে বেগবতীর তীরে রেখে গিয়েছে। বনবাস করাকালীন হিংস্র বণ্যপ্রাণীদের থেকে সত্যপির মা সন্ধ্যাবতীকে সর্বদা রক্ষা করেছেন। সন্ধ্যাবতীর পিতা, কুলের কলঙ্ক দূর করতে কন্যার সাপের কামড়ে মৃত্যু হয়েছে ঘোষণা করেছেন।

রাজা বলে কোতআল বলি তেরা তরে।। কলঙ্ক কেমনে ছাড়ে বল দেখি মোরে*
কোতত্তাল বলে রাজা বুদ্ধি নাহি তোরে।। সন্ধ্যার সমান একটা মুরত গঠ তারে*
নুর নদীর ঘাটে তাটে বাল্ল ঘাট দিয়া।। সাধ করহ তার জ্ঞাতিগণ লিয়া*
সন্ধ্যাবতী মৈল বলি সকলে জানিবে।। এমন প্রকারে তার কলঙ্ক ছাপিবে*[১২৭]

মাঘ মাসে ঘোর নিশি, গুরুবার ত্রয়োদশীতে সন্ধ্যাবতী সত্যনারায়ণের জন্ম দিয়েছে।

কি কব পীরের কঠা, হস্তপদ নাহি মাথা, মুখ নাহি নাসিকা শ্রবন।।
ক্ষেনে২ লড়ে চড়ে, রক্ত সীমা গড়ি পরে, এই রূপে সত্যের জনম*[১২৮]

এরপরই সন্ধ্যাবতীর আক্ষেপ শোনা গিয়েছে। বিষাদের সুরে কেঁদে জানিয়েছে পতিকে সেবা করতে পারেনি। দশমাস গর্ভে পুত্র ধারণই করেছে, কিন্তু মা হতে পারেনি। শুধু শুধুই সে কলঙ্ক বয়ে বেড়িয়েছে। কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হওয়ায় তার আক্ষেপের শেষ ছিল না, কিন্তু সন্তান না পাওয়ার বেদনাও তাকে গ্রাস করেছে।

ধরিনু উদরে মাত্র কোলে না লইনু।। লালন পালন করি রঙ না দেখিনু*
পুত্র বিনে নারী লোকের বিফল জীবন।। ফল না থাকিলে বৃক্ষ পোছে কোনজন*
বাপে পালে শিশুকালে যুবাকালে পতি।। ভাগ্যে থাকে শেষকালে পুত্রে করে গতি*
মোর ভাগ্যে তিন কালে আর নাহি কেহ।। জীবন ছাড়িলে মোর শৃগালে খাবে দেহ*
... ... ...
স্বপনে পাইনু ধন জাগিয়া হারানু।। সেহি মতে স্বপনে মুঞি পুত্র পাইয়াছিনু*
হারানু মানিক ধন কেবা দিবে মোকে।। ক্ষেপ্ত হইয়া সন্ধ্যাবতী কান্দে পুত্রশোকে*[১২৯]

সন্ধ্যাবতী দুই দাসীকে নিয়ে বেগবতীর জলে রক্তদলা ভাসিয়ে দিয়েছে। এরপর থেকেই সন্ধ্যাবতীর কাহিনি ক্ষীণ হয়েছে। রক্তদলা এক কচ্ছবিনীর মুখ থেকে পেটে প্রবেশ করেছে। এরফলে কচ্ছপী গর্ভবতী হয়েছে। প্রসব করার সময় দেখে সে একটি মানুষের জন্ম দিয়েছে। একজন মানুষের সঙ্গে সে নিজের সম্বন্ধ কিছুতেই স্বীকার করতে চায় নি। সত্যপিরের আশীর্বাদে কচ্ছপী নিজের মূর্তি ছেড়ে বিদ্যাধরী মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। পূর্বজন্মে সে একজন ব্রাহ্মণের বিধবা ছিল। কায়মনে সে সত্যপিরের সেবা করেছিল। সে চেয়েছিল নারায়ণকে যেন পুত্র রূপে পায়, কিন্তু বিধবা হয়ে কচ্ছপের মাংস খাওয়ার অপরাধে কচ্ছপী হয়ে জন্ম নিয়েছে। তবে সত্যনারায়ণকে সেবা করেছিল বলেই তাঁর সংস্পর্শে সমস্ত পাপ দূর হয়ে গিয়েছে। সত্যনারায়ণের আশীর্বাদে পুষ্পরথে করে বিদ্যাধরী বেশে সে স্বর্গে চলে গিয়েছে।

সত্যপিরকে নিয়ে কাহিনি নির্মিত হলেও গুরুরও গুরু আছে। কচ্ছপীকে পাপমুক্ত করে তিনি জলে ঝাপ দিয়ে খোওয়াজ জেন্দাপিরের কাছে গিয়েছেন। সত্যপির তাঁকে নিজের গুরু বলে মেনেছেন। সুফি সম্প্রদায়ে গুরুদের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি লক্ষ করা গিয়েছে। চর্যাপদে বৌদ্ধ

সিদ্ধাচার্যদের মধ্যেও আমরা গুরুভক্তি লক্ষ করি। এখানে সুফি ধর্ম কিংবা বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের প্রভাব রয়েছে বলা যায়। নিম্নে সত্যপিরের গুরুর মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে।

গুরুকে ভজনে হয় জনম সফল।। গুরুকে না ভজিলে তার জনম বিফল*
গুরু কৃপা বিনে কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।। গুরুকে না ভজিলে তার জনম বৃথায়*
দেশে বেড়াইলে গুরুর অন্ত না পায়।। পরম নিগূঢ় কথা মরসেদ বাতায়*
মনুষ্য হইয়া সেবা গুরু নাহি ভজে।। কোটি২ পুন্য করি নরকেতে মজে*[১৩০]

তিনি গুরুর কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে গিয়েছেন। খোওয়াজ জেন্দাপির তাঁকে কিছুতেই শিষ্য বানাতে চাননি। সাতদিন নয় রাত্রি তিনি তাঁকে অনুসরণ করেছেন। খোওয়াজ বুঝেছেন সত্যপির ছেড়ে দেবার পাত্র নন। তিনি সত্যপিরের কলিকালে কী কারণে আবির্ভাব তা জানতে চেয়েছেন। এখানে সত্যপিরের জন্মের কারণ ভাগবতে নারায়ণের কৃষ্ণরূপে দ্বাপর যুগে এবং *শ্রী চৈতন্যভাগবত*-এ কৃষ্ণের চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কারণের অনুরূপ করে দেখিয়েছেন। সত্যপির তাঁর জন্মের কারণ হিসেবে জানিয়েছেন-

সত্যপীর বলে তার শুন সমাচার।। যে কারণে কলিকালে জনম আমার*
মালঞ্চেতে মৈদানব রাজা বড়াই গাঙার।। দুগতি করিয়া মারে ফকির আল্লার*
সেই মৈদানব রাজাকে ডরে সর্ব্বজনে।। বাঘ কুম্ভির জন্তু তাহার দোহাই মানে*
রাজাকে সাজাই করে হেন কেই নাই।। আমাকে পাঠাইয়া দিল অখিলের সাই*
সেই রাজার কন্যার নাম দেবি সন্ধ্যাবতী।। মায়ারূপে তার গর্ভে আমার উৎপত্তি*[১৩১]

এরপর খোওয়াজ জিন্দা হরষিত মনে সত্যপিরকে কলেমা পড়িয়েছেন। মুরসিদ বলে সত্যপিরও তাঁকে সালাম করেছেন। সুকুমার সেনের লেখা *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড, ২০০৭) মুক্তারাম দাসের লেখা *গোয়াল পাড়া জেলার প্রাচীন পুথির বিবরণ* নামক একটি গ্রন্থের (রচনাকাল- ১১৮৭ সাল, ১৭০২ শকাব্দ) পরিচয় পাওয়া যায় যেখানে সত্যনারায়ণ পুজোর ইতিহাস হিসেবে বলা হয়েছে-

বিষ্ণু লক্ষ্মীকে কলিযুগে সত্যসেবা প্রচার করবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন।[১৩২]

সত্যপির পাঁচ বছর হলে সন্ধ্যাবতীর কাছে দেখা দিয়েছেন। ঘুমন্ত মাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন তার পুত্র এসেছে যেন সে চোখ মেলে তাকায়। এরপর হীরা মুচির পালা আরম্ভ

হয়েছে। এই পালায় সত্যপির হীরা মুচির পিরের প্রতি ভক্তির পরীক্ষা নিয়েছেন। সেই ভক্তির পরীক্ষায় সে জয়লাভ করেছে। সত্যপির তাঁকে প্রচুর ধনসম্পত্তি দিয়েছেন।

পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*-তে কাহিনির বিভিন্ন প্রসঙ্গে যাবার সময় একটি করে শিরোনামের উল্লেখ করেছেন। যেমন- 'কোতত্তাল সন্ধ্যাবতীকে বনবাসে রাখিয়া বাদশার দরবারে যায়', 'হীরা মুচির পালা আরম্ভ', 'বুনন কোটাল রাজাকে সংবাদ দেয় তাহার বিবরণ', 'হীরা মুচিকে গেরেপ্তার করে রাজসভায় আনে ও পুনর্ব্বার ধন মাল আনিবার বিবরণ', 'হীরার করুণা শ্রবণ ও চৌত্রিশ অক্ষরের বয়ান', 'শশী বেশ্যার পালা আরম্ভ ও সত্যপীরের গায়েব হইবার বয়ান', 'জসমন্ত সাধুর বাণিজ্যে যাত্রা', 'জসমন্ত সাধুর বিবরণ', 'সত্যপীর জসমন্ত সাধুর একটা ডিঙ্গা লইয়া অন্তর্দ্ধ্যান হয় তাহার বয়ান'।

সত্যনারায়ণ-সত্যপিরের অজস্র কাহিনি রয়েছে। তাঁর মাহাত্ম্য জনসমাজে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে রয়েছে তা বলা যায়। বহু কবি তাঁর কাহিনিকে নিজেদের কবিপ্রতিভা দিয়ে মহিমান্বিত করেছেন। নিম্নে সেইসব কাহিনি নিয়ে আলোচিত হয়েছে।

### মোছান্নেফ মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি রচিত *সত্য পীরের পুথি*

এই মুদ্রিত পুথিটি সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ড. তপন বাগচী।[১৩৩] এটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা। প্রতিটি পঙ্‌ক্তির শেষে কবি সত্যপিরের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করেছেন।

কবি বারবার সত্যপিরকে স্মরণ করলেও তাঁর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা দেখিয়েছেন। সত্যপির আল্লার কাছে প্রার্থনা করে সুন্দরকে বাঁচিয়েছেন। সুন্দরের দুই ভাই বাণিজ্যে গেলে তার জীবনে বিপর্যয় নেমে এসেছে। বানিয়া কুলেতে জন্ম হয়েছে জয়ধর সওদাগরের। তাঁর বাড়ি হুগলির চন্দননগর। জয়ধর সওদাগর ইহলোক ত্যাগ করবার সময় মদন এবং কামদেব তাঁর এই দুই পুত্রের কাছে কনিষ্ঠ পুত্র সুন্দরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। জয়ধর সুন্দরকে পুত্র হিসেবে পেয়েছিলেন সত্যপিরের আশীর্বাদে। তাই সকল বিপদে তাঁকে ডাকবার পরামর্শ দিয়েছেন। মদন এবং কামদেব তাদের প্রিয় ভাই সুন্দরকে স্ত্রীদের উপর দায়িত্ব দিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করেছেন। সুমতি ও কুমতি নামের দুই সওদাগরের পত্নী স্বামীর সামনে দায়িত্ব

নিলেও পরে তারা অস্বীকার করেছে। বরং সর্বদা তার অমঙ্গলের চেষ্টা, প্রাণনাশ পর্যন্ত করেছে। কিন্তু প্রত্যেকবারই সুন্দর সত্যপিরকে ডেকে বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছে। প্রথমে তারা সুন্দরের বুকে রক্তবান মেরেছে। সেই রক্তবানে তার মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে এবং সারা শরীর আগুন অনুভব করেছে। এমন অবস্থায় সুন্দরকে তারা জঙ্গলে ফেলে এসেছে। দয়ার সাগর সত্যপির তখন দয়াপরবশ হয়ে তাকে প্রাণদান করেছেন। প্রাণ পেয়ে সুন্দর বাড়ি ফিরে গিয়েছে। সুমতি ও কুমতি তাকে জীবন্ত দেখে আবার তার জীবননাশ করার পরিকল্পনা করেছে। রাতে সুন্দর শুয়ে থাকলে দুই বৌদি তাকে চেপে ধরে ছুরি দিয়ে ধর থেকে মাথা আলাদা করে দিয়েছে। এরপর কলশি মধ্যে মৃতদেহ ভরে বনের মধ্যে পুতে দিয়েছে। সত্যপির আবার তাকে রক্ষা করেছেন। সুন্দর গৃহে ফিরে এলে তার বৌদিরা তাকে জীবিত দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। আবার সুমতি কুমতি সুন্দরের শয়নকালে সাত খণ্ড করে বনে পুতে রেখে এসেছে। সত্যপির আবার তাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। এখানে সত্যপিরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবি নানা অলৌকিক কাহিনি বর্ণনা করেছেন।

এরপর কাহিনির বাঁকবদল হয়েছে। সুন্দরের জীবনে সর্বগুণে গুণবতী এবং রূপে বিদ্যাধরি, রাজকন্যা বিমলার আগমন ঘটেছে। সে ছিল কাউর শহরে গিরিধর নামক রাজার কন্যা। সেখানে অনেক রাজপুত্র থাকা সত্ত্বেও সে সত্যপিরের ইচ্ছায় সুন্দরকে মালা পরিয়ে দিয়ে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছে। এতজন রাজপুত্র সয়ম্বর সভায় থাকা সত্ত্বেও বিমলা একজন রাখালের গলায় মালা দিয়েছে বলে তাকে অনেক নিন্দা শুনতে হয়েছে। রাতের বেলায় বরবধূর একসঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হলেও সুন্দর বিমলার আঁচলে নিজের পরিচয় লিখে দিয়ে সত্যপিরের নির্দেশে বাড়ি ফিরে গিয়েছে। সেই চিঠি ভোরবেলা সুন্দরের স্ত্রী বিমলা এবং বিমলার মা পড়েছে। মা ও মেয়ের চিঠি পড়া দেখে বোঝা যায় তারা অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন।

মায়ে ঝিয়ে দুইজনে, পড়ে খত মনে২ দেখে দোহার হইল উল্লাস।।[১৩৪]

সুন্দরের পরিচয় পেয়ে মাতা-পিতার সহায়তায় চন্দননগরে চলে গিয়েছে। সেখানে সুন্দরকে দেখতে না পেয়ে সে হতাশ হয়ে কেঁদেছে। এমন সময় সত্যপির শ্বেতমাছির রূপ ধরে তাকে কাঁদতে নিষেধ করেছেন এবং শ্বশুর বাড়িতেই থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিকে সুমতি ও

কুমতি সুন্দরকে আবার জীবিত দেখে ওষুধের শিকড় এনে তার মাথায় বেঁধে দিয়েছে। ফলে সুন্দর সোয়াপাখি হয়ে উড়ে গিয়েছে।

মদন ও কামদেব বাণিজ্য থেকে ফিরে আসবার সময় তাদের আদরের ভাই সুন্দরের জন্য লোহার পিঞ্জর সহ একটি সোয়াপাখি কিনেছে। বিমলা স্বামীর শোকে কাঁদলে সত্যপির রাতে তাকে স্বপ্নে জানিয়েছেন সোয়াপাখিটির মাথার শিকড় খুলে দিতে। সকাল হলেই বিমলা সেটি খুলে দিতেই সুন্দর তার নিজের চেহারা ফিরে পেয়েছে। তারা সমস্ত ঘটনা তাদের দুই বড়োভাইকে জানিয়েছে। তাদের দুঃখের কারণ যে তাদের স্ত্রী সুমতি ও কুমতি এমন কথা জানতে পেরে দুই সওদাগর মাটিতে গর্ত করে তাদের ফেলে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। সুমতি কুমতিকে শাস্তি দিয়ে তারা সত্যপিরের জন্য শিরনি প্রস্তুত করেছে। সমস্ত কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করে এবং গ্রামের হিন্দু ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে শিরনি ভাগ করে দিয়েছেন। সত্যনারায়ণ শিরনি পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

মোছান্নেফ ওয়াজেদ আলি সাহেব রচিত *সত্য পীরের পুথি*-তে (মদন কামদেব পালা) সত্যপির সম্পর্কে ভক্তদের যে ধারণা তা প্রতিভাত হয়েছে। পির সন্তুষ্ট হলে ভক্তের লক্ষ্মী লাভ, আটকুড়ার পুত্র লাভ হয়।

আটকুড়ার পুত্র যদি হয় সত্য ভাবে।। নিধনের ধন হয় পীরের অভাবে*[১৩৫]

কয়েকটি সন্তান থাকার পরেও সত্যপিরের কাছে প্রার্থনা করে পুত্র লাভ হয়। জয়ধর সওদাগর সত্যপিরের কাছে প্রার্থনা করে সুন্দরকে লাভ করেছিলেন। বিপদে পড়ে তাকে ডাকলে রক্ষা পাওয়া যায়। জয়ধর সর্বদা বিপদের সময় সুন্দরকে সত্যপিরের স্মরণ নিতে বলেছিলেন।

সত্যপীর স্মরণ কর বিপদের কালে।[১৩৬]

কবি  চান কলিকালে সত্যপির সকলের সখা হোক।

ঘোর কলিকালে সখা হোক সত্যপীর*[১৩৭]

তাই কবি সত্যপিরের মুখ দিয়ে সুন্দরকে বলেছেন-

আমি তোমার আছিসখা,   কোন বাতে নাহি ধোকা,
মারিলে জেলাব বার বার।।[১৩৮]

বনবিবির কাহিনিতেও দেখা যায় দুখের মা ছেলেকে বিপদের সময় সর্বদা বনবিবিকে স্মরণ করতে বলেছেন। বনবিবিও বলেছেন আঠারো-ভাটিতে তিনি সকলের মা।

কবি মনে করেছেন সত্যপির হলেন অনাথের নাথ। তাই সুন্দর মারা গেলে আল্লার কাছে প্রার্থনা করে তাকে বাঁচিয়েছেন।

অনাথের নাথ পীর ভাবিয়া খোদায়।। বেহেস্তের পানি দিল সুন্দরের গায়*[১৩৯]

দুই বৌদি আবার মারতে গেলে সুন্দর দয়াময় সত্যপিরের স্মরণাপন্ন হয়েছে।

বিপদে কোথায় রইলে দয়ার সত্যপীর।[১৪০]

ভক্ত ডাকলে আসবেন না এমন পির তিনি নন। বিভিন্ন বেশে ভক্তের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। তাঁকে ফকির আবার কখনও শ্বেতমাছির বেশ ধরতে দেখা গিয়েছে। ভক্তদের বিশ্বাস পিরেরা মৃত মানুষকেও জীবন দান করেন। তাই কবি বলেছেন-

ধরিয়া ফকিরি বেশ আপনি সত্যপীর।। সুন্দর যেখানে ছিল হইল হাজির।[১৪১]

ভক্তরা পিরের প্রতি যে বিশ্বাস পোষণ করে তা কবির লেখনীতে ধরা দিয়েছে।

তুমি নাথ দয়াবান, জানিনু তোমার নাম, তুমি সত্য দয়ার সাগর।।
তুমি ধর্ম্ম তুমি কর্ম্ম, জানিনু তোমার মর্ম্ম, পীর বলে শুনহ সুন্দর*[১৪২]

কাহিনিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের দিকটি উঠে এসেছে। তাই কবি সুন্দরের মুখ দিয়ে সত্যপির এবং সত্যনারায়ণ দুই নামে ডাকিয়েছেন।

এইবার রক্ষা কর সত্য নারায়ণ[১৪৩]

মনে ভক্তি থাকলে পির সর্বদা ভক্তকে রক্ষা করেন, ধনসম্পত্তি দেন, আবার বন্ধুর মতো পাশে থাকেন। নিজে থেকেই ভক্তের কোনো অনিষ্ট হতে দেন না। কবি সত্যপিরকে 'অনাথের নাথ' (পৃ.- ২৮১), 'দয়ার সাগর' (পৃ.- ২৮১) বিশেষণে বিশেষিত করেছেন।

পিরের মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক কাহিনিগুলি অলৌকিকতায় পূর্ণ। এগুলি তৎকালীন সমাজে ভক্তদের অন্ধবিশ্বাসের দলিল হিসেবে রয়ে গিয়েছে। ভক্তগণ পিরকে ভয়, বিশ্বাস, ভক্তি করে।

তারা মনে করে তাকে মন দিয়ে ডাকলে সমস্ত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। আর পিরের কাছ থেকে নিজের প্রয়োজন মতো পেলে তাঁকেও সন্তুষ্ট করতে হয়। কাহিনির শেষে দেখা গিয়েছে পিরের নামে সওদাগর সিরণি দিয়েছে।

লাখ লোকের সিরণি করিল সওদাগর।।[১৪৪]

সওদাগর সমস্ত কুটুম্বদের আমন্ত্রণ করেছেন এবং সত্যপিরের নামে শিরনি বানিয়ে গ্রামের হিন্দু, ব্রাহ্মণ এবং দেশের যত কাঙাল গরিব আছে সকলকে বিতরণ করেছেন। এই ভাবে সত্যপিরের মাহাত্ম্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

**শ্রীকবিবল্লভ বিরচিত *সত্যনারায়ণের পুথি***

শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত *সত্যনারায়ণের পুথি* (পালা সমাপ্ত- বৈশাখ, সন ১১৬২) ও মুন্শী ওয়াজেদ আলি রচিত *সত্য পীরের পুথি*-র কাহিনি অভিন্ন। তবে ভাষার দিক থেকে ভিন্ন বলা যায়। শ্রী কবিবল্লভ হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়ায় বিভিন্ন ঠাকুর দেবতার প্রসঙ্গ এনেছেন। মুসলমান কবিদের লেখা কাহিনিগুলিতে আল্লার বন্দনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ এবং যত্রতত্র আল্লার মহিমা ব্যক্ত হয়েছে। কবি শুরুতে কোনো দেবদেবীর বন্দনা না করেই কাহিনি শুরু করেছেন। তিনি শিব, সত্যনারায়ণ এবং খোদাকে এক করে দেখেছেন।

পাটনে রহিল বন্দী দোন সদাগর।   সুমতি কুমতি নিত্য পুজেন সঙ্কর
এইরূপে প্রতিদিন পুজে মৃত্যুঞ্জয়।   সত্যপীর নারায়ণ জানিল হৃদয়।।
খোদায় কহেন যে একীদা কর তুমি। যার পূজা কর তুমি সেই সিব আমী।।[১৪৫]

সওদাগরের দুই পত্নী শিবের পুজো করলেও শেষপর্যন্ত স্বামীকে বাঁচানোর জন্য সত্যপিরের স্মরণাপন্ন হয়েছেন। সত্যপিরের থেকে আল্লা এবং শূলপাণিকে তিনি বড়ো করে দেখেছেন। তিনি বলেছেন-

কত মনিময় বর্ণ্ণ ফকিরের নিছনি। দুঃখ নিবারিতে প্রায় আল্যা শূলপানি।।
চল গিয়া দুই যায় প্রণাম করিব।   শিব হল্যে মনোমত বর মাগ্যা নিব।।[১৪৬]

সত্যপির তাঁদেরকে পুত্রবতী হবার বর প্রদান করে। বিনিময়ে তিনি বলেছেন-

সিতাবি করহ সত্যপীরের সিরিনী[১৪৭]

কিন্তু সুমতি ও কুমতি দুই জায় গন্ধবণিক হয়ে মুসলমান হতে পারবে না বলে দিয়েছে। আর ছেঁড়াকাঁথা পরা ফকিরকেও মানতে পারবে না।

কবি খোদার সঙ্গে সত্যনারায়ণকে গুলিয়ে ফেলেছেন এবং সত্যনারায়ণের সঙ্গে শিবকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তিনি সত্যপির সত্যনারায়ণ দুটি নামই ব্যবহার করেছেন।

খোদায় কহেন যে একীদা কর তুমি। জার পূজা কর তুমি সেই সিব আমী।।[১৪৮]

কবি সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যকীর্তন করতে গিয়ে বারবার হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গ এনেছেন। তিনি শিব, সত্যনারায়য়াণ এক করে দিলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁকে শিবের ভক্ত বলা যায়। বারবারই তিনি শিবের প্রসঙ্গ এনে সত্যনারায়ণকে একেবারেই গৌণ করে দিয়েছেন। মদন সুন্দর ও কুন্তলার বিয়ের প্রসঙ্গে শিব-গৌরীর প্রসঙ্গ এনেছেন।

গৌরী বিভা হেতু আসি শিব দিল দেখা। আই মা কি এটা বল্যা নিন্দা এ মেনকা।।[১৪৯]

*সত্যথিনারায়ণের পু*-টি পড়লে মনে হয় কবির বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনার প্রয়োগ ঘটেছে। সত্যনারায়ণ কিংবা সত্যপিরের প্রতি ভক্তির একাগ্রতার অভাব লক্ষ করা গিয়েছে। তাঁকে খানিকটা শিব ভক্ত বলে মনে হয়েছে।

### দ্বিজ রামধন প্রণীত *সত্য নারায়ণের পুথি*

দ্বিজ রামধন প্রণীত *সত্য নারায়ণের পুথি*-টির সংগ্রাহক ব্রতী গায়েন।[১৫০] এটি অসম্পূর্ণ ভাবে পাওয়া গিয়েছে। কবি এখানে সত্যপিরকে কলিযুগ অবতার বলেছেন। শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত *সত্যনারায়ণের পুথি* কিংবা মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি বিরচিত *সত্যপীরের পুথি*-র কাহিনি এবং গঠনকাঠামো থেকে ভিন্ন দ্বিজ রামধন প্রণীত *সত্য নারায়ণের পুথি*-টি। এখানে প্রথমেই গৌরীর নন্দন অর্থাৎ গণেশ, সূর্যদেব, ইন্দ্র, নবগ্রহ, কমলা, বিমলা, সরস্বতী, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব, কিন্নর এছাড়া স্বর্গ মর্ত্যে যতজন বসে আছে সবাইকে বন্দনা করার পর নারায়ণের বন্দনা করেছেন। সম্পূর্ণ কাহিনি জুড়ে সত্যনারায়ণের প্রসঙ্গ, তাঁর মাহাত্ম্য-কথা বর্ণনা করেছেন। অন্য দুই কবি যেমন কাহিনিকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন এবং সত্যনারায়ণকে ঘটনা প্রসঙ্গে এনেছেন। রামধন তা করেননি। সত্যনারায়ণকে মূল লক্ষ করে কাহিনিকে এনেছেন। সম্পূর্ণ পুথিতে শিরোনাম করে কাহিনি বিস্তার করেছেন, যেমন- ‘সর্ব-দেবদেবীর বন্দনা’, ‘সত্যনারায়ণ বন্দনা’,

'সত্যদেবের রামধনের প্রতি স্বপ্ন কথন ও গ্রন্থ রচিবার আদেশ', 'লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের কথোপকথন ও নারায়ণের মর্ত্তভূমে আগমন', 'ব্রাহ্মনীর খেদ', 'বিষ্ণু বিপ্রের সহিত নারায়ণের কথোপকথন', 'ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নারায়ণের স্তব ও ব্রাহ্মণের দুঃখ মোচন', নবাব কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের বন্দ', 'নারায়ণ কর্ত্তৃত নবাবের কুস্বপ্ন দর্শন, 'ব্রাহ্মণের বন্ধন মুক্ত ও নবাবের মুল্লুক দখল', 'আইওদিগের আগমন ও সদাগরের কন্যার বিবাহ', 'সওদাগরের বাণিজ্য-সজ্জা', 'সাধু কন্যার বিষাদ', 'সওদাগরের বাণিজ্যে যাত্রা ও কারাগারে বন্দী', 'সওদাগরের রোদন ও চৌদ্দ মধুকর ধন পুনঃপ্রাপ্তি', 'সাধুর দেশে গমন ও নারায়ণের ছলনা, সাধু জামাতার ডিঙ্গা সহিত জলে বিসর্জ্জন', 'জামাতার শোকে সাধু নারীর বিলাপ'। মঙ্গলকাব্যের কাঠামো এবং কাহিনির সঙ্গে সাদৃশ্য বোঝাবার জন্য শিরোনামগুলি তুলে ধরা হয়েছে।

কৃষ্ণহরি দাসের *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি* এবং দ্বিজ রামধন বিরচিত *সত্য নারায়ণের পুথি*-তে দেখা গিয়েছে সত্যনারায়ণের জন্মবৃত্তান্ত। এখানে তাঁর বন্দনা করা হয়েছে বারেবারে। কাহিনির প্রতিটি ছত্রে আমরা সত্যনারায়ণকে পেয়েছি। এখানে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্যই কিছুকিছু কাহিনি উপস্থাপন করা হয়েছে। মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি রচিত *সত্য পীরের পুথি* কিংবা শ্রী কবিবল্লভের *সত্য-নারায়ণের পুথি*-টি (পালা সমাপ্ত- সন ১১৬২) কাহিনি প্রধান সত্যনারায়ণ গৌণ। কবিগণ কাহিনির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। কাহিনির প্রয়োজনে সত্যনারায়ণের প্রসঙ্গ এসেছে। ভাষা প্রয়োগের দিক থেকে চারজন কবিকেই ভিন্ন মনে হয়েছে। কবি কৃষ্ণহরি দাস এবং দ্বিজরামধন সত্যনারায়ণকে দিয়েই গ্রন্থ রচনা করেছেন। মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি আল্লার বন্দনা দিয়ে কাহিনি শুরু করেছেন এবং তাঁকেই বড়ো করে দেখেছেন।

বেহদ্দ ছেফাত সেই খোদার কারণ।। জগত সংসার যেবা করিল সৃজন*
নানারূপে জীবজন্তু প্রকাশ করিয়া।। যার যে আহার তারে দেয় যোগাইয়া*[১৫১]

## ২.ঙ. লোকদেবতাকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনির পরিবেশনগত দিক:

পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলি পালাগান, নাটক, যাত্রা, কাওয়ালি ঢঙে জনসমাজে পরিবেশিত হয়। হিন্দু ইসলাম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ এগুলিতে অংশগ্রহণ করেন এবং

শোনেন। লৌকিক দেবদেবী নির্ভর পালাগানগুলি বেশি প্রচলিত। লোকসমাজে দেবীপালা, দেবপালা, বিবিপালা, পির বা গাজিপালা এই চার ভাগে প্রচলিত আছে।[১৫২]

বিবি পালাগুলি হল- বনবিবি (বনবিবি ও শাজঙ্গলির জন্ম, নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের সঙ্গে বনবিবি ও শাজঙ্গুলীর যুদ্ধ ও বন্ধুত্ব, দুখের কাহিনি) ওলাবিবি, আসানবিবি, সাতবিবি, নয়বিবি, আওরজবিবি, ফতেমাবিবি, ঝেটুনেবিবি, আজগই, দরবারবিবি প্রমুখ। সাতবিবির মধ্যে পড়েন- ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, দরবারবিবি, আসানবিবি, মড়িবিবি, ঝড়িবিবি, ও দুধবিবি। কেউবা সাতবিবির ভিন্ন নাম বলেন যেমন- ওলা, ঝোলা, কালা, টান, টংকার, বাত, বাতবলবিবি। নয়বিবি হলেন- ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, জহরবিবি, কুডুনেবিবি, দড়মড়িবিবি, আজগোবিবিবি, ওছোলবিবি, মড়িবিবি, আসানবিবি। পির ও গাজি পালাগুলি হল- মানিকপির, বড়োপির, সত্যপির, মাদারপির, পির গোরাচাঁদ, মোবারকগাজি, বড়োখাঁগাজি, দেওয়ানগাজি, রক্তানগাজি, হজরত জাবের প্রমুখ।

লোকদেবদেবীকে  কেন্দ্র করে যেসব পালাগান প্রচলিত তার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন। দর্শক বা শ্রোতাদের মনোরঞ্জনের বিষয়ে পালাগায়কেরা দায়বদ্ধ থাকেন। ফকিরি গানে মুসলমান ফকিরগণ দুয়ারে দুয়ারে হাতে চামর নিয়ে গান করে ফেরেন এবং চাল, পয়সা ও অন্যান্য সামগ্রী ভিক্ষা করেন। গোয়ালে গিয়ে মানিকপিরের গান করেন। আবার আঙিনায় দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীর গান করেন। গৃহী মানুষেরা ফকিরদের ঈশ্বর প্রেরিত দূত ভাবে। এখনও এইরকম ফকিরদের দেখতে পাওয়া যায় যারা গৃহস্থ বাড়ির দুয়ারে এসে পিরের নাম নিয়ে আশীর্বাদ করে টাকাপয়সা সংগ্রহ করেন।[১৫৩]

মুসলমান কাওয়ালগণ বিভিন্ন পিরপিরানির দরগায় বিশেষ অনুষ্ঠানে কেচ্ছা-কাহিনিগুলি কাওয়ালি ঢঙে গান করেন।[১৫৪] পির ভাঙড়সুলতান, বাবনগাজি, ফতেমাবিবি, হজরত জাবের, মানিকপির, বড়োপিরসাহেব, মাদারপির, পিরগোরাচাঁদ, দাতা মেহবুব শা, মোবারকগাজি, পিরএকদিলশা, বনবিবি প্রমুখের গান উল্লেখযোগ্য।

পয়ার ও ত্রিপদী উভয় ছন্দের গানকে পাঁচালি বা পঞ্চালিকা বলা হয়। পাঁচাল গানকে পালাগানের আদি অবস্থা বলা যায়। পাঁচাল গানের রীতিতে একজন মূল মহড়া গায়ক বা মূল গায়েন থাকেন। মহড়া গায়ক আসর বন্দনা, সর্ব দেবদেবীর বন্দনা, গুরুজনদের আশীর্বাদ

প্রার্থনা, বাদ্যযন্ত্রাদির সম্মান প্রদর্শন বা নমস্কার, নায়েক পার্টির বন্দনা করে মূল কাহিনিতে প্রবেশ করেন। আসর বন্দনার সময় মোমবাতি, ধূপ জ্বালিয়ে আসরের একধারে পির/ গাজি/ বিবি/দেব-দেবীর নাম করে ঘট বসিয়ে কিংবা মূর্তি স্থাপন করে আসর প্রদক্ষিণ করেন।[১৫৫] পালাগানের শেষে পালাগায়কেরা ঘট ভাসিয়ে দেন।

পালাগান পরিবেশনের সময় পালাগায়ক ও দোহারদের মধ্যে গান, প্রাসঙ্গিক কথোপকথন চলে। তাঁদের কথোপকথন অনেকটা নাটকীয় ভাবে পরিবেশিত হয়। মহড়া গায়ক অধিকাংশ সময় দাঁড়িয়ে গান করেন কারণ দর্শক মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে তাঁকে নাচতেও হয়। তাঁর দুই পায়ে ঘুঙুর বাঁধা থাকে। দোহারেরা বসে গান ও কথার মাধ্যমে মহড়া গায়ককে সাহায্য করেন। তাঁদের কেউ কেউ বাদ্যযন্ত্রও বাজান। মূল গায়েনের অসীম ধৈর্য। দোহারেরা বা বাদকেরা গানের ফাঁকে ফাঁকে সময় সুযোগ মতো জলযোগের জন্য বিশ্রাম নেন, কিন্তু মূল গায়ক এসব করার অবকাশ পান না। পুরো আসরের রাশ তাঁকেই ধরে থাকতে হয়। ক্ষেত্র গবেষণা কালে আটঘরা গ্রামনিবাসী দেবপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে সুধীনকুমার মণ্ডলের গানের দলে এমন দেখা গিয়েছে।[১৫৬]

দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাগায়ক দীপককুমার মণ্ডল পাঁচালি গানের নতুন এক পদ্ধতি চালু করেছেন। এই পদ্ধতিতে কোনোরকম দোহার লাগে না। মূল গায়ক বা মহড়া গায়ক মহড়া গানের এককলি গেয়ে যান। দোহারের পরিবর্তে বাঁশিবাদক বাঁশি (ফ্লুট) ও কনসার্ট (একধরনের বাঁশি) বাজিয়ে দোহারের কাজ করেন।[১৫৭]

অনেক সময় পাত্রপাত্রীর চরিত্র অনুযায়ী পালাগায়ক আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। ২০১৭ সালে আটঘরা বিবিমায়ের পুজো উপলক্ষে দেবপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে বিবিমায়ের মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক পালাগান শুনতে গিয়ে এই রকম আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেছি। নিম্নে পালাগানের আসরে পালাগান পরিবেশনরত গায়কের গান ও কথা থেকে সংগৃহীত কিছু আঞ্চলিক শব্দের নমুনা প্রদত্ত হল। যেমন- নাতি মারবো, ছাবাল, মাইয়া, মাতা খাব, হেগে, বিইয়েছে, নাইন, ঠ্যাং, মুদি সরকার, ঝাঁটার বাড়ি মারব, চুলো, সাঁইগুষ্ঠি, মাতার কাটে, ধরম বাবা ইত্যাদি। চরিত্র অনুযায়ী তাঁদের মুখে গ্রামীণ গালিগালাজও শোনা যায়। দেবীর মাহাত্ম্য গাইতে গিয়ে অনেক অপ্রাসঙ্গিক গালগল্প, পুরাণের নানা প্রসঙ্গ তাঁদের কথায়

চলে আসে। গানের ভাষা আঞ্চলিক হওয়ায় কখনও কখনও দুর্বোধ্য লাগে। আঞ্চলিক শব্দগুলি আধুনিক শহুরে মানুষের কাছে অপরিচিত বলে মনে হতে পারে। গানের মধ্যে দোহারদের মধ্যে কথোপকথনের সময় তাঁরা গল্প করার ঢঙে কথা বলে দর্শকদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেন। মহড়া গায়ক সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না প্রভৃতি প্রাক্ষভিক বিষয়গুলি বাস্তবসম্মত ভাবে পরিবেশন করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ *বর্তমান রঙ্গভূমি* প্রবন্ধে বলেছেন-

> থিয়েটার প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে, কবি হাফ-আক্ড়াই, পাঁচালি ও যাত্রার প্রাদুর্ভাব ছিল। হাফ্-আকড়াই কবি ও পাচালীতে গালিগালাজ চলিত এবং ঐ সকল গালিগালাজ লইয়া সমাজে সকলে বিশেষ আনন্দ করিত।[১৫৮]

পালাগানের আসরে কমিক চরিত্রেরা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। খানিকটা তাঁর উপর দলের জনপ্রিয়তা নির্ভর করে। মহড়া গায়ক গান গাইবার পাশাপাশি কথোপকথনের সময় কমিক চরিত্রের সঙ্গে কৌতুক করেন। কৌতুক করতে গিয়ে তাঁরা অনেক অপ্রয়োজনীয় বিষয় টেনে আনলেও শ্রোতারা এগুলি হৃষ্ট চিত্রে উপভোগ করেন। এই কারণে দলের নাম ডাকও হয়। এক একটি পালায় এক একরকম নাটকীয় ক্লাইমেক্স থাকে। পালাগানে একটানা গুরুগম্ভীর ভাব কাটানোর জন্য কমিকের প্রয়োজন হয়।

পালাগানে ভাঙটা পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। ভাঙটা পদ্ধতিটি হল কোনো লোকদেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারমূলক জনপ্রিয় পালার কাহিনির স্থানে দর্শক শ্রোতা বা নায়কপার্টির অনুরোধের লোকদেবদেবীর দোহাই দিয়ে গাওয়া গান। একটা পালা ভাঙিয়ে আরেকটি পালা গাওয়ার পদ্ধতিকে বলা হয় ভাঙটা। যেমন রক্তানগাজির পালা ভাঙটা পদ্ধতিতে গাওয়া হয়। অনেক পালাগায়ক এই পদ্ধতিকে অন্যায় বলে মনে করেন।[১৫৯]

পালাগানের আসরে গায়ক ও দর্শকের মধ্যে খুব কাছের সম্পর্ক রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় লক্ষ করা গিয়েছে পালাগান চলাকালীন মূল গায়ক শ্রোতাদের মাথায় চামর বুলিয়ে টাকা সংগ্রহ করেন। একে প্যালাতোলা, ভিক্ষা, মাঙন বলে। কেউ বেশি টাকা দিলে তিনি গানের মধ্যেই উল্লেখ করেন যে অমুক (তাঁর নাম ধরে) এত টাকা দিয়েছে মা তার মনস্কামনা পূর্ণ করবেন এবং কত টাকা দিয়েছেন তার উল্লেখ করেন। এটি নায়কপার্টির সঙ্গে পালাগায়কদের চুক্তি বহির্ভূত উপার্জন বলা যায়। আবার সাধারণ মানুষের দেবতার উদ্দেশ্যে দান খয়রাতের অভ্যাস

বজায়-রাখার কৌশল হিসেবে বিবেচিত হয়। শ্রোতা বা দর্শকেরা মহড়া গায়ককে প্রণাম করেন তাঁরা ভাবেন মহড়া গায়ক যে দেবদেবীর গান করেন তাঁরই প্রতিনিধি বা সেই দেবতা। তিনি নিজেও ভক্তের মাথায় হাত দিয়ে অনেক আশীর্বাদ করেন। কমিক চরিত্রদের মুখে ঠিক এইসময় কৌতুক করে বলতে শোনা যায় 'দে মা দে তোর রাজার ঘরে বে হবে', 'তোর ছেলের পিঠে ছেলে হবে' ইত্যাদি।[১৬০]

হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল প্রভৃতি যন্ত্র পালাগানের আসরে লক্ষ করা যায়। এছাড়া রয়েছে- নাল, তানপুরা, আড়বাঁশি, ঢোলক, দোতারা, ক্যাসিও, ঝাঁঝ, কাড়ানাকাড়া, ফ্লুট ও কর্ণিট, সাইড্রাম। বর্তমানে মাইক লাগিয়ে গান করা হয় আবার খালি গলায়ও গান করে থাকেন। বাদকদের মধ্যে এক-একজন একাধিক যন্ত্র বাজানোতে নিপুণ।

পাঁচাল গানে মহড়া গায়ক আসর বিশেষে সাজসজ্জা করেন। তাঁদের অনেকেই গান করার সময় মনসা/বিবিমা/গাজিবাবা ইত্যাদি পালা অনুযায়ী পোশাক পরে গান করেন। বিবিমা, শীতলা, বনবিবি পালায় মহিলা সাজেন। মানিকপির-বিবিমা-শীতলা-বনবিবি পালায় হাতে চামর, শিবের পালা হলে হাতে একটি ত্রিশূল থাকে। পাঁচাল গানের ধারায় লক্ষ করা যায় মহড়া গায়ক এবং দোহারেরা অতি সাধারণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করেন। বর্তমান কালে দোহারদের মধ্যে প্যান্ট শার্টও পরে থাকতে দেখা যায়। মহড়া গায়কের গলায় একটি উত্তরীয় থাকে পরে সেটি কোমরে বেঁধে নেন। নায়কপার্টির পক্ষ থেকে গলায় একটি গাঁদাফুল কিংবা রজনীগন্ধার মালা পরিয়ে তাঁকে সম্মান জানানো হয়। সেটি পালাগান শেষ না হওয়া পর্যন্ত মহড়া গায়কের গলাতেই পরা থাকে।[১৬১]

পালাগান সাধারণত কোনো মঞ্চে নয়, বাড়ির আঙ্গিনায়, খোলা মাঠে, ঠাকুর তলায় পরিবেশিত হয়। নিচু জায়গাতেই মাদুর, খলপা বা ত্রিপোল পেতে গায়ক, দোহার, বাদক গান পরিবেশন করেন। শ্রোতারা তাঁদেরকে ঘিরে বসেন। কেউবা দূরে কোনো উঁচু স্থানে পা ঝুলিয়ে বা খড়, নারকেল পাতা, খলপার উপর বসে গান শোনেন। গায়ক খোলা আকাশের নিচেই গান করেন। নায়কপার্টির আর্থিক সামর্থ্য থাকলে উপরে ত্রিপোল দিয়ে ছেয়ে দেন এবং চারপাশ খোলা থাকে।

পাঁচাল গানের ধারার আরেক নাম ‘একানি পালা’ বলা যেতে পারে।[১৬২] বর্তমানে পাঁচাল ধারায় তৈরি পালাগানের পরিবর্তে লোকনাট্যের আকারে পরিবেশিত পালাগানের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। তাই পালাকারগণ সমস্ত পালাগান গীতিনাট্যের রূপ দিয়ে গাইতে চান।

পাঁচাল গানের ন্যায় গীতিনাট্যেও দর্শকদের মধ্যে থেকে চরিত্র তুলে-নেওয়া হয়। এখানে প্রত্যেকটা চরিত্র আলাদা আলাদা ব্যক্তি হন এবং তাঁরা চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরেন। দোহার বা বাদক থাকেন। কোনো চরিত্রের প্রয়োজন পড়লে দোহারদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়। প্রত্যেকটি চরিত্রই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে এখানে এক বা একাধিক প্রধান চরিত্র থাকে যেমন মনসা পালায় মনসা, চাঁদ সদাগর, বেহুলা। গীতিনাট্যে ভক্তির ভাবটি বজায় থাকে। মনস্কামনা পূরণ করতে কিংবা মানসিক থাকলে নায়কপার্টি তাঁর গৃহপ্রাঙ্গণে লোকদেবদেবীর পুজোর সঙ্গে গীতিনাট্য বা পাঁচাল গানের আসর বসান।

অধুনা লোকদেবতাকেন্দ্রিক যাত্রা গানের প্রচলন হয়েছে। এক্ষেত্রে যাত্রা বা নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লোকদেবতার কাহিনিকে সাজানো হয়। যেমন- দুখের যাত্রা, মনসাযাত্রা, চণ্ডীযাত্রা, ভাসানযাত্রা, মোনাইযাত্রা। যাত্রার বিভিন্ন আঙ্গিকের মধ্যে সংলাপ, গীত, অভিনয় এবং অঙ্ক ও দৃশ্য  বিভাজন থাকে। এখানে একই ব্যক্তি একাধিক চরিত্রের অভিনয় করেন না। একটি ব্যক্তি একটি চরিত্রেরই অভিনয় করেন। যেমন বনবিবির পালায় বনবিবি, দুখে, দুখের মা, ধোনা, মোনা, সকলেই আলাদা আলাদা ব্যক্তি। নারীচরিত্রে নারীরাই অভিনয় করেন। তাঁরা প্রত্যেকেই সংলাপধর্মী অভিনয় করেন। ক্ষেত্রবিশেষে গান কিংবা কমিক আসে। অভিনয় হয়ে গেলে তিনি আর সেই স্থানে থাকেন না, মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যান।

বনবিবির পালায় দুখে এবং দুখের মা সাধারণ পোশাক পরেন। বনবিবি আঠারো-ভাটির অধিকারিণী, তিনি সকলের মা, তাঁর পোশাক দেবীর মতো। মাঝির চরিত্রে লুঙ্গি ও আলখাল্লা পরে কোমরে গামছা বাঁধেন। এইরূপ চরিত্র অনুযায়ী পোশাক পরার চলন অদ্যাপি প্রত্যক্ষ করা যায়।

পালাগানের পরিবেশনের ভক্তির প্রাধান্যই বেশি থাকে দেবদেবীর পুজো উপলক্ষে পালাগান পরিবেশন করা হয়। সেখানে সেই দেবতার মাহাত্ম্য কীর্তনই প্রধান লক্ষ্য। তবে মাহাত্ম্য কীর্তন কালে দেবতাদের মানবিক দিকটাই উঠে আসে।

পালাগায়কদের অনেকেই যাত্রা, কীর্তন, গোষ্ঠ, দেহতত্ত্বের গান করেন। তাঁদের অধিকাংশই নিম্নবর্ণের হিন্দু অথবা ইসলাম সম্প্রদায়ের মানুষ। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে আছেন কাওরা, বাগদি, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় প্রমুখ। অখণ্ড চব্বিশ পরগনায় বহু পালাগায়ক আছেন। এঁদের সংখ্যা যেমন নিতান্ত কম নয় তেমনি এঁদের শিষ্য সংখ্যাও কম নয়। তাঁরা যেমন শীতলা, মনসা, লক্ষ্মী, পঞ্চানন, সন্তোষী মায়ের পালাগান করেন তেমনি মানিকপির, বনবিবি, বিবিমা, গাজি সাহেব, বড়োপির সাহেবের পালা পরিবেশন করেন। এক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ নেই।

পালাগানে মহড়াগায়ক সাধারণত একজন। মূল গায়ক অনেক ক্ষেত্রে সাধারণ পোশাকে গান করেন। মূল গায়ক ক্ষেত্র বিশেষে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর প্রতীক সজ্জা করেন। দীর্ঘ কাহিনি গীত হয়, তার শুরু ও শেষ থাকে। পালাগান পুজো উপলক্ষ্যে সাধারণত একটি দল গান করেন। বছরে যে-কোনো মাসে সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পুজো উপলক্ষ্যে পালাগান গীত হয়। একাধিক চরিত্র সাজসজ্জা করে আসরে কাহিনি পরিবেশন করেন এবং বাদকগণ দোহার ও যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁদের সাহায্য করেন। পালাগানের আসর সাধারণত গৃহপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা থাকলেও মহিলা সংখ্যাধিক্য লক্ষ করা যায়।

**ক্ষেত্র সমীক্ষায় একটি পালাগানের আসরের পরিচয়:**

একটি পালাগানের আসরে একদিনে যে-কোনো একটি পালা ৩-৪ ঘণ্টার কিংবা অনেকগুলি পালা সংক্ষেপে ৪-৫ ঘণ্টার হতে পারে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আটঘরা গ্রামে দেবপ্রসাদ ঘোষের গৃহপ্রাঙ্গণে চৈত্র মাসে তেরো দিনে বিবিমায়ের পুজো হয়। সাত দিনে আটটি পালা গাওয়া হয়। যেমন- দরবার বিবি, বনবিবি, বিবিমা, শীতলা, মানিকপির (কিনু ঘোষের পালা), গাজি সাহেবের পালা, স্বরূপ চাঁদের পালা। প্রথম দিন গান হাজত দুটোই হয়। এরপর একদিন গান একদিন হাজত হয়। শেষের দিন অর্থাৎ ত্রয়োদশ দিনে সারারাত্রি গান হয়। গানের পর হাজত হয়ে শেষ হয়। একজন পালাগায়কই গান করেন। এক-একদিন এক-একজন দেবদেবীকে নিয়ে পালাগান হয়। সেই দিন যদি কোনো ভক্তের মানত থাকে তবে তিনি এসে মানত চোকান। তবে কেউ কোনো বিশেষ দেবদেবীর মানত করলে সেইদিন যদি তিনি আসতে

না পারেন অন্যদিন এসে মানত চোকাতে পারেন। সেক্ষেত্রে পালাগায়ক সেইদিন সেই বিশেষ দেবদেবীকে নিয়েও গান করেন।

সাক্ষাৎকার সূত্রে জানা গিয়েছে পালাগায়কদের 'ভর' হয়। সাধারণত যে দেবদেবীর থানে তাঁরা গাইতে আসেন সেই দেব বা দেবীর 'ভর' হয়।[১৬৩] দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পালাগায়ক সুধীনকুমার মণ্ডল (বয়স- ৭৯) কুড়ি-পঁচিশ বছর দেবপ্রসাদ ঘোষের গৃহপ্রাঙ্গণে দরবারবিবির থানে গান করেছেন। একবার উনি গৃহে চামরটি ফেলে গাইতে এসেছিলেন। ফলে ওনার ভর হয়েছিল বলে জানিয়েছেন। উনি বেল গাছ উপড়িয়ে ফেলেন। তারপর পড়ে গিয়ে ওনার মাথা ফেটে রক্ত বেরিয়ে যায়। সবাই মিলে ঠাকুরের কাছে অন্যায় স্বীকার করে ওনাকে ঠান্ডা করেন। আধ ঘণ্টা সময় কাল ভর স্থায়ী হয়েছিল। সকলে মনে করেন দরবারবিবির প্রভাবে ঘটনাটি ঘটেছে।

**সত্যনারায়ণ পুজো:**

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *বাংলার ব্রত* প্রবন্ধে বলেছেন-

> মুসলমানের পিরকে লোকে যেমনি পুজো দিতে আরম্ভ [করল] অমনি তাঁকে সত্য-নারায়ণ ব'লে প্রচার ক'রে ব্রতটির উপর হিন্দুধর্ম দখল বসালেন। কিন্তু বাংলায় সত্যনারায়ণের যে পাঁচালি তাতে পিরকে মুসলমানি পোশাকেই দেওয়া হয়েছে। কথা পর্যন্ত উর্দু, যেমন- জয় জয় সত্যপির সনাতন দস্তগির ইত্যাদি। এই মুসলমান পিরের উপাসনা ও শিরনি ভট্টাচার্যদেরও ঘরে চলে এসেছে ও চলছে, কিন্তু এরই মধ্যে বাংলায় আজকাল ভাটপাড়ার পণ্ডিতেরা এই ব্রতে মুসলমানি অংশটাকে একেবারে চেপে দেবার চেষ্টায় রয়েছেন।[১৬৪]

হিন্দু বাড়িতে সত্যনারায়ণ পুজো চলাকালীন অন্য বাড়ির এয়োস্ত্রীরা যখন পুজোয় আসে তখন একটি বাটিতে করে চাল, আলু, পয়সা আনে। কেউ ফল দেয় চালের সঙ্গে। পুজো শেষে এয়োস্ত্রীদের আনা দ্রব্য ব্রাহ্মণ নিয়ে যায় কিংবা পুজোর শেষে ব্রাহ্মণের বাড়ি দিয়ে আসতে হয়। এয়োস্ত্রীরা সত্যনারায়ণের ব্রতকথা শুনতে আসে। এই পুজোয় প্রধাণত মেয়েরা থাকে। ব্রক্ষণ একটি সত্যনারায়ণের বই দেখে ব্রতকথা জোরে জোরে পড়েন আর এয়োস্ত্রীদের তাঁর সঙ্গে বলতে থাকেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পুজোর নিয়মকানুন সত্যনারায়ণের মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে লিপিবদ্ধ থাকে না।

কমলাকান্ত মল্লিকের গৃহে তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা মল্লিকের কাছ থেকে তাঁদের গৃহদেবতা সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে আমি বিস্তৃত জেনেছি। তাঁদের গৃহের কাছেই একটি দামোদর ও লক্ষ্মীর মন্দির রয়েছে। এই দামোদরই হলেন সত্যনারায়ণ। গৃহের মঙ্গলকামনায় এই দেবতার পুজো করা হয়। হিন্দুদের গৃহে ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা তাঁকে পুজো করতে দেখা যায়। মন্ত্র এবং আরতির পর তাঁর মাহাত্ম্য-কাহিনিমূলক পাঁচালি পড়া হয়। সেখানে তাঁরা প্রচার করেন সত্যনারায়ণ ও সত্যপির অভিন্ন। গৃহে সত্যনারায়ণ পুজোর পাশাপাশি গ্রামবাংলায় খোলা স্থানেও পুজো হয়।

বর্তমানে গীতিনাট্য, যাত্রা, পালাগানের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে। কারণ হিসেবে বলা যায় সামাজিক ভাবে পালাগায়কদের মর্যাদা থাকলেও অর্থনৈতিক ভাবে তাঁরা অনেক পিছিয়ে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে গান, বাদ্য-যন্ত্র বাজানো শিখলেও উত্তরসূরি আর সেবিষয়ে তেমন আগ্রহী নন। অভিভাবক হিসেবে তাঁদের সন্তান লোকদেবতাকেন্দ্রিক শিল্পী হয়ে  অভাব অনটনে না ভুগুক। তাঁরা চান ভালো পড়াশোনা করে চাকুরি করুক। তাই জনপ্রিয় লোকসংগীত হারিয়ে যাচ্ছে কেবলমাত্র নতুন শিল্পীর অভাবে। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় লোকশিল্পীদের সন্তানেরা এখন অনেকেই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত, কেউবা চাকুরিজীবী। অথচ আগে যেসব লোকশিল্পী ছিলেন তাঁরা প্রায় সকলে স্বল্প শিক্ষিত, কেউবা নিরক্ষর। আর্থিক অনটন এঁদের নিত্যসঙ্গী। যন্ত্রপাতি খারাপ হয়ে গেলে দুর্ভোগের শেষ থাকেনা।

পালাগানের জনপ্রিয়তা হারানোর আরেকটি কারণ হিসেবে মনে করা যেতে পারে ১৯৪৬ এর দেশভাগ। ধর্মের ভিত্তিতে দুই আলাদা রাষ্ট্রের গঠনের ফলে এই সমস্ত পুথি লেখা এবং পালাগান পরিবেশনে ছেদ পড়ে বলে মনে করা যায়।

পালাগায়কেরা গুরুশিষ্যপরম্পরায় গান করেন। একজন গুরুর দুশোর উপরেও শিষ্য থাকে। যেসব পালাগায়ক আগে সত্তর-আশিটা আসর পেতেন পরে তাঁদের আসরের সংখ্যা কমে চল্লিশ-পঞ্চাশটা হয়ে যায়। বর্তমানে সংখ্যাটি আরও কম। পালাগানের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার অনেকগুলি কারণ রয়েছে। ভয় থেকে আসে ভক্তি, শ্বাপদ শঙ্কুল বাংলাদেশে সাপের উপদ্রপ ছিল ব্যাপক, তাই দেবী মনসার ভক্তও ছিল প্রচুর। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ভালো রাস্তাঘাট তৈরি করায় সাপের উপদ্রপ অনেক কমেছে। স্বাভাবিক ভাবে ভক্ত সংখ্যাও কমেছে।

আবার জঙ্গলে বাঘের উপদ্রপ থেকে বাঁচতে মা বনবিবিকে পুজো করা হত। বর্তমানে মানুষ জীবিকার সন্ধানে শহরমুখী হচ্ছেন। ঘরের মেয়েরা যারাই এতদিন লোকদেবদেবীকেন্দ্রিক সংস্কারগুলি বেশি করে মানে তাদের অনেকেই শহরে আসে পরের বাড়িতে ঝিগিরি, রান্না, ব্যাগ তৈরির কাজ করতে। ফলে মানুষের রাতের পর রাত জেগে পালাগান শোনার সময় নেই। আরেকটি বিষয় আগে বিনোদনের বিষয় ছিল- গোষ্ঠ, গাজন, পালাগান, যাত্রা, কীর্তন। বর্তমানে বেশিরভাগ বাড়িতে দূরদর্শন পৌঁছে গিয়েছে বা মোবাইল ফোন মানুষের হাতে চলে এসেছে। যার ফলে মানুষ তাদের সময় সুযোগ মতো সিরিয়াল দেখেই সময় কাটিয়ে দেয়।

পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কাহিনি পরিবর্তনের সুযোগ পায়, কিন্তু গ্রন্থগুলিতে তা অপরিবর্তনীয় থাকে। যার ফলে তৎকালীন সমাজের কথা কৌতূহলী পাঠক জানতে পারে। গ্রন্থের কয়েকটি নির্দিষ্ট অংশ নিয়ে শিল্পীরা পরিবেশন করে। গ্রন্থের কাহিনির সম্পূর্ণ পরিধি দেখানো সম্ভব হয় না। তবে শিল্পীদেরও কিছু স্বাধীনতা থাকে। আসরে গান পরিবেশন করেন জনরুচির কথা মাথায় রেখে। তাই তাঁরা সমকালের কোনো বিষয় নিয়ে মজার কমিক করেন। সেখানে সমাজ, রাজনীতি, প্রেমের কথাও উঠে আসে। একশো বছরের বেশি পুরোনো লিখিত গ্রন্থগুলি থেকে সেই সময়কার ইতিহাস আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে। ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস *পীর-সাহিত্যের ঐতিহাসিক পটভূমি* অংশে জানিয়েছেন-

> ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বাঙালী নর-নারীর সমাজ-চিত্র পির-সাহিত্যের মাধ্যমে প্রথম লিখিত আকারে বাংলা ভাষায় প্রকাশ পেতে থাকে। পির পাঁচালি কাব্যসমূহ তৎকালীন বাঙালী মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির একমাত্র পরিচায়ক ছিল।[১৬৪]

আধুনিক যুগে উপন্যাস, গল্প, জীবনীসাহিত্য লেখার পর থেকে পির-পাঁচালি কাব্যের প্রকাশ কমতে থাকে। মাহাত্ম্য গ্রন্থগুলি আজ বিলুপ্তপ্রায় হতে চলেছে তাই এগুলির সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। অপরদিকে পালাগান পরিবেশনের অডিও বা ভিডিও সেভাবে করা হয়নি, বা বর্তমানের গবেষকরা অডিও বা ভিডিও করলেও সকল মানুষের কাছে তা এখনও পৌঁছতে পারেনি। তাই পালাগানের কাহিনি ও ইতিহাস জানতে আমাদের লিখিত গ্রন্থের উপরই নির্ভর করতে হয়।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১। মোহাম্মদ যাকারিয়া, আবুল কালাম (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান*, ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১০৯

২। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৫

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৪। ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শ্যামাপ্রসাদ (সম্পা.), *শ্রীমদ্ভাগবত গীতা,* (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), নির্ম্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা, ২৭, ১৮ নং শ্লোক।

৫। মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৬৭

৬। দাস ঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবন, *শ্রীচৈতন্যভাগবত,* শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), দেব সাহিত্য কুটীর, পৃ. ৩৪৬

৭। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১০

৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১০। আব্দুর রহিম সাহেব *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে সোনারপুরি নামকরণের একটি কিংবদন্তির কথা বলেছেন। গাজি ও কালু পরিশ্রান্ত হয়ে সোনাপুরের জঙ্গলে প্রবেশ করে। গাজি বন কেটে সুন্দর প্রাসাদ এবং মসজিদ বানান। গাজির এমন ক্ষমতা দেখে কালু নিজের অক্ষমতায় দুঃখিত হয়ে পড়েন। তিনি ভাবেন তাঁর কথায় সোনা ঝরে পড়লে সকলে তাঁর ক্ষমতার প্রশংসা করবে এবং গাজির মতো তিনিও সবার সম্মান পাবে। কালুর এমন কথা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক থেকে সোনা ঝরে পড়ে। নগরের মানুষ সেই সোনা কুড়িয়ে নেয়

এবং এই স্থানের নামকরণ করেন সোনারপুরি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সোনারপুর নামের একটি জায়গা এবং রেলস্টেশন রয়েছে।

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৬৩

১৪। দত্ত, শ্রী কালিদাস, 'বড়খা গাজির গান', *ভারতীয় লোক-যান,* শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.), ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ২৪

১৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯

১৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১৯। মোহাম্মদ যাকারিয়া, আবুল কালাম (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১০৬

২০। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* জুন ১৯৮৭, দেজ, কলকাতা, পৃ. ৬৪

২১। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ৩০

২২। দত্ত, শ্রী কালিদাস, 'বড়খা গাজির গান', *ভারতীয় লোক-যান,* শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.), ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, পৃ. ২৪

২৩। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

২৬। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ২৯

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১

৩১। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৬৬

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৩৪। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র,* ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৮৩

৩৫। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী,* দে ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩২৯ সাল, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ৩৪২

৩৬। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৮২

৩৭। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* জুন ১৯৮৭, দেজ, কলকাতা, পৃ. ৬৭

৩৮। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৬

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৪০। চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ, *ঘুটিয়ার শরীফের পীর মোবারক গাজী,* ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, রোহিনী নন্দন, কলকাতা, পৃ. ৯১

৪১। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* জুন ১৯৮৭, দেজ, কলকাতা, পৃ. ৩৯

৪২। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪

৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪

৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৪৭। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২২৪

৪৮। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৩

৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০

৫০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮

৫১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৫৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি. কলকাতা, পৃ. ৪৮

৫৫। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৭৮

৫৬। মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৬৭

৫৭। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১১

৫৮। চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ, *ঘুটিয়ার শরীফের পীর মোবারক গাজী,* ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, রোহিনী নন্দন, কলকাতা, পৃ. ৮৩

৫৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৫

৬০। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২

৬১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১১

৬২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৬৩। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৯

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৬৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

৬৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

৬৭। মহাভারতে কুরুক্ষেত্রে আঠারো দিন যুদ্ধ হয়েছিল পাণ্ডব ও কৌরবদের মধ্যে।

৬৮। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৬১

৬৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৭০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৭১। ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ক-৬২ থেকে ক-৬৭

৭২। দাস, কৃষ্ণরাম, 'রায়মঙ্গল', *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* শ্রী সত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য (সম্পা.), ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ২৪০

৭৩। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৬৭

৭৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৭৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৭৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬২

৭৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০

৭৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১

৭৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩

৮০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫

৮১। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩

৮২। ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (তৃতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ১১৩

৮৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

বিনয় ঘোষ বলেছেন-

বেড়াচাঁপা স্টেশন থেকে (বারাসাত-বসিরহাট রেলপথে) মাইলখানেক দক্ষিণ-পুবে গেলে চন্দ্রকেতুগড়ের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

৮৪। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ*, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১

৮৫। বিনয় ঘোষ গোরাচাঁদ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তির কথা উল্লেখ করেছেন-

> পীর গোরাচাঁদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম কেন্দ্র ছিল হাতিয়াগড় পরগণা। এই রাজ্যের রাজা ছিলেন মহিদানন্দ। ইনি রাক্ষসদের অধিপতি বলে কথিত। এঁর দুই পুত্র আকানন্দ ও বাকানন্দ (অকানন্দ-বকানন্দ) গোরাচাঁদের ধর্মান্তরের অভিযান প্রতিরোধ করেন।

দ্রষ্টব্য: ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (তৃতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ.১১৫

হাতিয়াগড় প্রসঙ্গে তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়- ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব মীরজাফর কলকাতার দক্ষিণে কুলপি পর্যন্ত অঞ্চলে ২৪ টি জংলীমহল বা পরগনার জমিদারি সত্ত্ব ভোগ করার অধিকার দেন ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানিকে। এই চব্বিশটি পরগনার মধ্যে একটি হল হাতিয়াগড়। খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর পুথিতে হাতিয়াগড় পরগনার নিয়েও একটি কিংবদন্তি রয়েছে। হাতিয়াগড় নামকরণের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে- ভগীরথ গঙ্গাকে মর্ত্যে আনার সময় গঙ্গা পর্বতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। সেখান থেকে আর বের হতে পারে না। তার এই বিপদ থেকে রক্ষার জন্য ভগীরথ ইন্দ্রের তপস্যা করে ঐরাবত পান। ঐরাবত ভগীরথকে জানায় গঙ্গাকে তার সঙ্গে থাকতে হবে তবেই সে পর্বত থেকে তাকে উদ্ধার করবে। ঐরাবতের এই প্রস্তাব কাতর হৃদয় নিয়ে ভগীরথ গঙ্গাকে জানায়। শুনে গঙ্গা ছত্রিশ ভাগে ভাগ হয়ে যায়। আকাশ পাতাল তখন জলে জলাকার হয়ে যায়। ঐরাবত সেই জল গিলে ফেলে হাবুডুবু খায়। তার অহংকার ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

৮৬। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ*, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৮

৮৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৮৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

৯০। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭

৯১। ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (তৃতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ১৬৪

৯২। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২১

৯৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৯৪। মুখোপাধ্যায়, সুখময়, চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা, জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ ৯০

৯৫। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৩

৯৬। ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত শ্যামাপ্রসাদ (সম্পা.), *শ্রীমদ্ভাগবত গীতা,* নির্ম্মল বুক এজেন্সী, পৃ. ৫৭

৯৭। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ১৭

৯৮। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২১

৯৯। মাগুন চাওয়ার অর্থ হল পাড়া ঘুরে লোকদেবদেবীর পুজোর উপকরণ যেমন- চাল, ডাল, আলু, ফলমূল টাকাপয়সা সংগ্রহ করা। এখানে দেবদেবীর উপর ভক্তির দিকটি নজরে আসে।

১০০। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৭

তিনি জানিয়েছেন ভুরকুণ্ডটি অবস্থিত বর্দ্ধমান-হুগলী সীমান্তে তিরোল গ্রামের কাছাকাছি মুড়াই নদীর ধারে। বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবড়া থেকে পশ্চিমে ৪-৫ কিমি দূরে ভুরকুণ্ডা নামে একটি গ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়।

১০১। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২২

১০২। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৩৪৯-৩৭২

১০৩। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* জুন ১৯৮৭, দেজ, কলকাতা, পৃ. ২৭

১০৪। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১০

১০৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩

১০৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২

১০৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

১০৮। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ১৯

১০৯। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪

১১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

১১১। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ১১৮

১১২। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২০

১১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

১১৪। মুরিদ শব্দের অর্থ হল- ভক্ত, শিষ্য বা মুসলমান তপস্বী।

১১৫। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩

১১৬। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৩৯৮

১১৭। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চম্পাবতী উপাখ্যান,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৬

১১৮। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* জুন ১৯৮৭, দেজ, কলকাতা, পৃ. ২৩১

১১৯। নাগ, রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন (সম্পা.), *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দ্রষ্টব্য: সম্পাদকীয় অংশ।

১২০। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ ৩৮-৩৯

১২১। নাগ, রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন (সম্পা.), *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, দ্রষ্টব্য: সূচিপত্র অংশ।

১২২। দ্রষ্টব্য: সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭২, এবং

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* জুন ১৯৮৭, দে’জ, কলকাতা, পৃ. ২৩৩

১২৩। দাস, কৃষ্ণহরি, ‘সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি’, *দীপন* (সত্যপীর), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

১২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২০

১২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩

১২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৩

১২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৬

১২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

১২৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩০

১৩০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩২

১৩১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৩

১৩২। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ.৪০০

১৩৩। নাগ, রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন (সম্পা.), *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ২৯৫

১৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮৭

১৩৫। মোছান্নেফ ওয়াজেদ আলি, 'সত্য পীরের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

১৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

১৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

১৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

১৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

১৪০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

১৪১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

১৪২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৯

১৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮০

১৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৫

১৪৫। শ্রী কবিবল্লভ, 'সত্যনারায়ণের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

১৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

১৪৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

১৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

১৪৯। পূর্বোক্ত, পৃ.  ৩১১

১৫০। দ্বিজ রামধন, 'সত্য নারায়ণের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৫

১৫১। মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি, 'সত্য পীরের পুথি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

১৫২। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২১

১৫৩। দ্রষ্টব্য: চিত্রসূচি অংশ, চিত্র নং. ৪ ও ৫

১৫৪। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫৩৭

১৫৫। ক্ষেত্র গবেষণায় পাওয়া তথ্য।

১৫৬। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার আটঘরা গ্রামনিবাসী দেবপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে সুধীনকুমার মণ্ডলের গানের দলের  চিত্র দেওয়া হল। চিত্র নং- ১ ও ২

১৫৭। নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা*, ১৯৯৯, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৫৪৫

পালাকারগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখান থেকে পাই।

১৫৮। ঘোষ, গিরিশচন্দ্র, 'বর্তমান রঙ্গভূমি', *দুই শতাব্দীর বাঙালির নাট্যচিন্তা*, শেখর সমাদ্দার (সম্পা.), ২০২০, এবং মুশায়েরা, কলকাতা, পৃ. ৫৪৫, পৃ. ১৩

১৫৯। পালাগায়ক সুধীনকুমার মণ্ডলের সঙ্গে সাক্ষাৎকার সূত্রে জানা যায়।

১৬০। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত আটঘরা গ্রামে দেবপ্রসাদ ঘোষের বাড়িতে কমিক চরিত্র সুবর্ণ কয়ালের মুখ থেকে এইগুলি শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। সুবর্ণ কয়ালের বাড়ি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত বেগমপুর গ্রামে।

১৬১। পালাগায়ক সুধীনকুমার মণ্ডল দাঁড়িয়ে গান করছেন। চিত্র নং- ২

১৬২। হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা* (প্রথম খণ্ড), ২০০১, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা,

১৬৩। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৪

১৬৪। সুধীনকুমার মণ্ডল ‘ভর’ হওয়ার কথা বলেছেন। দেবদেবীর আসরে যে দেবদেবীর পুজো চলে তাঁরাই এসে উপস্থিত হন কোনো মানুষের রূপ ধরে। তখন তাঁর কাছে ভক্তরা এসে তাদের জীবনের সমস্যার কথা জানান এবং সমস্যার সমাধান পান।

**সাক্ষাৎকার**

দেবপ্রসাদ ঘোষ (নায়েক পার্টি), আটঘরা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স-৬০, ২০১৭

সুধীনকুমার মণ্ডল, পালাগায়ক, বেগমপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স- ৮০, ২০১৭

অন্নপূর্ণা মল্লিক, গৃহকর্ত্রী, নন্দনপুর (পূর্ব বর্ধমান), বয়স-৮৭, ২০২০

ফাল্গুনীকুমার নস্কর, বেগমপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স-৭২, ২০২০

# তৃতীয় অধ্যায়

## মধ্যযুগের লিখিত গ্রন্থ, মান্যসাহিত্য ও বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিমূলক গ্রন্থের একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে যখন জীবনীকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য প্রভৃতি সাহিত্য ভিড় জমাচ্ছে তখন অখণ্ড বাংলায় অর্থনীতি, শিক্ষা থেকে পিছিয়ে পড়া একদল শিল্পী তাঁদের মতো করে পালাগান বেঁধে গান গেয়ে বেড়িয়েছেন। কিছু কবি এই পালাগানগুলি নিয়ে তাঁদের কবিত্ব শক্তি দিয়ে কাহিনির একটি পূর্ণাঙ্গরূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যদিও ডক্টর অয়াকিল আহমেদ জানিয়েছেন-

> বাংলাদেশে পীর ও তাঁর কেরামতি সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা শুরু হয় মুসলিম বিজয়ের সময় থেকে।[১]

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক পুথি, পাঁচালি নাম দিয়ে বিবিধ কাহিনি মুদ্রিত হয়েছে যেগুলিকে কেচ্ছা-কাহিনি, জহুরানামাও বলা হয়। এইরকম কয়েকটি কাহিনি নিয়ে কাজ করেছি এই অধ্যায়ে। সেগুলি হল-

মরহুম মুনশী মোহম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (রচনাকাল- ১২৮৭ সাল অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩)[২]
আব্দুর রহীম সাহেবের *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১৩০৫ সাল অর্থাৎ ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩)[৩]

আবদুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ, প্রকাশ সাল- ১৩৯৩)[৪]

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ* (প্রকাশকাল অজ্ঞাত),

কিংবা সত্যপিরের বেশকিছু মুদ্রিত কাহিনির রচনাকাল জানা নাগেলেও সেগুলি অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে রচনা বলা যায়। সুকুমার সেনের একটি বক্তব্যের উপর নির্ভর করে। তিনি বলেছেন-

হিন্দু দেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনীকে মুসলমান পির-পিরানীর মাহাত্ম্য-কাহিনীতে ঢালাই করবার প্রচেষ্টা প্রকট হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে।[৫]

যেসব সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনি এবিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলি হল-

মুন্‌শী ওয়াজেদ আলির লেখা *সত্য পীরের পুথি,*
শ্রী কবিবল্লভের লেখা *সত্য-নারায়ণের পুথি* (১৭১৬ খ্রি.)[৬]
কৃষ্ণহরি দাস রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি* (মধ্যযুগের পাঁচালিকার)[৭]
দ্বিজ রামধন রচিত *সত্য নারায়ণের পুথি,* (পালা সমাপ্ত- সন ১১৬২ সাল ১৮ই বৈশাখ), ব্রতী গায়েন জানিয়েছেন এই গ্রন্থের ভাষা আধুনিক কালের।[৮]

এই মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে মধ্যযুগের সাহিত্যের বেশ কিছু সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য রয়েছে। নিম্নে তা আলোচিত হয়েছে।

## ৩.ক. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, আরাকান রাজসভার সাহিত্য ও পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনি:

প্রত্যেক সাহিত্যই তার সমসাময়িক ইতিহাসকে ধরে রাখে। সেই বিচারে প্রত্যেক সাহিত্যেরই একটি ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের শুরুতেই এই সমস্ত জহুরানামা বা কেচ্ছা-কাহিনির জন্ম হলেও গঠন বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে এগুলিকে মধ্যযুগের সাহিত্য বলা যায়।

মধ্যযুগের সাহিত্যে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা, কিংবা যে রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় কাব্য লেখা হত সেই রাজার প্রশস্তি। এই সময়ে ভিন্ন ঘরানার সাহিত্যের মধ্যে একটি হল আরাকান রাজসভার প্রণয়কাব্য। দৌলত কাজির (কবির জন্ম ও তিরোধানের সঠিক সময় জানা যায় না) *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না* (রচনাকাল আনুমানিক ১৬৩৫-১৬৩৮ সাল)[৯] কাব্যে আল্লার বন্দনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ হয়েছে।

বিসমিল্লার নাম যান সংসারের সার।
... ... ...
বিসমিল্লা প্রধান এক নাম নিরঞ্জন।

যে নাম স্মরণে কার্যসিদ্ধি সর্বস্থান।।

... ... ...

সর্বসিদ্ধি জয় জয় সে নাম প্রসাদ।।

রহমান নাম অর্থ করুণা সদায়।

যে নাম স্মরণে দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডায়।।

সুজন দুর্জন আদি যত জীব যান।

ভক্ষকেরে কুশলে করিন্ত ভক্ষ্য দান।।

রহিম নামের অর্থ কি কহিমু আর।

দীন দয়াময় প্রভু মহিমা অপার।।

দয়ার সাগর প্রভু পতিত পাবন।

দুঃখী পাপী নৃপতির সহায় কারণ।।[১০]

*গাজু কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে কবি মধ্যযুগীয় রীতিতে বন্দনা দিয়ে গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন। কাহিনির প্রারম্ভে আল্লার নামে বন্দনাটি কিছুটা হলেও দৌলত কাজির কাব্যের সঙ্গে মিল দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরজন।। এতিন ভুবনে যত তাহার সৃজন*
সৃজিয়া সকলজীবে আহার যোগায়।। সুখ দুঃখ রোগ মৃতু তাহার আজ্ঞায়*
মৃত্তিকা গগনে নাহি তাঁর সমতুল।। পুজিবার যোগ্য সেই সকলের মুঅ*
তাঁহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর।। পতিত পাবন প্রভু করুণা সাগর*
মহা মহা পাপী কত আমার সমান।। দয়া করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান*[১১]

মুসলমান কবিদের লেখা পির গোরাচাঁদ, বনবিবি, সত্যপিরের কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে সর্বক্ষেত্রেই আল্লার বন্দনা লক্ষ করা গিয়েছে।

*লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না* কাব্যের অন্যতম নায়িকা হলেন ময়নাবতী। আলাওলের *পদ্মাবতী* (রচনাকাল- আনুমানিক ১৬৪৬)[১২] কাব্যের প্রধান নায়িকা হলেন পদ্মাবতী। ধর্মমঙ্গলের প্রধান নায়িকার নাম রঞ্জাবতী। *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র মূল নায়িকা হলেন চাম্পাবতী। চাম্পাবতী, ময়নাবতী, রঞ্জাবতী ও পদ্মাবতী এই চারটি নামের ধ্বনিগত সাদৃশ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আরাকান রাজসভার সাহিত্যে রূপ নিয়ে ব্যাপক চর্চা হতে দেখা গিয়েছে। লোরের রূপদর্শন করে চন্দ্রাণী আহার ও ভূষণ ত্যাগ করেছে। কবি তার মনের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন-

রূপ দেখি চন্দ্রানী বিস্ময় হৈল মনে।
দেব কি গন্ধর্ব কিবা না বুঝি ধরনে।।
দেখিতে দেখিতে বালা হৈল অচেতন[১৩]

কবিগণ সর্বদা রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ থেকেছেন। ময়নাবতীর পদ্মের মতো চোখ, কাজল শোভিত কটাক্ষ দৃষ্টি, মদনমঞ্জরি ভ্রূ। দাঁতগুলি দেখলে মনে হয় মুক্ত। চুলের মাঝখানে সিঁদুর সূর্যকিরণ দিচ্ছে। বাহুদুটি সুকোমল কিশলয়ের মতো। কুচ যুগল দেখে মনে হয় সিরিফল। নাভিকুন্ড মঙ্গলকলশ, নিতম্বটি কদলীর তরু। আলাওল পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করে বলেছেন-

পদ্মাবতী রূপ কি কহিমু মহারাজ। তুলনা দিবারে নাহি তিন লোক মাঝ।[১৪]

লোর, ময়নাবতী, চন্দ্রাণীর রূপ বহুজনকে আকৃষ্ট করেছে। কবি কেবল রূপ বর্ণনা করেই থেমে থাকেননি। সেই বর্ণনা শুনে রাজারা একদেশ থেকে অন্যদেশে ছুটে গিয়েছে। রূপের মোহে দিগ্‌বিজয়ী রাজারা, যোগীও মূর্ছিত হয়েছে। *লোরচন্দ্রানী ও সতীময়না* কাব্যে তিন দিন যোগী সংজ্ঞাহীন হয়ে দেবীর চরণে পড়েছিলেন। দেবস্থানে ভক্তগণ তাঁকে মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছেন। ভক্তরা তাঁর মূর্ছিত হবার কারণ জানতে পেরে তাঁর তপস্যা নিয়ে প্রশ্ন করেছে। সকলে গঞ্জনা করলে তিনি বলেছেন-

তেকারণে যত নর লোক করি উপহাস্য। যোগী হইয়া না চিনিলা দেব কি মনুষ্য।।
নহে নহে দেবীরূপ নহে এ রুদ্রাণী। অদভূতা রাজসূতা চারু সে চন্দ্রানী।।[১৫]

রূপের জন্যই এই কাব্যে ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি রচিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যের মতো রূপের প্রশংসা করতে গিয়ে বারবার চন্দ্রের উপমা এসেছে। দৌলত কাজি মোহরা কুমারী সম্পর্কে বলেছেন-

রূপে চন্দ্রসম নামে সে চান্দ গোহারী।।
গোহারী রাজ্যেতে যেন প্রত্যক্ষ চন্দ্রিমা।
চন্দ্রিমাহ নহে চান্দ গোহারী উপমা।।

মোহরা নৃপের চান্দ গোহারী নন্দিনী।[১৬]

আলাওল পদ্মাবতীর রূপের প্রশংসা করতে গিয়ে চাঁদের উপমা এনেছেন।

পদ্মাবতী আগে সব দিবসের চান্দ।।
সুর শশী দরশনে বুদ্ধি স্থির রয়।
দেখিলে বদন তার মূর্চ্ছাগত হয়।।[১৭]

ভারতচন্দ্র বিদ্যার রূপের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা। পদনখে পড়ি তার আছে কতগুলা।।
... ... ...
কাড়িনিল মৃগমদ নয়ন হিল্লোলে। কাঁদের কলঙ্কী চাঁদ মৃগ লয়ে কোলে।।[১৮]

কেবল আরাকান রাজসভার সাহিত্যে নয়, মধ্যযুগের সাহিত্যে রূপের প্রশংসা বারেবারে এসেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, বৈষ্ণব পদাবলি, রামায়ণ, মহাভারত সর্বত্র কবিরা রূপের নেশায় মজেছেন। বড়ুচণ্ডীদাস-এর *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* (রচনাকাল- আনুমানিক পঞ্চদশ শতকের গোড়ায়)[১৯] কাব্যে বড়াইয়ের মুখে কৃষ্ণ রাধার রূপের বর্ণনা কেবল শুনে অস্থির হয়েছে। রাধাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ না করেই বড়াইকে দিয়ে কৃষ্ণ প্রেম নিবেদন করেছে। বড়াই রাধার রূপের যে বর্ণনা দিয়েছে তা হল-

কেশপাশেঁ শোভে তার সুরঙ্গ সিন্দূর। সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর।।
কনককমলরুচি বিমল বদনে। দেখি লাজে গেলা চান্দ দুঈ লাখ যোজনে।।
মুনিমনমোহিনী রমণী আনুপামা। পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধানামা।।
ললিত আলকপাঁতিকাঁতি দেখি লাজে। তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে।।
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল। জলে পসি তপ করে নীল উতপল।।
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে। সত্বরে পসিলা সাগরের জল মাঝে।।
কুচযুগ দেখি তার আতি মনোহরে। আভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে।।
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে। মত্ত রাজহংস জিণী চলএ বিলম্বে।।
দিনে দিনে বাঢ়ে তাঁর নহুলী যৌবন। গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ।।[২০]

রাধিকার রূপের এমন বর্ণনা শুনে কৃষ্ণ প্রাণ ধরে রাখতে অক্ষম হয়েছে। মদনের পুষ্পশর তাকে আঘাত হেনে ক্ষতবিক্ষত করে তুলেছে। বড়াই এর প্রতি কৃষ্ণের উক্তিটি হল-

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী। ধরিবাক না পারোঁ পরাণী।। বড়ায়ি ল।।
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে। অতিশয় মোর মন হানে।। বড়ায়ি ল।।[২১]

কৃষ্ণ রাধাকে ফেলে মথুরায় চলে গেলে বড়াই রাধার কাছে জানতে চায় কৃষ্ণ কেমন দেখতে। কবি যেন সুযোগ খুঁজছিলেন কৃষ্ণের মোহন রূপ বর্ণনা করার। বড়াই কৃষ্ণকে আগেও দেখেছে তাকে সে চেনে। রাধার কাছে কৃষ্ণ কেমন দেখতে বড়াই-এর জানার দরকার ছিলনা। তবুও রাধার মুখে কৃষ্ণের রূপের প্রশংসা শুনতে চেয়েছে। আসলে কবি পাঠকের কাছে সেই রূপের পরিচয় করিয়ে দিতে চেয়েছেন। কাশীদাস মহাভারত (আনুমানিক রচনাকাল- ১৬০৪ খ্রিস্টাব্দ)[২২] রচনাকালে দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেন সভা তাঁরা যেন চন্দ্রের উদয়ে।[২৩]

এখানে শ্রীকৃষ্ণের মোহিনীরূপের বর্ণনা রয়েছে। সমুদ্রমন্থনের পর অমৃত নিয়ে ভাগ বাটোয়ারার সময় শ্রীকৃষ্ণ অসুরদের ছলনা করবার জন্য মোহিনীরূপ ধারণ করেছেন। কবি তাঁর অপরূপ রূপ বর্ণনা করে বলেছেন-

যার গন্ধে মকরন্দ ত্যজি অলিবৃন্দ। লাখে লাখে পড়ে ঝাঁকে পেয়ে মধুগন্ধ।।
...
ত্রৈলোক্যের মধ্যে যত আছে রূপবতী। তব পদনখে নিন্দে সবাকার জ্যোতি।।[২৪]

তাঁর রূপ দেখে সুর এবং অসুর উভয়েই মূর্ছা গিয়েছেন। শূলপাণি অর্থাৎ শিবের একই অবস্থা হয়েছে।

সুরাসুর মূর্চ্ছাতুর যাহারে হেরিয়া।।
...
দৃষ্টি মাত্রে সর্ব্বগাত্রে কামাগ্নি দহিল।[২৫]

কাশীদাস শ্রীকৃষ্ণেরও রূপের বর্ণনা করেছেন।[২৬] দ্রৌপদীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন-

তোমার অঙ্গের আভা, ম্লান করিলেক সভা
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে[২৭]

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী *অভয়ামঙ্গল* (রচনাকাল- ১৫৭৭ অথবা ১৫৯৪)[২৮] কাব্যে ছদ্মবেশিনী চণ্ডীর রূপ বর্ণনা করে বলেছেন-

ত্রিভুবনে এক ধন্যা অতি বরতনু কন্যা রতি-পতি জিনিয়া মূরতি।।
কুন্তলে কুসুম শোভে ষটপদ মধু-লোভে সীমন্তে সিন্দুর দিবাকর।
নাসা জিনি খগপতি স্মরধনু ভাং-ভাতি মুখচারু জিনি শশধর।।
দশন দাড়িম্ববিচি চমকে দামিনী-রুচি ওষ্ঠ জিনি পক্ক বিম্বফল।
সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে তথি বেড়ি মালতীর মাল।।
খঞ্জন গঞ্জন আঁখি অনুমানে হেন লখি কেশ জিনি নব জলধর।
সুচারু যে ক্ষীণ মাঝা জিনিয়া মৃগের রাজা হেমকান্তি জিনি কলেবর।।[২৯]

বিদ্যার রূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি ভারতচন্দ্র (জন্ম- ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দ)[৩০] বলেছেন-

নব নাগরী নাগরমোহিনী রূপ নিরুপম সোহিনী।।
শারদ পার্ব্বণ, সীধু বরানন,
পঙ্কজ-কানন মোদিনী।
কুঞ্জর গামিনী, কুঞ্জবিলাসিনী,
লোচন খঞ্জনগঞ্জনী।।
কোকিল নাদিনী গী; পরিবাদিনী
হ্রীপরিবাদ বিধায়িনী।[৩১]

বিদ্যা ছাড়াও অন্নদার মোহিনীরূপ অঙ্কন করেছেন কবি।[৩২] কবি হরগৌরীরও রূপ বর্ণনা করেছেন।[৩৩]

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে বারবার রূপের প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়েছে। কবি রূপের পূজারি ছিলেন একথা বলা যায়। তিনি কমবেশি সকলের প্রশংসা করেছেন। হয়তো তিনি পূর্ববর্তী কবিদের কাব্য থেকেই এই প্রশংসা রপ্ত করেছেন। বৈরামনগরের রাজা সেকেন্দরের রূপ পূর্ণ শশধরের মতো। সেকেন্দরের স্ত্রী অজুপা সম্বন্ধে কবি বলেছেন-

আজুপা নামেতে কন্যা, ছিল রূপে অতি ধন্যা।[৩৪]

সেকেন্দর ও অজুপার প্রথম সন্তান জুলহাসের রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

চন্দ্রের সমান রূপ ঝলমল করে/রূপেতে হইল আলো সমস্ত ভুবনে।[৩৫]

জঙ্গবাহাদুরের কন্যা পাঁচতোলার ক্ষেত্রে কবি কেবল বলেছেন তিনি পরমা সুন্দরী এবং তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে জুলহাস পিতা-মাতাকে ভুলে ছিলেন। কালু জন্মের পর কাঠের বাক্সে ভেসে এসেছিল অজুপার কাছে। বাক্স খোলা মাত্রই তিনি দেখেছিলেন-

চাঁদের মতন এক শিশু রহিয়াছে।[৩৬]

কালুকে পাওয়ার বেশ কিছুদিন পর অজুপার কোল আলো করে গাজির জন্ম হয়েছে।

তাহার রূপেতে আলো হইল ভুবন।।
শশী ছটা নিন্দে রূপ অতি সুশোভন*[৩৭]

কবি সেরূপ বর্ণনা করতে অক্ষম। কারণ দুনিয়াতে তা বর্ণনা করার মতো উপমা নেই। গ্রন্থে বারবার গাজির রূপের প্রসঙ্গ এসেছে। সোনাপুরে গাজি ও কালুকে পরিগণ পালঙ্কে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখেছে। দুই ভাইয়ের রূপ দেখে তারা মূর্ছিত হয়েছে এবং মনে করেছে এমন সৌন্দর্য ত্রিজগতে নেই। মনুষ্য অঙ্গে তা থাকা সম্ভব নয়। পরি হয়েও গাজির রূপের কাছে তারা তুচ্ছ। গাজির রূপের আলোয় তারা মূর্ছিত হয়ে পড়েছে।

শুইয়াছে দুই ভাই পালংগ উপরে।। রূপেতে হইয়াছে আলো যিনি শশধরে*
দেখিয়া গাজীর রূপ যত পরীগণ।। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ঢলিয়া তখন।।[৩৮]

গাজির সৌন্দর্য দেখে উন্মাদনার বশে কোনো এক পরি নিজের জাত দিয়ে তার চরণ সেবা করতে চেয়েছে। তার সৌন্দর্যের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে তারা দক্ষিণানগরের রাজকন্যা চাম্পাবতীর প্রসঙ্গ এনেছে।

নিন্দয় গগণ শশী সেই বিনোদিনী* হেন রূপ না পাইছে দেবতা কিন্নর।।
মুখের লাবন্য যিনি কোটি শশধর* আর হে বত্রিশ দাঁতে মিশি লাগাইছে।।
লক্ষ কোটি তারা যিনি উজ্জল করিছে* জবাফুল যিনি জিহ্বা তাতে খায় পান।।
না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান* মৃগের নয়ন তুল্য শোভিতে লোচন।।
যিনিয়া চন্দ্রের ছটা তাঁহার কিরণ* চোখ মেলি সেই কন্যা যার দিকে চায়।।
প্রাণ হারা হৈয়া সেই করে হায় হায়* ভ্রমণের বর্ণ যিনি লম্বা কেশ মাথে।।
দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে* জেলেখার কটি তুল্য কটি তার সরু।।
তাদৃশ নিতম্ব আর পেট পিঠ উরু* সুগঠন হস্ত পদ কি কহিব মরি।।
তাহার উপমা নাহি ত্রিজগত জুড়ি*[৩৯]

আকাশের দিকে যদি চাম্পাবতী তাকায় তখন ভাস্কর বারিধে গিয়ে লুকোয়। ঘুমন্ত গাজি ও চাম্পাবতীকে দেখে পরিদের মনে হয়েছে এক দেহ যেন দু'ভাগ হয়ে পড়ে আছে। একতিল সৌন্দর্যের বেশি কম কারও নেই। এত সুন্দর রূপ তাদের দুজনের বিবাহ হলে ভালো হয়।

মধ্যযুগের সাহিত্যে রূপে মুগ্ধ হয়ে মদন বাণ এসে লাগার প্রসঙ্গ এসেছে। দর্পণে চন্দ্রাণীর রূপ দেখে লোরের মদন শর লেগেছে।

ক্ষণে কাম্পে কলেবর দগধে মদন শর
জীবনক মানয় সংশয়[৪০]

চাম্পাবতীর সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটেছে। ঘুমন্ত অবস্থায় গাজির শরীরের সঙ্গে চাম্পাবতীর স্পর্শ লাগলে তার বুকেতে মদন শর হেনেছে। মদন শরের আঘাতে তার অবস্থা-

যেমন ঘৃতের মধ্যে পড়িল আগুন*[৪১]

পরিদের মধ্য থেকেও একজনের গাজির রূপের বাণ লেগেছে। তবে একটি বিষয় লক্ষ করা গিয়েছে যে মধ্যযুগের সাহিত্যে কবিগণ রূপের বর্ণনায় যে-ভাবে কবিত্ব দেখিয়েছেন পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে কবিগণ সেভাবে সৌন্দর্য বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন না।

আরাকান রাজসভার সাহিত্যে দেখা গিয়েছে রূপ দেখে মূর্ছা যেতে। মুকুরে অর্থাৎ আয়নায় চন্দ্রাণীর প্রতিবিম্ব দর্শনে লোর মূর্ছা গিয়েছে। দৌলত কাজির কথায়-

দেখয় অদ্ভুত রামা রূপে যেন তিলোত্তমা
বিম্ব যেন দেখিল লুকিত।।
দেখিয়া সেরূপ সাজ আচম্বিত যুবরাজ
মুহূর্তে পড়িল সভামাঝ[৪২]

*গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তেও বারবার রূপ দেখে মূর্ছা যেতে দেখা গিয়েছে। চাম্পাবতীর ঘুম ভাঙলে গাজির রূপ দেখে মূর্চ্ছা গিয়েছেন। চাম্পাবতীর মনে হয়েছে-

কটি শশী যিনি রূপ ঝলমল করে*[৪৩]

চাম্পাবতীর রূপ দেখে গাজি মূর্ছা গিয়েছেন। কবির কথায়-

হঠাৎ চামপার রূপ নয়নে হেরিয়া।। মুছিত হইয়া গাজী পড়িল ঢলিয়া।।[৪৪]

পরিদের গাজির রূপ দেখে যে অবস্থা হয়েছে-

দেখিয়া গাজীর রূপ যত পরীগণ।। মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ঢলিয়া তখন*[৪৫]

তবে আরাকান রাজসভার সাহিত্যে কামের বশবর্তী হয়ে অপর লিঙ্গের মানুষকে দেখে মূর্ছা গিয়েছে, কিন্তু আলোচ্য কাহিনিগুলিতে রূপের সৌন্দর্য দেখে মূর্ছিত হয়েছে।

বিয়ের পর গাজি চাম্পাবতীকে ছেড়ে রাতের বেলা বেরিয়ে পড়তে চাইলে পুরুষ সম্বন্ধে যে ধারণা কবি দিয়েছেন তা *লোরচন্দ্রাণী ও সতী ময়না* কাব্যের অনুরূপ বলা যায়।

যুবক নিষ্ঠুর জাতি পুরুষ দুরন্ত।    এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত।।
আচম্বিত মতি হৈল লোরক নৃপতি। ছাড়িয়া রত্নের হার গুঞ্জাত আরতি।।[৪৬]

গাজি চাম্পাবতীকে ছেড়ে চলে যাবার সময় গাজির প্রতি তার উক্তি-

আহা মরি একই রীত, যেমন ভ্রমরের প্রীতি, খাইয়া ফুলের মধু ফুল ছাড়ি যায়।।
বসে গিয়া অন্য ফুলে, তেমনি ধারা যাই চলে, অন্য নারী কাছে বুঝি, ছাড়িয়া আমায়*[৪৭]

বড়ুচণ্ডীদাসের কাব্যের সঙ্গে কেচ্ছা-কাহিনিগুলির মিল-অমিল উভয়ই খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেই অমিলটি হল ভাষাগত। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে যেমন আদি মধ্যযুগের ভাষার নিদর্শন মেলে[৪৮] তেমনি আলোচ্য কাহিনিগুলিতে 'যাবনী মিশাল' ভাষার নিদর্শন মেলে।[৪৯]

আরাকান রাজসভার সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে সুফি ধর্মের প্রসঙ্গ এসেছে। এখানে কয়েকটি কাহিনিতে বিক্ষিপ্তভাবে এই প্রভাব রয়েছে। সুফি ধর্ম ভাবনায় প্রেম, বিরহ ও মোক্ষের কথা বলা হয়েছে।[৫০]

চিতোরের রাজা রত্নসেন নানা বাধাবিপত্তির পর পদ্মাবতীকে লাভ করেছেন। পদ্মাবতীকে নিয়ে আলাউদ্দীনের সঙ্গে তিনি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছেন। চন্দ্রাণীকে পাবার জন্য লোরের নানান বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে। নিজের প্রাণনাশের ভয় তিনি উপেক্ষা করেছেন। মৈনা সিরজনের মাধ্যমে আটমাসের বিরহবার্তা লোরের কাছে জানিয়েছেন।

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে গাজি এবং চাম্পাবতী পরস্পরকে পাবার জন্য দীর্ঘ বিরহ সহ্য করেছেন। তাঁদের মিলন অনেক দুঃখকষ্টের পর হয়েছে। সুফি ধর্মের প্রভাব পড়েছে এখানে। প্রণয়ী, প্রণয়িনীর দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর মিলন হয়। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

(সম্পা.) *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না* (ভূমিকা অংশ) গ্রন্থে *হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস* গ্রন্থের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে ড. হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদীর মতে অসংখ্য দুঃখের পরে কণ্টকাকীর্ণ অতিদীর্ঘ পথের শেষে যে পারমার্থিক সুখ মেলে তা সুফি মতবাদের পরিপোষক।[৫১] গাজি দীর্ঘ তিন বছর চাম্পাবতীর খোঁজ পাননি। তাঁকে খুঁজে পাওয়া এতটাই সহজ ছিল না, কারণ সর্বক্ষণ প্রহরী দ্বারা রাজপ্রাসাদ পাহারা দেওয়া থাকত। গাজির সঙ্গে মিলনে চাম্পাবতীও চেষ্টা করেছে। তিনি মামি এবং বৌদিদের রাজি করিয়ে নদীতে স্নান করতে গিয়েই গাজিকে আবিষ্কার করেছেন।

চাম্পাবতীর হদিশ পেয়েও তাঁকে পাবার উপায় ছিল না গাজির। তাঁদের মিলনে সামাজিক বাধা ছিল। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হওয়ায় চাম্পাবতীর পিতা মটুক রাজা কিছুতেই গাজিকে জামাই হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। দক্ষিণরায় এবং মটুক রাজার সঙ্গে আঠারো দিন ব্যাপী তুমুল যুদ্ধে গাজি জয় লাভ করে চাম্পাবতীকে পেয়েছেন।

গোহারিরাজ মোহরা তাঁর জামাতা লোরের উপর রাজ্যভার দিয়ে দেশান্তরী হতে চেয়েছেন। তাঁর এই ইচ্ছার মধ্যে জগতের নশ্বরতা প্রকাশ পেয়েছে। সুফি মতেই শোনা গিয়েছে-

দারুণ পৃথিবী এই ব্যবস্থা তাহার।
এক যায় আন আইসে কেহ নহে সার।।[৫২]

কালু গাজিও তাঁর পিতার রাজ্য ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। পিতা সেকেন্দর রাজ্যের ভার গাজির হাতে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু গাজি সংসারের সমস্ত মায়া ত্যাগ করে ফকির হয়েছেন।

সুফি ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন স্রষ্টার সঙ্গে জীবের সম্পর্ক অদ্বৈত। তাঁরা আরও মনে করেন আল্লা জীবজগৎ সৃষ্টি করে নিজেকে প্রকাশ করেন। আল্লাকে পাবার জন্য প্রেমের তপস্যা ও সৌন্দর্যধ্যানের প্রয়োজন।[৫৩] কবিগণ পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি লিখলেও তাঁরা প্রথমে আল্লার বন্দনা করেছেন। তাঁদের থেকেও আল্লাকে বড়ো করে দেখেছেন। আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে আল্লার বন্দনা দিয়ে কাহিনি আরম্ভ হয়েছে। তাঁর কাছে আল্লাই বড়ো। আল্লা সৃষ্টি করেন আর তিনিই খাবার জোগান। সুখ-দুঃখ, রোগ, মৃত্যু

তাঁর ইচ্ছেতেই হয়। তিনি হলেন পতিতপাবন। পাপীদের উদ্ধার করে স্বর্গে স্থান দেন। *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি, বোন বিবী জহুরানামা*-য় বনবিবি বারেবারেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন আল্লাকে স্মরণ করে। জঙ্গলে মা গুলালবিবি ফেলে রেখে চলে গেলে আল্লার নির্দেশে হুরেরা এসে বনবিবিকে রক্ষা করেছেন। তাঁরই নির্দেশেই তিনি এবং ভাই শাজঙ্গলি আঠারো-ভাটি দখল করতে চলে গিয়েছেন। নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধে বনবিবি আল্লার সাহায্য নিয়ে জিতেছেন। *বোন বিবী জহুরা নামা*-য় কবি তাঁর বন্দনা দিয়ে কাব্য আরম্ভ করেছেন।

আল্লা পাক পরোয়ার, সৃজন পালন যার, কৃপা তার অসীম সাগর।।
তার তারিফের বানি, আমি কি কহিতে জানি, এমন ক্ষমতা কোথা মোর*
উদ্ধারিবে হাসরেতে আপনার কৃপা হৈতে, আছে লেখা কোরআন মাঝার।।[৫৪]

*বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-তে কবি বিসমিল্লা বলে কলম ধরেছেন। আর সেই বিসমিল্লার গুণগান করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

জীবজন্তু পয়দা কৈল রকম রকম।।
সবার প্রধান সেই করিল আদম*[৫৫]

কবি মনে করেছেন আল্লার ইচ্ছাতেই এই পৃথিবীতে যা কিছু ভালোমন্দ, রোগশোক ঘটে চলেছে।

সুফি মতবাদে দানশীলতার উপদেশ রয়েছে।[৫৬] *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে এই দানশীলতা লক্ষ করা গিয়েছে। গাজি কাঠুরিয়াদের অনেক ধনসম্পত্তি দিয়ে ধনীলোক করে দিয়েছেন। বনবিবি সংক্রান্ত মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে লক্ষ করা গিয়েছে গাজি ও দক্ষিণরায় দুখেকে অনেক ধনসম্পত্তি দিয়েছে।

সুফি ধর্মের গুরুবাদ *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়নার* মতো কৃষ্ণহরি দাসের লেখা *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*-তে লক্ষ করা গিয়েছে। লোর কৃচ্ছসাধনার মধ্য দিয়ে প্রেমে জয়লাভ করেছেন। তাঁর কাছে প্রেম সাধনা স্বরূপ। আর এই প্রেমে জয়লাভ করার জন্য তাঁর একজন গুরুও ছিল। সুফি ধর্মে প্রেম, বিরহ এবং মোক্ষের যে ত্রিস্তর সাধনা রয়েছে তা মুরশিদ বা গুরুর দ্বারাই সাধনা সম্ভব।[৫৭] ওয়াকিল আহমদ *বাংলার লোকসংস্কৃতি* (১৯৬৫) গ্রন্থে বলেছেন-

ইসলামের সুফিমতবাদ থেকে পীরের গুরুতত্ত্বের উদ্ভব। শুদ্ধ ও সিদ্ধ ব্যক্তিই সুফি, তিনিই পীর, তিনিই মুর্শিদ।[৫৮]

লোর চন্দ্রাণীর জন্য গোহারি রাজ্যে যাবার সময় এক যোগীকে গুরু হিসেবে মান্যতা দিয়েছেন।[৫৯] *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*-তে গুরুকে বন্দনা করা হয়েছে। কবি বলেছেন-

গুরুকে ভজনে হয় জনম সফল।। গুরু না ভজিলে তার জনম বিফল*
গুরু কৃপা বিনে কোন কার্য্য সিদ্ধ নয়।। গুরু না ভজিলে তার জন্ম বৃথায়*
দেশে২ বেড়াইলে গুরুর অন্ত না পায়।। পরম নিগূঢ় কথা মরসেদ বাতায়*
মনুষ্য হইয়া যেবা গুরু নাহি ভজে।। কোটি২ পুন্য করি নরকেতে মজে*[৬০]

সত্যপির নিজে একজন পির হয়ে তাঁর গুরুর প্রয়োজন হয়েছে। তাই তিনি খোয়াজ জেন্দাকে গুরু বলে মেনেছেন। কালু গাজির ভাই হলেও কাহিনিতে সর্বদা কালুকে গাজির পথপ্রদর্শক হিসেবে দেখা গিয়েছে। কালু সর্বদা গাজিকে পিরের ধর্ম মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন। যদিও গাজি সর্বক্ষেত্রে কালুর কথা মেনে চলেননি। যার ফলে তাঁকে অনেক দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।

## ৩.খ. বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনি ও মঙ্গলকাব্য:

মধ্যযুগের সাহিত্য মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে আলোচ্য পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির বেশ কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেই সাদৃশ্য বিষয়গত ও গঠণগত উভয়ই। ওয়াকিল আহমেদ বলেছেন-

‘কালুগাজী-চাম্পাবতী’, ‘সত্যপীরের পাঁচালি’, ‘মানিকপীরের গীত’, ‘বনবিবির জহুরনামা’ প্রভৃতি পুঁথিতে দেবকল্প লৌকিকপীরের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও পূজা প্রচার করা হয়েছে। ...এগুলি মঙ্গলকাব্যের দেবীবন্দনা, দেবীপূজা ইত্যাদির অনুরূপ[৬১]

মঙ্গলকাব্যের মতো এই সমস্ত রচনায় একটি বিশেষ সময় বা যুগগত কারণ লক্ষ করা গিয়েছে। দেবেশ কুমার আচার্য্য মঙ্গলকাব্যের সময়-সীমা নির্ধারণ করেছেন খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ-অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ।[৬২] বাংলায় মুসলমান অনুপ্রবেশের ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হিন্দুর সংখ্যা কমতে থাকায় তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অস্তিত্বের শঙ্কটে পড়েছে। এরপর উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের আপন এবং

তাদের আরাধ্য দেবদেবীকে গ্রহণ করেছে। যারফলে অনার্য দেবী মনসা পরিণত হয়েছেন আর্য দেবতা শিবের মানসকন্যা রূপে। অনার্য ব্যাধেদের দেবী চণ্ডী কল্পিত হয়েছেন আর্যদের দেবতা শিবের পত্নী পার্বতী রূপে। এইভাবে অনার্যদের আরাধ্য দেবদেবী আর্যীকরণ হয়ে গিয়েছে।[৬৩] আর্য ভাষাভাষী ও অনার্য জাতির সমন্বয়ের ফলে তাদের সংস্কৃতি, দেবতা, সমাজ, পুজো পদ্ধতি, লোকাচারও মিলেমিশে গিয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক থেকে সমন্বয়ের যুগ শুরু হলে তাঁরা উচ্চ বর্ণেরও শ্রদ্ধা লাভ করলেন। ব্রাহ্মণ পূর্বতন সংস্কার বিস্মৃত হয়ে চণ্ডী-মনসা-বাশুলী-ধর্ম ঠাকুরের আরাধনা ও তাঁদের মহিমা প্রচারক কাব্য রচনায় মহানন্দে আত্ম-নিয়োগ করলেন[৬৪]

মঙ্গলকাব্য রচনা সেই মিশ্রসংস্কৃতির মেলবন্ধনের ফল। নিম্নবর্ণের হিন্দুদের দেবদেবীর সঙ্গে উচ্চবর্ণের দেবদেবী মিলেমিশে যখন এক হয়ে গিয়েছে তখন বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব হয়েছে এক নবযুগের। শুরু হয়েছে মঙ্গলকাব্যের যুগ। রচিত হয়েছে মঙ্গলকাব্যের বিভিন্ন ধারা, যেমন- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল প্রভৃতি। মধ্যযুগের সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য এক বিশেষ স্থান দখল করেছে। পাশাপাশি অনুবাদ সাহিত্যের ধারা গড়ে উঠেছে, যেমন- রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি। এবিষয়ে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেছেন-

> তুর্কি মুসলিম শাসকদের মধ্যে যারা দূরদৃষ্টিসপন্ন ছিলেন, তাঁরা স্থানীয় অমুসলমানকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজকার্যে নিযুক্ত করেই ক্ষান্ত হননি, সেই সঙ্গে এদেশের সাহিত্য ও শিল্পকলাকে গড়ে তোলার কাজেও এগিয়ে গিয়েছিলেন এবং কবি ও শিল্পীদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন আগ্রহ ভরে। ফলে সে সব শাসকদের উপর স্থানীয় সুধী সমাজের আস্থাও মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৬৫]

বাংলা সাহিত্যে আরেকটি মিলনের ইতিহাস খুবই উজ্জ্বল রূপে থেকে যেতে পারত, কিন্তু সে ইতিহাস নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। আধুনিক যুগের সাহিত্য নিয়ে যখন একটি বিশেষ ধারা গড়ে উঠেছে তখন মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারা প্রায় স্থিমিত হয়ে গিয়েছে। ঠিক সেই সময় বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলে বিশেষ করে চব্বিশ পরগনায় (অখণ্ড) পুথি ও পাঁচালি নাম দিয়ে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনি লেখা হতে থাকে। মুসলমানরা এদেশে আসার পর উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের হিন্দু একজোট হলে লেখা হয়েছে মঙ্গলকাব্য। জহুরানামা রচিত হওয়ার আরেক ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। মুসলমানরা এদেশে এসে ধীরেধীরে জল, মাটি, আবহাওয়াকে ভালোবেসে এখানেই থেকে গিয়েছে। উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে পোশাক, খাদ্য,

সংস্কৃতির বিনিময় হয়েছে। সেইসঙ্গে হিন্দু দেবদেবীর মুসলমান পির, গাজি, বিবিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা দেখা গিয়েছে। হিন্দু ইসলাম জাতি গভীর ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হলে বনদেবী হয়েছেন বনবিবি, সত্যনারায়ণ সত্যপির, মানিকপির শিবেরই ছদ্মবেশ, মৎস্যেন্দ্রনাথের ইসলামি প্রতিরূপ হল পির মছন্দলি। সুকুমার সেন *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* (প্রকাশ- ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ) গ্রন্থে বলেছেন-

> ক্বচিৎ হিন্দুর ঠাকুর সম্পূর্ণরূপে মুসলমান পীর হয়ে গেছেন কিন্তু নাম বদলান নি। যেমন বর্দ্ধমান ও চব্বিশপরগনা জেলায় পীর গোরাচাঁদ।[৬৬]

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক রচনাগুলিতে সাহিত্যের নানা উপাদান রয়েছে। আধুনিক সাহিত্য নিয়ে মেতে থাকা মানুষের কাছে উপেক্ষিত হয়েছে আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে। অথচ এই সমস্ত সাহিত্যে হিন্দু ইসলাম উভয় ধর্ম-সংস্কৃতির এক বৃহৎ ইতিহাস রয়েছে। যদিও পরবর্তীকালে এই সমস্ত মিশ্রসংস্কৃতির দেবদেবীকে নিয়ে গবেষণা হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের বিবিধ ধারার মধ্যে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক সাহিত্য অন্যতম। এই আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি গড়ে উঠেছে মধ্যযুগেরই মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে। মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে তাকালে সেখানে কেবল ভক্তির প্রাধান্য দেখা গিয়েছে। গান করার উদ্দেশ্যে কাহিনিগুলি মঙ্গলকাব্যের মতো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা হয়েছে। সেখানে আধুনিক মনের চাহিদা মানা হয়নি। কাহিনিগুলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে। সাধারণত দরিদ্র মানুষই এই সমস্ত দেবদেবীর ভক্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেদের থেকে মেয়েরাই অধিক এই সমস্ত দেবদেবীকে পুজো অথবা হাজত দেন।[৬৭]

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী ও পির-গাজি-বিবি সকলেই লোকায়ত দেবদেবী। বিপদে পড়লে সাধারণ মানুষ তাঁদের এখনও ডাকেন। গ্রামের খেটে খাওয়া খুব সাধারণ মানুষ তাঁদের ভক্ত। দেবদেবীরা ভক্তের ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ থেকে উদ্ধার করেন বলে তারা মনে করেন। দুখে দক্ষিণরায়ের কবলে পড়ে মা মা বলে ডাকলে বনবিবি ভাই শাজঙ্গলিকে নিয়ে তাকে উদ্ধার করতে ছুটে গিয়েছেন।

> দুখেকে লইল বিবী কোলে উঠাইয়া।[৬৮]

দুখেকে মা বনবিবি অনেক সম্পত্তি দিয়ে সমাজের কেউকেটা বানিয়ে দিয়েছেন। সাত জালা ধন মা বনবিবির কাছ থেকে দুখে পেয়েছে। আবার চণ্ডীমঙ্গলে দেবী চণ্ডী কালকেতুকে সপ্তঘড়া ধন দিয়ে রাজা বানিয়েছে।[৬৯] অন্নদামঙ্গলে অন্নদা হরিহোড়কে অনেক সম্পত্তি দিয়েছে। অন্নদা হরিহোড়কে বলেছেন-

ওরে বাছা হরিহোড় দূর কর ভয়।
... ... ...
দুঃখ দেখি আসিয়াছি তোরে দিতে বর।
ধনপুত্র লক্ষ্মী পরিপূর্ণ হবে ঘর।।[৭০]

গ্রামবাংলার বেশিরভাগ মানুষই লোকদেবতাকেন্দ্রিক পালাগানের পারফরমেন্সের সঙ্গে বেশি পরিচিত। মুদ্রিত পুথি কিংবা পাঁচালিগুলির খবর অনেকেই রাখেন না।

পঞ্চদশ শতকে মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তির সময়কার সমাজ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ভালো ডাক্তার না থাকায় সাপে কাটলে তাকে ওঝার কাছে নিয়ে গিয়েছে। মানুষের মধ্যে শিক্ষার অভাব ছিল। সাধারণ মানুষ অলৌকিক কার্যকলাপ, পূজার্চনা নিয়ে মেতে থেকেছে। ব্রাহ্মণের দাপট, কৌলীন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রথা, মুসলমান কাজির অত্যাচার, ধনীদের উদ্যানবাটীতে বিলাস ভ্রমণ, কুটিল ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি অনাচার অত্যাচার লেগে থাকত। জাতিভেদ প্রথা প্রকট ছিল। ব্রাহ্মণরা শূদ্রদের অস্পৃশ্য ভেবে দূরে রেখেছে। এছাড়া ছিল সতিনকাঁটা, পণপ্রথা, সহমরণ প্রথা, ঘরজামাই রাখা, ঘুষের অবাধ প্রচলন। বিজয় গুপ্তের কাব্যে শিবের গঞ্জিকা সেবন লাম্পট্য, চাঁদের অনমনীয় জেদ, মনসার বর্বরোচিত উগ্রতা প্রভৃতি সমকালীন জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন-

> ... মঙ্গলকাব্যগুলি হৈতে দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার কতক আভাস পাওয়া যায়। মনসা মঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হাসান হোসেনের পালা, চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্গত অনার্য ব্যাধ কর্তৃক শৈবরাজ্য কলিঙ্গ আক্রমণের কাহিনী, ধর্মমঙ্গলের অন্তর্গত ডোম সেনাপতির সাহায্যে লাউসেনের ঢেকুর-বিজয়-ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসেরও একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে।[৭১]

১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মুসলমান শাসনের অবসান ঘটেছে। ইংরেজদের আবির্ভাবের ফলে বাঙালির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে নবজাগরণের জোয়ার এসেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, পত্রপত্রিকা, সভাসমিতি, কলকারখানা, আধুনিক

যোগাযোগ ব্যবস্থা, সমাজসংস্কার আন্দোলন, নারীশিক্ষা, প্রভৃতির মধ্যদিয়ে নবজাগরণ এসেছে। ওয়াকিল আহমেদের গ্রন্থ থেকে জানা যায় প্রথমদিকে এই সমস্ত লক্ষণ হিন্দুসমাজকে প্রভাবিত করলেও মুসলমান সমাজকে আলোড়িত করতে পারেনি। শহরে অনেক কাজের সন্ধান থাকলেও মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী। জমির স্থায়ী উপার্জন ত্যাগ করে তাঁরা শহরমুখী হতে রাজি ছিলেন না। যাঁরা চাকুরি বা রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন তাঁরাও কর্ম হারানোর পর কৃষিকার্যে নিযুক্ত হয়েছেন। তারা ইংরেজি শিক্ষার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।[৭২]যেসব কেচ্ছা-কাহিনি ইংরেজ শাসনের আমলে লেখা হয়েছে সেগুলিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, আদবকায়দা, চালচলন, পোশাক, খাদ্য, এগুলির কোনো প্রভাব পড়েনি। তবুও এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। নিম্নবৃত্ত মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, জীবন-জীবিকার কথা প্রকাশ পেয়েছে। তার সঙ্গে গ্রন্থগুলিতে রয়েছে সাহিত্যের নানা উপাদান।

বিষয়বস্তুগত সাদৃশ্য উভয় সাহিত্যেই রয়েছে। *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে মটুক রাজার খাওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

চারিটা মহিষ আর চাউল সাত মন।।
প্রতি সন্ধাকালে সেই করেন ভক্ষণ*[৭৩]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* কাব্যে কালকেতুর খাওয়ার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

মোচড়িয়া গোঁফ দুটা বান্ধিলেন ঘাড়ে। একশ্বাসে সাত হাঁড়ি আমানি উজাড়ে।।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ-জাউ। ছয় হাণ্ডি মুসুরী-সুপ মিশ্যা তথি লাউ।।[৭৪]

কালকেতুর জননী নিদয়ার মতো[৭৫] গাজির জননী অজুপার গর্ভাবস্থায় 'ইমলি অম্বল' খাওয়ার সাধ হয়েছে।

সপ্তম মাসেতে সতী অজুপা সুন্দরী*
নানা ইতি মিষ্ট দ্রব্য করেন ভক্ষণ।।
মিষ্ট দ্রব্য আসাদন লাগে কি তখন*
ঘন ঘন হাই আর মুখে উঠে জল।।
খাইতে অনেক সাধ ইমলি অম্বল*[৭৬]

কেতকাদাস খেমানন্দের *মনসামঙ্গল* (রচনাকাল- আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে)[৭৭] কাব্যে সনকার আটমাসে সাধের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন-

আট মাসে রামা মনেতে অক্ষমা

ঘন ঘন মুখে হাই[৭৮]

দেবী চণ্ডীর আশীর্বাদ ও সহযোগিতায় কালকেতু বন কেটে গুজরাটনগর নির্মাণ করেছেন। গুজরাটনগরের বর্ণনায় কবি বলেছেন-

অযোধ্যা সমান পুরী বিশাই নির্মাণ করি পুরদ্বারে রচিল কপাট।[৭৯]

তেমনি গাজির নির্দেশে পরিগণ বন কেটে মসজিদ, অট্টালিকা, গড়ে তুলেছেন।

কেটে বন করিলেক মসজিদ অট্টালিকা গড়ে সব গেলেন চলিয়া*[৮০]

অন্নদামঙ্গলে নৌকা পার করে দেওয়ার সময় অন্নদাকে পাটনী শর্ত দিয়েছে। পাটনী অন্নদাকে বলেছে-

পরিচয় না দিলে করিতে নারি পারি

... ... ...

শীঘ্র আসি নায়ে চড় দিবা কিবা বল[৮১]

গাজি নদী পার হওয়ার সময় মাঝি তাঁকে শর্ত দিয়েছে যদি তিনি সোনার একুশ বুড়ি কড়ি দেন তবেই তাঁকে পার করে দেবেন।

কেতকাদাসের *মনসামঙ্গল* কাব্যে বাসর ঘরে লখিন্দরকে সাপে কামড়ানোর সময় বেহুলা ঘুমিয়ে ছিল। তার নিদ্রাকে কালনিদ্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কবি বলেছেন-

বিষদন্ত দিয়া কালী খাইল তার পায়। দুর্লভ লখাই জাগে বিষের জ্বালায়।।

জাগ ওগো বেহুলা সায়বেনের ঝি।। তোরে পাইল কাল নিদ্রা মোরে খাইল কি।।[৮২]

এই কালনিদ্রার প্রসঙ্গ রয়েছে গাজি যখন রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করেছেন তখন তাঁর জননী অজুপা এমনই নিদ্রায় আচ্ছন্ন ছিলেন।

হায় হায় কাল ঘুমে কি রত্ন হারালি।[৮৩]

সপ্তডিঙা নিয়ে চাঁদ সদাগর বাণিজ্য করতে গিয়েছেন। আব্দুর রহীম সাহেবের *বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে আমরা দেখি ধোনা ও মোনা বাদাবন অর্থাৎ সুন্দরবনে সপ্তডিঙা নিয়ে মধু সংগ্রহ করতে গিয়েছেন।

বাসনা হইল এয়ছা ধোনার দেলেতে*
যাইবে বাদার বনে সাত ডিংগা লিয়া।।
আনিবে সহদ মোম বোঝাই করিয়া*[৮৪]

মঙ্গলকাব্যে এক দেবীর সঙ্গে অন্য দেবীর বিবাদ লক্ষ করা গিয়েছে যেমন- মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিরোধ। বিজয়গুপ্তের *মনসা মঙ্গল* (রচনাকাল- ১৪৯৪ খ্রি.)[৮৫] কাব্যে বলা হয়েছে-

পরমা সুন্দরী কন্যা অকুমারী বেশ।   চণ্ডীর প্রহারে তার তনু হইল শেষ।।
অতি কোপে মারে চণ্ডী সহিতে না পারে।  কাতর হইয়া পদ্মা চণ্ডীর পায়ে ধরে।।[৮৬]

বনবিবির জহুরানামায় বনবিবির সঙ্গে নারায়ণী, দক্ষিণরায়ের বিরোধ লক্ষ করা গিয়েছে। *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে দক্ষিণারায়ের সঙ্গে গাজির যুদ্ধ হয়েছে।

ভাঁড়ু দত্ত যেমন কালকেতুর কাছে ভেট নিয়ে গিয়েছে তাকে তুষ্ট করবার জন্যে। তেমনি মটুকরাজা দক্ষিণারায়ের কাছে ভেট নিয়ে গিয়েছে গাজির সঙ্গে যুদ্ধে রাজি করাতে।

কাপিয়া কাপিয়া রাজা কি করে তখন।। দক্ষিণা রাক্ষস কাছে করিল গমন*
...
খাবার বস্তু কত লইলেন সাথে।। হইবে দক্ষিণা দেও তুষ্টিত যাহাতে*[৮৭]

এছাড়া মঙ্গলকাব্যের মতো কেচ্ছা-কাহিনিতে দাম্পত্য কলহ, যুদ্ধ, সমরসজ্জা, দেবীর ছদ্মবেশ ধারণ, নায়ক ও নায়িকার রূপ বর্ণনা রয়েছে। উভয় সাহিত্য গ্রাম বাংলায় সৃষ্টি ও বিকাশ। নাগরিক জীবনের সঙ্গে গ্রন্থগুলির যোগ নেই। সেখানে পারিপার্শ্বিক সমাজজীবন যেমন উঠে এসেছে তেমনি অলৌকিক কাহিনিতে পূর্ণ।

চব্বিশ পরগনায় স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ার জন্য সর্বদা রোগ ও পীড়া লেগে রয়েছে। অসহায় মানুষ একমাত্র ভরসা হিসেবে সর্পদেবী, শস্যদেবী, শিকারের দেবী, বনদেবীর কল্পনা করেছে। মানুষ তাঁদের ভক্তি ভরে পুজো করেছে। এখনও সাপের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ভক্তরা মা মনসাকে পুজো করে। শীতলা দেবী হলেন ‘বসন্ত’ রোগ প্রশমনকর্তী।[৮৮] হামবসন্ত হলে শীতলাদেবীর নামে জল রুগীর দেহে ছিটিয়ে দিলে আরোগ্য লাভ করে এই লোকবিশ্বাস প্রচলিত আছে। সন্তানের মঙ্গলকামনায় মা ষষ্ঠীকে পুজো করা হয়। তাতে সন্তান বিভিন্ন রোগ, পীড়া, কুনজর এবং মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।[৮৯] এইসমস্ত লোকদেবতাকে

কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মঙ্গলকাব্য। অপরদিকে চব্বিশ পরগনায় বাঘ, কুমির, হিংস্র পশুর কবল থেকে বাঁচতে মা বনবিবিকে পুজো করা হয়। বিভিন্ন রোগ হলে, সন্তান না জন্মালে, পারিবারিক অশান্তি থাকলে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে পুজো, হাজত দেয় বিভিন্ন পির-গাজি-বিবিকে। এই সমস্ত দেবদেবীকে কেন্দ্র করে যেমন বহু মাহাত্ম্য-কাহিনি রয়েছে তেমনি অজস্র মাজার রয়েছে। যেমন- মানিকপির, মোবারকগাজি, দেওয়ানগাজি, রক্তানগাজি, ভাঙড়সুলতান, ওলাবিবি, দরবার বিবি, প্রমুখ।

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মতোই গোরাচাঁদ সাধারণ মানুষের কাছে আরাধ্য দেবতায় পরিণত হয়েছে। ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে আর্তমানুষ বিপদে পড়লে তাঁকে ডাকে। গোরাচাঁদের কবরে ফুল ও দুধ ঢেলে তাঁকে সন্তুষ্ট করে। সব লৌকিক দেবদেবীই ভক্তের ডাকে সাড়া দেন এমন প্রচলিত বিশ্বাস রয়েছে। কালকেতুকে দেবী চণ্ডী সাতঘড়া ধন দিয়ে গুজরাট নগরপত্তন করিয়ে সুযোগ্য রাজা বানিয়ে দিয়েছেন। গোরাচাঁদ মীরখাঁ নামক এক দরিদ্র অসহায় মানুষকে সাত ভাণ্ডার ধন দিয়েছেন। মীরখাঁর পরনের কাপড় ছিলনা। অভুক্ত অবস্থায় ঝুপড়ি করে তার মধ্যে সে থেকেছে। তেলের অভাবে গায়ে খড়ি উঠেছে। গোরাচাঁদের দয়ায় মীরখাঁর আর্থিক সঙ্কট দূর হয়েছে।

দ্বিজ রামধন *সত্য নারায়ণের পুথি* রচনা করেছেন সহজ সরল প্রকাশভঙ্গিতে। সেখানে নারায়ণ কলিযুগে অবতার রূপে সত্যদেব নামে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি রামায়ণ, মহাভারতের প্রসঙ্গ এনেছেন। অর্জুন, ইন্দ্রজিৎ-এর প্রসঙ্গ এনেছেন।

প্রান নাথে না দেখিয়া রাজার নন্দিনী। কৃষ্ণ না দেখিয়া জেন ভাবেন রুক্মিনী।।[১০]

চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে ধনপতি সওদাগর দুই স্ত্রী লহনা ও খুল্লনাকে বিদায় দিয়ে বাণিজ্যে যাত্রা করেছেন। সমুদ্রপথে যেতে গিয়ে তিনি নানান আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন। শ্রী কবিবল্লভ চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডের অনুসরণ করে গ্রন্থ সূচনা করেছেন। তাঁর গ্রন্থে যে অবাস্তব ঘটনা ঘটেছে তা হল-

পাথরের গৌর এর ভাসায় দরিয়ায়।।
নিত্য করে নিত্যকী কীর্ন্নরে গিত গায়।
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব সোভা পায়।।

মৃগছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া।
চারি ফকির নিমাজ' করে পশ্চিমমুখ হয়্যা।।[৯১]

বণিকখণ্ডে সওদাগরকে বিপদের মুখে ফেলেছেন দেবী চণ্ডী এবং *সত্যনারায়ণের পুথি*-তে খোদা। নৃপতি সওদাগরকে ধরে আনবার জন্যে কোটাল পাঠিয়েছে। কোটাল এসে কোমর বেঁধে নিয়ে গিয়েছে। কবি এখানে রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন-

শ্রীরামের রণে জেন সাজিল রাবন।।
... ... ...
লক্ষ্মণের রণে জেন সাজে ইন্দ্রজিতে।।[৯২]

কবি খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবে রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গ এনেছেন। তবে তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার বোঝা গিয়েছে। তিনি একজন হিন্দু তাই এই প্রসঙ্গ তিনি সরাসরি টেনে এনেছেন। আব্দুর রহিম সাহেব, খোদা নেওয়াজ, মুন্‌শী ওয়াজেদ আলির রচনায় রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের ছায়া থাকলেও নামগুলি আড়াল করা রয়েছে। শ্রী কবিবল্লভ *সত্যনারায়ণের পুথি* রচনা করতে গিয়ে বাশুলির পুজো করার কথা বলে ফেলেছেন। তিনি বলেছেন-

বলি দিয়া বাষুলি পুজিব তোমা লয়্যা। সত্যপির নারায়ণ বলে ডাক দিয়া।[৯৩]

সওদাগর বারো বছর বন্দি থাকার সময় তাঁর দুই স্ত্রী পশুপতি অর্থাৎ শিবের নিত্য পুজোয় রত ছিলেন। কবি এখানে শিবের অনেকগুলি নাম যেমন-পশুপতি, শঙ্কর, শূলপাণি, হর, শিব, মৃত্যুঞ্জয়, ত্রিলোচন, মহেশ ঠাকুর, ভোলা মহেশ্বর, ভূতনাথের উল্লেখ করেছেন। মুকুন্দরাম বণিকখণ্ডে লহনা খুল্লনা দেবী চণ্ডীর পুজো করার কথা বলেছেন। শ্রী কবিবল্লভ সত্যনারায়ণের রূপকে শ্যামের প্রসঙ্গ এনেছেন।

দ্বিজ রামধনের গ্রন্থে আরেকটি বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছে। কবি সত্যনারায়ণের নির্দেশেই গ্রন্থ রচনা করেছেন। অন্য সকল সত্যনারায়ণ কিংবা সত্যপির রচয়িতাদের গ্রন্থে তা দেখতে পাওয়া যায়নি। মঙ্গলকাব্যের প্রধান এই বৈশিষ্ট্যটি এই গ্রন্থে লক্ষ করা গিয়েছে। কবি বলেছেন-

শুন শুন সর্ব্বজন হয়ে একমন। সেই মনে প্রভু মোরে দেখালেন স্বপন।।
একদিন সত্যদেব নিশি অবশেষে। স্বপনেতে সত্যদেব কহেন বিশেষে।।

উঠ উঠ ওরে বাছা দ্বিজ রামধন। স্বপ্ন কহি তোরে সত্যনারায়ণ।।
অনেক লোকেতে মোরে করেছে কবিতে। ইচ্ছা নাহি হয় মোর সে সব শুনিতে।।
তাই বলি তোরে বাছা দ্বিজ রামধন। সুরস কবিতা ভাষা করহ রচন।।[৯৪]

ডক্টর গিরীন্দ্রনাথ দাস 'পীর মঙ্গলকাব্য' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৯৫] তিনি পির কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য বলেছেন কারণ উভয় কাব্যই পাঠ করলে বা শ্রবণ করলে পাঠক এবং শ্রোতার মঙ্গল হয়।

বর দেখতে এসে জামাই নিন্দা মঙ্গলকাব্যের মতো কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতেও রয়েছে। শ্রী কবিবল্লভের লেখা *সত্য নারায়ণের পুথি*-তে এমন জামাই নিন্দার ঘটনা রয়েছে।

অঙ্গনা সকল নিন্দে মদন সুন্দরে। চক্ষু খায়্যা হেন কন্যা মালা দিল তারে।।
পরিধান ছেণ্ডা বস্ত্র ছেড়া ধুতি গায়। কোন লাজে মালা দিল ঐটার গলায়।।
... ... ...
মহারানি বলে ধিক দারুন বিধাতা। আমার কপাল দোসে রাখাল জামাতা
কন্যা এই বরে কদাচিত নাহি দিব। কুন্তলা গলায় বান্ধ্যা ডুবিয়া মারিব।।[৯৬]

তবে মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে মঙ্গলকাব্যের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও বেশ কিছু বৈসাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। বৈসাদৃশ্যগুলি নিম্নরূপ।

১. মঙ্গলকাব্যগুলি যেসব দেবদেবীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে সেইসব দেবদেবীই বড়ো হয়ে উঠেছেন। মনসামঙ্গলে মনসা, চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডী, ধর্মমঙ্গলে ধর্মঠাকুর, শিবায়নে শিব। তাঁদের মাহাত্ম্য বারেবারে কীর্তিত হয়েছে গ্রন্থগুলিতে। অপ্রধান মঙ্গলকাব্যগুলিতেও যেসব দেবদেবীর নাম করে কাব্য রচিত হয়েছে তাঁরাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছেন। যেমন- শীতলা, কালিকা, সূর্য প্রমুখ দেবদেবী।

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে ভিন্ন চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। সেখানে সর্বদা আল্লার মাহাত্ম্যের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি সর্বদা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছেন। পির-গাজি-বিবি মানুষের দ্বারা বিপর্যস্ত হলে আল্লাই তাদের জীবন রক্ষা করেছেন। বনবিবির কাহিনিগুলিতে বনবিবি ও শাজঙ্গলি ভূমিষ্ঠ হবার পর অসহায় হয়ে পড়লে আল্লা তাঁদেরকে রক্ষা করেছেন। তাঁরা নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। বনবিবি আঠারো-ভাটির দখল করতে গিয়ে

নারায়ণীর সঙ্গে যুদ্ধে আল্লার সহায়তায় জিতে গিয়েছেন। গোরাচাঁদ নিজের ক্ষমতার জোরে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেননি। আকানন্দ ও বাকানন্দের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর প্রাণ চলে গিয়েছে। গাজি পিতৃ রাজ্যের ভার না নিতে চাওয়ায় তাকে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে পিতার কাছ থেকে। সেক্ষেত্রে বারেবারে আল্লা তার প্রাণরক্ষা করেছে। চাম্পাবতীকে পাবার ক্ষেত্রেও তাঁকে যুদ্ধের সম্মুখীন হতে হয়েছে মটুক রাজার সঙ্গে। তাঁর যুদ্ধে জয় এবং চাম্পাবতীকে লাভ আল্লার সহায়তায় ঘটেছে। কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কাহিনিগুলিতে কবিগণ তাঁর বন্দনা দিয়ে কাব্য শুরু এবং শেষ করেছেন। সেক্ষেত্রে আল্লার প্রতি ভক্তিই বেশি লক্ষ করা গিয়েছে। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীকে ভক্তি করেই কবিগণ কাব্যরচনা করেছেন।

২. পির-গাজি-বিবি মানবীর গর্ভে জন্মলাভ করেছেন। বনবিবি এবরাহিম ও গুলালবিবির সন্তান। গাজি সেকেন্দর ও অজুপার সন্তান। গোরাচাঁদ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন যিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারার্থে বেরিয়েছিলেন।[৯৭] সত্যপিরের জন্ম হয়েছে মানবীর গর্ভে। তাঁর মায়ের নাম সন্ধ্যাবতী। অপরদিকে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা দেব সন্তান।

৩. মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী ভক্তকে স্বপ্ন দিয়ে কাব্য লেখার আদেশ দিয়েছেন। নারায়ণ দেব তাঁর *পদ্মাপুরাণ* (রচনাকাল- পঞ্চদশ শতকের শেষপাদ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমপাদ)[৯৮] কাব্যরচনা করেছেন দেবী মনসার স্বপ্নাদেশে। তিনি বারো বছর বয়সে স্বপ্নাদেশ পেয়েছেন।

শিশুকালে গোপরূপে হাতে লইয়া বাঁশী।
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি।।
তৎপরে পদ্মা মোরে দেখাইল স্বপন।
কবিত্বের আশা মোর সেহিত কারণ।।[৯৯]

শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন –

শ্রাবণ মাসে নাগ-পঞ্চমী তিথিতে বিজয় গুপ্ত মনসার স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়াছিলেন[১০০]

বিপ্রদাস কাব্যের কারণ প্রসঙ্গে বলেছেন দেবীর স্বপ্নাদেশ।

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে।।
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ।।[১০১]

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অভয়ামঙ্গল কাব্যে দেবীর স্বপ্নাদেশের প্রসঙ্গ এনেছেন।[১০২]

কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে কবিদের স্বপ্নাদেশ দিয়ে কাব্য লিখতে দেখা যায়নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম রয়েছে যেমন- দ্বিজ রামধনের *সত্যনারায়ণের পুথি*। তবে মনসামঙ্গল কাব্যের মতো খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর কেচ্ছায় স্বপ্নদর্শনের প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। গোরাচাঁদ স্বপ্নের মাধ্যমে অত্যাচারীর মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর ভক্তদের বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন। ভক্তরাও বিপদে পড়লে তাঁর শরণাপন্ন হয়েছেন। গয়লারা বিপদে পড়লে তিনি রাজাকে স্বপ্নে জানিয়ে দিয়েছেন তাদের কোনো দোষ নেই। বালেণ্ডা পরগনা জঙ্গল গোরাচাঁদ বাদশাকে স্বপ্নে আদেশ দিয়ে পরিষ্কার করিয়েছেন।

৪. ওসমানিয়া ও গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে মুদ্রিত পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য গ্রন্থগুলিতে কাব্যের কাহিনি শুরু হয়েছে গ্রন্থের পিছন দিক থেকে। মঙ্গলকাব্যে এমন দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না।

৫. মঙ্গলকাব্যের তুলনায় কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে আরবি, ফারসি, হিন্দি ও তুর্কি শব্দের বহুল ব্যবহার দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সুকুমার সেন কেচ্ছা-কাহিনির ভাষাকে ‘এছলামী বাংলা’[১০৩] বলেছেন।

৬. মঙ্গলকাব্যের চারটি খণ্ড ১) বন্দনা খণ্ড ২) গ্রন্থউৎপত্তির কারণ ৩) দেবখণ্ড ৪) নরখণ্ড। মুদ্রিত কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে এইরকম কোনো স্পষ্ট খণ্ড বিভাগ নেই।

৭. উচ্চতর সমাজে স্ত্রী দেবতার পুজো প্রচলিত ছিল না।[১০৪] মনসাকে তার পুজো পেতে অনেক ছলাকলার আশ্রয় নিতে হয়েছে। তাই মঙ্গলকাব্যে দেবতার সঙ্গে মানুষের বিরোধ অনেকটা বেশি। অন্যদিকে মা বনবিবির পুজো পেতে ছলনা করতে হয়নি। তাঁর বাহুবলই যথেষ্ট ছিল ভক্তদের মনে স্থান করে নিতে। অন্যান্য পির-গাজি-বিবির ক্ষেত্রে একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা গিয়েছে।

৮. পঞ্চদশ শতকের শেষভাগ থেকে অসংখ্য মনসামঙ্গল রচয়িতার নাম পাওয়া যায়।[১০৫] তবে কয়েকজন জনপ্রিয় রচয়িতা হলেন- বিজয়গুপ্ত, নারায়ণদেব, এবং বিপ্রদাস পিপ্‌লাই। তবে আদি কবি হলেন কানা হরিদত্ত। পরবর্তীকালে হরিদত্ত নামে একাধিক কবির নাম পাওয়া

গিয়েছে।[১০৬] একাধিক চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতার নাম পাওয়া গিয়েছে।[১০৭] ষোড়শ শতকে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তিনজন উল্লেখযোগ্য কবির নাম পাওয়া গিয়েছে যেমন- মানিকদত্ত, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এবং মাধব। শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস* গ্রন্থে প্রত্যেকটি মঙ্গলকাব্যের একাধিক রচয়িতার নাম পাওয়া গিয়েছে। এমনকি অপ্রধান মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে। পির-গাজি-বিবিকে কেন্দ্র করেও একাধিক কবির নাম পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু মঙ্গলকাব্যের তুলনায় তা স্বল্প।

৯. মঙ্গলকাব্যের মতো কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে শাপভ্রষ্ট প্রসঙ্গ নেই। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবী পুজো প্রচারের জন্য চরম উৎসুক ছিলেন। তাঁরা সাধারণ মানুষকে চরম বিপদের মধ্যে ফেলে পুজো আদায় করতেন। বাংলায় পাঠান যুগের পর আসে মোগল যুগ। এই সময় ব্যাপক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপর্যয়ের সময়ে এইসব দেবদেবী বরাভয় মূর্তিতে আবির্ভাব হয় ভক্তকে উদ্ধার করার জন্যে।[১০৮] কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয় দেখা গিয়েছে। উভয় সম্প্রদায়ই পির, গাজি, বিবিকে পুজো বা হাজত দিয়েছেন। সেখানে শাপভ্রষ্ট প্রসঙ্গ নেই।

১০. মঙ্গলকাব্য রচয়িতারা তাঁদের পূর্ববর্তী কবিদের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁদের কাব্যে, কিন্তু পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে সেটি দেখতে পাওয়া যায়নি। আব্দুর রহিম সাহেব, খোদা নেওয়াজ, খতের সাহেব, মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি, শ্রী কবিবল্লভ, কৃষ্ণহরি দাস, দ্বিজ রামধন কোথাও তাঁদের পূর্ববর্তী কবিদের নাম করেননি তাঁদের কাব্যে। বিজয় গুপ্তের গ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় কানা হরিদত্ত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ববর্তী কবি। বিজয় গুপ্ত বলেন-‘প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত।’[১০৯] ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গল রচনার পূর্বে নারায়ণ দেবকে স্মরণ করেছেন।[১১০] মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর *অভয়ামঙ্গল* কাব্য থেকে পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।[১১১]

মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় গ্রন্থ হিসেবে একটি বড়ো আসন গ্রহণ করেছে, কিন্তু মুদ্রিত কেচ্ছা-কাহিনিগুলি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বড়ো স্থান দখল করতে পারেনি। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> পশ্চিম-বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য তথাকথিত ইসলামী বাংলায় নির্বাহ হতে লাগল, কেউ কেউ সেমিটিক রীতিতে উল্টো করে (অর্থাৎ ডান থেকে বাম দিকে) বাংলা বই ছাপাতে লাগলেন। কলকাতায় এই ধরনের অসংখ্য ছাপাখানা গজিয়ে উঠল। এখান থেকে কদর্য কাগজে কদর্যতর ছাপায়

আরবী-ফারসী কিস্‌সা (অর্থাৎ গল্প), লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, আলফা-লায়লা (অর্থাৎ আরব্য উপন্যাস) এবং ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মাচার সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। ছাপার রীতিতে মুসলমানী ঢং অনুসৃত হল, ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল- ফলে এ-সব বই হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হয়ে রইল, এবং বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর কোন যোগই রইল না।[১১২]

ইংরেজরা আমাদের দেশে অনেকগুলি বছর রাজত্ব করেছে। মানুষ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। মেয়েদের জন্য স্কুল নির্মিত হয়েছে তাদের পড়াশোনার জন্য। মানুষ কাজের সন্ধানে, পড়াশোনার জন্য শহরে গিয়েছে। মেয়েদের দুঃখদুর্দশা নিয়ে কিছু সুহৃদয় মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। ধর্মের গোঁড়ামিকে ডিরোজিও গোষ্ঠী অস্বীকার করে আধুনিক উদার মানবিকতার জয়ঘোষণা করেছে। জাতিভেদ প্রথাকে অস্বীকার করেছে। ঠিক এইসময়ে লেখা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে পঞ্চদশ শতকের মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত সামাজিক অবক্ষয়গুলিই উঠে এসেছে। এক্ষেত্রে মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে তার বিশেষ ফারাক নেই। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে পঞ্চদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক মঙ্গলকাব্যের সময় সীমা।[১১৩]

## ৩.গ. মুসলমান কবির লেখা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিতে রামায়ণ, মহাভারত, চরিত সাহিত্য, পুরাণের প্রভাব ও ইতিহাস অনুসন্ধান:

মুসলমান কবিগণ পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিকে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের আদর্শে রচনা করেছেন। অনেকক্ষেত্রে তাঁরা পুরাণের কাহিনি, অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর কাহিনি ও চরিত্রের সঙ্গে পির-গাজি-বিবির কাহিনিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এই গবেষণা নিবন্ধে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহের দৃষ্টান্ত উদ্ধার ও তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় বা অন্যান্য কারণ অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা রয়েছে।

ত্রয়োদশ শতকের শুরুতে লক্ষ্মণ সেনের পতন হয়েছে ইখতিয়ার উদ্দিনের হাতে। এরপর বাংলায় ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তাদের অনুপ্রবেশ বাঙালি সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মকে প্রভাবিত করেছে। পরে ইসলামের উদার ভ্রাতৃত্বের বাণী শোনা গেলে হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্য মানুষ সেই ধর্ম গ্রহণ করেছে। এছাড়া তাদের ছিল প্রাণভয়, রাজভয়, খেতাব ও খেলাতের লোভ। তাতার, তুরকি, খোরাসনি, পাঠান মুসলমানেরা প্রথম শ'দুয়েক বছর চণ্ডমূর্তি

ধারণ করে এদেশ শাসন করেছে। পরে তারা এদেশের ভাষা শিখে সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতিও কৌতূহলী হয়েছে। অনেক পাঠান সুলতান হিন্দু কবি ও পণ্ডিতদের কাছে রামায়ণের গল্প শুনতে ভালোবাসত। তারা খেতাব ও খেলাত দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। রুক্‌নুদ্দিন বরবক শাহ্‌ কুলীনগ্রামের মালাধর বসুকে ভাগবত রচনার জন্য 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান এবং তাঁর ছেলে ছুটি খান দু'জনেই তাঁদের হিন্দু সভাকবিদের দ্বারা মহাভারত রচনা করেছেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে মহাভারতের একজন অনুবাদক বলেছেন রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প শুনতে মুসলমানেরা খুব ভালোবাসতেন।[১১৪]

বাংলাদেশে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হবার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তর-ভারত থেকে উলেমা, পির, ফকির, গাজি, মুরশিদ এসেছে। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> আশরফখান ও মাগন ঠাকুরের অমাত্যসভায় আরবী ফারসী হিন্দী সংস্কৃত সর্বোপরি বাংলা ভাষার চর্চা হত।...পুরাণ, নীতিবিদ্যা, কাব্যশাস্ত্র, সঙ্গীতকলা রাজসভায় বহুবিধ শাস্ত্রের চর্চা কবিদেরও অল্পবিস্তর প্রভাবিত করেছিল।[১১৫]

উলেমা, পির, ফকিরদের 'কেরামত' দেখে অনুন্নত হিন্দুধর্মের মানুষ তাদের ভক্তি এবং পিরের থানে বা দরগায় প্রদীপ জ্বালিয়ে মানত করেছে।[১১৬]

চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে বিবি, পির, গাজিকে ঘিরে বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত লৌকিক দেবদেবী হলেন বনবিবি, ওলাবিবি, মানিকপির, বড়োপিরসাহেব, পিরগোরাচাঁদ, সত্যপির, মোবারকগাজি, বড়খাঁগাজি প্রমুখ। বিভিন্ন ধর্মের মানুষ বিপদে পড়লে এই দেবদেবীকে পুজো হাজত দেন। পুথি, পালা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে লোকদেবদেবীর মাহাত্ম্য-কাহিনি ছড়িয়ে আছে।[১১৭] অনুমান করা যায় মুসলমান শাসনকালে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের চর্চা হওয়ার কারণে মুসলমান কবিগণ সেইসব কাহিনি জেনেছেন। তাঁরা যখন কেচ্ছা-কাহিনি রচনায় হাত দিয়েছেন স্বাভাবিক ভাবে তাতে এই সমস্ত পুরাণের প্রভাব পড়েছে।

পির-গাজি-বিবিকে হিন্দুরা পুজো এবং ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা হাজত দেন। অনুমান করা যায় ধর্মসমন্বয়ের কথা ভেবে এই সমস্ত লোকায়ত দেবদেবীকেন্দ্রিক কাহিনির বিষয়বস্তুতে হিন্দুদের জাতীয় কাব্যের বিভিন্ন গল্প ও চরিত্র নিয়ে এসেছেন। কবিগণ শেষ থেকে কাহিনির সূচনা করেছেন। বাংলা শব্দের পাশাপাশি প্রচুর আরবি, ফারসি, উর্দু, তুর্কি শব্দেরও প্রয়োগ করেছেন। যারফলে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলা যায়। যদিও অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অন্য কথা বলেছেন। তাঁর মতে ভাষায় জোর করে আরবি ও ফারসি প্রবেশ করানোর জন্যে হিন্দুসমাজে তা অস্পৃশ্য হয়ে গিয়েছে।[১১৮] মূল সাহিত্যকে বিকৃত করার অধিকার কারও থাকে না। সাহিত্য কখনও কোনো বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের নয়। সাহিত্য সকলের তাই মুসলমান কবিগণ কাব্যরচনার সময় পুরাণের কাহিনি ও চরিত্র তাদের সাহিত্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেও নিজেদের লেখায় মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন।

রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বাংলাদেশে হিন্দুদের অতি জনপ্রিয় ধর্মগ্রন্থ। কবিদের ধারণা পুরাণের কাহিনির সঙ্গে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনি মিলিয়ে দিতে পারলে তাঁদের গ্রন্থগুলিও জনপ্রিয়তা লাভ করবে। অনুমান করা যেতে পারে মুসলমান কবিদের পূর্বপুরুষ হিন্দু ছিলেন তাই তাঁদের পুরাণের প্রতি আগ্রহ লক্ষ করা গিয়েছে। *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি, গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি, বোন বিবী জহুরা নামা, পীর গোরাচাঁদ* এবং সত্যপিরের বেশকিছু কাহিনির সঙ্গে রামায়ণ, মহাভারতের তুলনামূলক আলোচনা নিম্নে করা হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত *কাশীদাসী মহাভারত* (কাশীরাম দাস মহাভারত রচনায় হাত দেন ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে)[১১৯] বাংলা সাহত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কৃত্তিবাসের *রামায়ণ* তারও অনেক আগের। মহাকাব্যটির রচনাকাল ১৩৪০ শকাব্দ বলে অনুমিত হয়। মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলি তার অনেক পরে লেখা। কবি আব্দুর রহীম সাহেব *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*-তে রামায়ণকে হুবহু অনুসরণ করেননি। নিজের কবিত্ব শক্তি দিয়ে কাহিনিটি রচনা করে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। রামায়ণে বর্ণিত দুটি প্রতিশ্রুতির কথা তিনি গ্রহণ করেছেন। সম্বর অসুরের সঙ্গে দেবতাদের যুদ্ধ বাঁধলে দশরথ দেবতাদের সহযোগিতা করেছেন। যুদ্ধ চলাকালীন অসুরের অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়ে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন। এমতাবস্থায় কৈকেয়ী রাজা দশরথকে উদ্ধার করেছেন ও দীর্ঘদিন সেবার দ্বারা সুস্থ করে

তুলেছেন। রাজা কৃতজ্ঞতা বশত তাঁকে দুটি বর দিতে চেয়েছেন। এক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর (জন্ম- ১২ মে ১৮৬৩, মৃত্যু- ২০ ডিসেম্বর ১৯১৫)[১২০] *ছোটোদের রামায়ণ*-এর প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। বুদ্ধিমতী কৈকেয়ী বলেছেন-

যখন ইচ্ছা হয় লইব।[১২১]

রাজাও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কৈকেয়ী যা চাইবেন তাই দেবেন। রামের যুবরাজ হওয়ার ঠিক আগেরদিন রানি রাজাকে দুটি বর দেবার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন-

আগে প্রতিজ্ঞা কর দিবে তবে বলিব।[১২২]

দশরথের প্রতিজ্ঞার প্রসঙ্গে কৈকেয়ী আরও মনে করিয়ে বলেছেন-

সত্য লঙ্ঘে যে তাহার হয় সর্ব্বনাশ।
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস।।[১২৩]

ঠিক এইরূপ প্রতিশ্রুতির কথা দেখতে পাওয়া যায় বনবিবির কাহিনিতে। এবরাহিম ফুলবিবির কাছে দ্বিতীয় বিবাহের অনুমতি চাইলে তিনি কৈকেয়ীর মতোই শর্ত আরোপ করেছেন। দশরথের মতো উত্তেজনার বশে সেই সময় এবরাহিম তাঁর কথা মেনে নিয়েছেন। ফুলবিবি জানিয়েছেন যথাসময়ে তিনি যা চান তাই যেন পান। তিনি ঠিক কৈকেয়ীর সুরেই বলেছেন-

যখন খায়েস হবে দেলেতে আমার।। কহিব সে কথা মেনে লইবে আমার*
যদি সে কারার মেরা পুরা না করিবে।। আল্লার দরগায় শক্ত গোনাগার হবে*[১২৪]

রামের রাজ্যপদে অভিষেকের সময় দশরথের দেওয়া পূর্বের প্রতিজ্ঞার কথা মনে করিয়ে কৈকেয়ী তাঁর কাছে রামের চোদ্দ বছরের বনবাস ও ভরতের সিংহাসন দাবি করেছেন। এবরাহিম ফুলবিবির শর্ত মেনে নিয়ে গুলালবিবিকে বিয়ে করেছেন। বিয়ের পর সেই শর্ত পূরণ করতে গর্ভাবস্থায় গুলালবিবিকে বনবাসে রাখতে বাধ্য হয়েছেন। ফুলবিবি এবরাহিমকে তার শর্তের কথা মনে করিয়ে দিয়ে জানিয়েছেন এখনই সময় এসেছে তার শর্ত পূরণ করার।

দিয়াছ সাদীর আগে কারার আম্মারে* আপনি করেন পুরা এবে সে কারার।।
হইয়াছে সে কথার এখন দরকার* ফকির বলিল বিবী কিবা চাও তুমি।।

ফুল বিবি বলে দেহ যাহা চাই আমি* বনবাস দেহ তুমি গুলাল বিবীরে।[১২৫]

স্ত্রীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ায় দশরথ এবং এবরাহিম উভয়েই কষ্টে তাঁদের প্রিয় মানুষকে বনবাসে পাঠাতে একপ্রকার বাধ্য হয়েছেন।

সীতা ও গুলালবিবির ভাগ্যের যে পরিহাস তা একই রকম। রাম গর্ভবতী সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছেন প্রজানুরঞ্জনের জন্য। সীতা স্বামীর কাছে মুনিপত্নীর সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সেই সুযোগকে রাম কাজে লাগিয়েছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ পেয়ে লক্ষ্মণ মুনি পত্নীর সঙ্গে সাক্ষাতের নাম করে তাঁকে বাল্মীকির তপোবনে নিয়ে গিয়ে বলেছেন-

কালি তুমি কহিয়াছ রাম বিদ্যমানে।
সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্নী সনে।।
আইলাম তব স্থানে এই সে কারণ।
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন।।
... ... ...
সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট।।[১২৬]

ফুলবিবির অসন্তোষ দূর করতে দশমাসের অন্তঃসত্ত্বা গুলালবিবিকে এবরাহিম বাপের ঘরে পৌঁছে দেবার নাম করে বেরিয়েছেন।

এবরাহিম কহে শুন পিয়ারা আমার।। নফজ আসরফে হজরত আলীর মাজার*
সেখানেতে জিয়ারত করিয়া লইব।। বাদে তোমার মা বাপের ঘরেতে পৌছিব*[১২৭]

সীতা ও গুলালবিবি দুজনে কেউ জানতেন না তাদের কী অপরাধ। তাঁরা বিনা দোষে গুরুদণ্ড ভোগ করেছেন। সীতা লক্ষ্মণের সঙ্গে যাওয়ার সময় গর্ভের ভারে পরিশ্রান্ত হয়ে পথ চলার ক্ষমতা হারিয়েছেন।

গর্ভবতী নারী হাই উঠে সর্ব্বক্ষণ।
সদাই অলস সীতা ভূমিতে শয়ন।।
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা।
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন সীতা।।[১২৮]

স্বামী এবরাহিমের সঙ্গে বনে যাওয়ার সময় গর্ভের ভারে গুলালবিবির সীতার মতোই অবস্থা হয়েছে।

চলিতে না পারে বিবী থোড়া দুর গিয়া*
হাটিয়া বিবীর পেটে দরদ ধরিল।।
এক গাছ তলে বিবী যাইয়া বসিল*
আরামের তরে তবে আচল পাতিয়া।।
কাতরেতে গাছতলে রহিল শুইয়া।।[১২৯]

সীতা ও গুলালবিবি দুজনেই বনের মধ্যে যমজ সন্তান প্রসব করেছেন। এইভাবে রামায়ণের কিছু প্রভাব থাকলেও আব্দুর রহীম সাহেব নিজের মৌলিকতা দিয়ে গল্পের মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তবে রামের মতো এবরাহিম নির্দয় ছিলেন না। তিনি বাধ্য হয়ে স্ত্রী গুলালবিবিকে বনবাসে দিয়েছেন, কিন্তু স্ত্রী ও সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছেন। এবরাহিম আধুনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। স্ত্রী সাত বছর জঙ্গলে থাকা সত্ত্বেও তার চরিত্রের প্রতি তিনি সন্ধিহান ছিলেন না, কিন্তু সীতার চরিত্রের প্রতি প্রজারা প্রশ্ন করলে রামের সম্মুখেই সীতার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল-এর বণিকখণ্ডে সওদাগরের থেকেও তিনি আধুনিক মনস্ক বলা যায়। খুল্লনা বনে ছাগল চরানোয় সমাজে তাকে কলঙ্কিনী করতে চাইলে তিনি বিশ্বাস না করলেও খুল্লনাকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।[১৩০]

রামায়ণের মতো *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে মায়ার হরিণের প্রসঙ্গ রয়েছে। মায়ার হরিণ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে ছলনা করে তাদের জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এনেছে। বনে রাম ও লক্ষ্মণের সঙ্গে মারিচের দেখা হয়েছে।

কোনখানে ছিল সে মারীচ নিশাচর।
মৃগরূপ হৈইয়া গেল রামের গোচর।।[১৩১]

বৈরামনগরে শাহা সেকেন্দর ও অজুপার পুত্র জুলহাস শিকার করতে জঙ্গলে গেলে মায়ার হরিণ তাকে ছলনা করেছে। এরফলে জুলহাসের সঙ্গে তার মাতা-পিতার দীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটেছে।

হঠাৎ হরিণ এক উঠে দৌড় দিল।।    জুলহাস তাহার পিছু ঘোড়া ছুটাইল*
মায়ার হরিণ সেই কি করে তখন।।    একটি সুড়ঙ্গ দিয়া করিলে গমণ*
দেখিয়া জুলহাস গেল সেই সূড়ঙ্গেতে।।    হরিণ ধরিবে বলে তাহার পিছেতে*[১৩২]

রামের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন লক্ষ্মণ। তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আদেশ সর্বদা পালন করেছেন। কৈকেয়ীর ছলনায় দশরথ চোদ্দ বছরের জন্য রামকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। লক্ষ্মণও

সমস্ত রাজসুখ ত্যাগ করে রামের সহযাত্রী হয়েছেন। রাম তাঁকে পিতা-মাতার কাছে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ হিসেবে তিনি জানিয়েছেন-

যেই তুমি সেই আমি শুনহ লক্ষ্মণ
একেরে দেখিলে হয় শোক পাসরণ।।[১৩৩]

প্রত্যুত্তরে লক্ষ্মণ তাঁকে বলেছেন –

আমি সঙ্গে থাকিব হইয়া অনুচর।।
যেই তুমি সেই আমি বিধি তাহা জানে।
যদি আমি থাকি হেথা কি করিবে বনে।।
সীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে।
সেবকে ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুই জনে।।[১৩৪]

গাজি ফকির হয়ে গৃহত্যাগ করার সময় কালুও সমস্ত রাজসুখ ত্যাগ করে গাজির সহযাত্রী হয়েছেন। লক্ষ্মণ ও কালুর বক্তব্য একই বলা যায়।

কালু বলে ভাই গাজী এই কিউচিত।।   একেলা চলেছ তুমি করে বিবর্জ্জিত*
দাসকে লইয়া যাও সাথে আপনার।।   খড়মের বোঝা আমি রহিব তোমার *[১৩৫]

রাম ও লক্ষ্মণের ভাতৃত্ব সুলভ আচরণ গাজি ও কালুর মধ্যে লক্ষ করা গিয়েছে।

রাবণ সীতাকে হরণ করলে রাম, সীতার জীবনে যে বিরহ উপস্থিত হয়েছে তেমনি গাজি ও চাম্পাবতীর জীবনে নেমে এসেছে। রাম সীতাকে খুব সহজে খুঁজে পাননি। সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা করে বানর সেনার সাহায্যে অনেক খোঁজাখুঁজির পর পেয়েছেন। গাজিও চাম্পাবতীকে তিন বছর খোঁজাখুঁজির পর বাঘ সৈন্যকে সঙ্গে নিয়ে তবে দেখা মিলেছে। দক্ষিণানগর খুঁজে পেতে গাজি কালুর বিভিন্ন বাঁধা অতিক্রম করতে হয়েছে।

নানা দেশ নদী নালা এড়াইয়া যায়।। হইল বৎসর তিন সে দেশ না পায়*[১৩৬]

মটুক রাজার রাজ্য দক্ষিণা নগরে। চাম্পাবতীকে গাজি সেখানেই পেয়েছেন। হনুমান সীতাকে খুঁজতে দক্ষিণেতেই গিয়েছে।

দক্ষিণেতে চলিলেন পবনকোঙর।[১৩৭]

লঙ্কাপুরীর প্রাকৃতিক শোভা অতীব সুন্দর। প্রাচীরে বসে বানর অশোকবনের সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করেছে। বনের ভিতর প্রবেশ করে দেখেছে ফল, ফুলের আধিক্যের জন্য ডাল নুয়ে পড়েছে। সেখানে ভ্রমর, কোকিল, নানা বর্ণের পাখির আনাগোনা। চারপাশ যেন রাঙ্গা হয়ে গিয়েছে। এইরূপ প্রাকৃতিক শোভা *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তেও লক্ষ করা গিয়েছে। দক্ষিণানগরে পরিরা প্রবেশ করলে এমন প্রাকৃতিক শোভা তারা লক্ষ করেছে। উদ্যানে কদম্ব, কেতকী, বেলা, মল্লিকা, বকুল, টগর, জবা, গোলাপ, কামিনী, চাঁপা, রঙ্গন প্রভৃতি নানা জাতির ফুল শোভা বর্ধন করেছে। নানা জাতির ফল পেকে রয়েছে। কবির ভাষায়-

সুন্দর সে বন যেন কাঞ্চন মূরতি।।[১৩৮]

*পীর গোরাচাঁদ*-এর কেচ্ছায় 'হাতিয়াগড়'[১৩৯] দেশের প্রাকৃতিক শোভা অতীব সুন্দর। কবির বর্ণনায়-

অতি পরিষ্কার তার সহর বাজার।।   কি লিখিব আমি তাই তারিফ তাহার*
ঠাই২ পুষ্প বোন দীঘি মোনহর।।   নানা পক্ষী কলরব গুঞ্জরে ভ্রমর *
দিব্ব জাঙ্গাল সরোবর অগাধ তার জল।।   বিকশিত পদ্ম তাহে শোভে শতদল*
সুমলয় ছোটে বসন্ত বসন্তের বায়।।   মধু লোভে অলিরাজ উড়িয়া বেড়ায়*
হিরামতি কাঞ্চসা যত যায় গড়াগড়ি।।   নিশি যোগে চৌকিদার ফেরে বাড়ী বাড়ী[১৪০]

লঙ্কার চারিদিকে সোনার দেওয়াল, সিংহ দরজাগুলি সোনার, জানলা সোনার, রোয়াক পান্নার, সিঁড়িগুলি মানিকের, স্ফটিকের বেদী, তার উপর নীলকান্তমণির খাট, সোনার থাম, সোনার থালা। তাই হয়তো লঙ্কাকে স্বর্ণলঙ্কা বলা হয়।

সোনার প্রাচীর মধ্য বাহিরে লোহার।
গগন মণ্ডলে চূড়া লাগয়ে তাহার।।
চালের উপর শোভে সুবর্ণের বারা।
চারিভিতে শোভা করে মুকুতার ঝারা।।
...   ...   ...
মানিক কাঞ্চন আর প্রবাল পাথর।
অন্ধকারে আলো করে লঙ্কাপুরী ঘর।।
...   ...   ...
রাবণ শুইয়া আছে রত্নময় খাটে।

ঘর আলো করিতেছে দশটি মুকুটে।।[১৪১]

আব্দুর রহীম সাহেব দক্ষিণানগরের সৌন্দর্য যে-ভাবে বর্ণনা করেছেন আমাদের স্বর্ণলঙ্কাই মনে হবে। এখানে ঘর, দালান, কোঠা, ঘাট, থালা, বাটি, ঘটি সকলই সোনার।

জানিবা তাহার নাম দক্ষিণা নগর।। চারিদিকে নদী তার দেখিতে সুন্দর*
সোনা দিয়া বান্ধিয়াছে ঘাট চারিখান।। প্রতি ঘাটে চারিশত সোনার নিশান*
... ... ...
সুবর্ণের কুম্ভ দিয়া আনে সবে জল।। বাটি ঘটি থালা ঝারি সোনার সকল*
এক-খান ঘর নাহি সেই দেশ জুড়ি।। দালান আর কোঠা সব রূপার ঘর বাড়ী*
রাজার বিরাট ঘর ছিল যে সোনার।। দূরে থাকি দেখা যায় অগ্নি আকার*[১৪২]

লঙ্কাপুরী ও দক্ষিণানগরের প্রবেশপথ দুর্গম। কারণ উভয়ের চারিদিকে জল।

চারিদিকে নদীজল দুধ বর্ণ তাতে[১৪৩]

লঙ্কাপুরীও সাগরবেষ্টিত।

লঙ্কাপুরী চারিদিকে বেষ্টিত সাগর।
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর[১৪৪]

লঙ্কাপুরীতে দেবতারা প্রবেশ করতে পারে না তেমনি দক্ষিণানগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য। কালু বলেছে-

পাগল হইল ভাল অনুজ আমার।। কেমনে যাইব এই পূরির মাঝার*
হেন শক্তি আছে কার পুরি মধ্যে যায়।। শুনেছি রাক্ষস এক রেখেছে রাজায়*
প্রাণ ভয়ে পুজে তারে যত লোকজন।। বিদেশী পাইলে সেই করতো ভক্ষণ*[১৪৫]

সীতাকে রাবণ অশোকবনে বন্দি করে রেখেছে। অন্যদিকে চাম্পাবতীকে তার পিতা দক্ষিণানগরের প্রাসাদে বন্দি রেখেছে। রামচন্দ্র এবং গাজি অনেক যুদ্ধ, দুঃখযন্ত্রণার পর তাঁদের প্রাণের মানুষকে ফিরে পেয়েছেন। রামের বানর সেনার মতোই গাজির বাঘ সেনা শক্তিশালী। প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্য রাম বাধ্য হয়েছেন সীতাকে বিসর্জন দিতে। একজন ফকির হয়ে নারীর কাছে নিজেকে ধরা দেবেন সেটি গাজির কাছে লজ্জার। তাই রামের মতো গাজিও লোকাপবাদের ভয়ে চাম্পাবতীকে ত্যাগ করেছেন।

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে মহাভারতের প্রভাবও লক্ষ করা গিয়েছে। প্রথমেই রয়েছে-

প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরঞ্জন।। এতিন ভুবনে যত তাহার সৃজন*
সৃজিয়া সকল জীবে আহার যোগায়।। সুখ দুঃখ রোগ মৃত্য তাহার আজ্ঞায়*
মৃত্তিকা গগনে নাহি তাঁর সমতুল।। পুজিবার যোগ্য সেই সকলের মুঅ*
তাঁহার বর্ণনা করি কিবা শক্তি মোর।। পতিত পাবন প্রভু করুণা সাগর*
মহা মহা পাপী কত আমার সমান।। দয়া করি উদ্ধারিয়া স্বর্গে দিবে স্থান*[১৪৬]

আল্লা সবার থেকে বড়ো। জগতে যা কিছু ঘটছে সব তাঁর ইচ্ছেতেই হচ্ছে। উপরের উদ্ধৃতিটি পড়লে *কাশীদাসী মহাভারত*-এর 'অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের যোগ কথন' অংশের প্রভাব প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

কে কারে মারিতে পারে কেবা কার অরি।

সবারে সংহারি আমি, আমি সব করি।।

... ... ...

মৃত সব সৈন্য এই জানিহ নিশ্চয়।।
নিমিত্ত মাত্রক হও সব্যসাচী তুমি।
সব সৈন্য দেখ বধ করিয়াছি আমি।।[১৪৭]

মহাভারতে কর্ণের মতো শিশু কালুও নদীর জলে ভাসমান অবস্থায় এসে অজুপা এবং সেকেন্দরের কাছে একটি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছিলেন। মাতা কুন্তি অবিবাহিত অবস্থায় পুত্র কর্ণকে পেয়ে জলে ভাসিয়ে দিয়েছেন। কুন্তী কর্নকে বলেছেন-

আমার নন্দন তুমি সূর্য্যের ঔরসে। যখন ছিলাম আমি জনকের বাসে।।[১৪৮]

অধিরথ ও রাধা জলে ভেসে আসা কর্ণকে পেয়ে পুত্র স্নেহে মানুষ করেছেন বলে কর্ণ একটি নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন। কর্ণের জলে ভেসে আসার একটি কারণ পাওয়া গেলেও কালুর জলে ভেসে আসার কোনো কারণ জানতে পারা যায় না। অজুপা জুলহাসকে হারানোর পর বেদনায় কাতর ছিলেন। তাই ফুটফুটে একটি শিশুকে দেখে বুকে তুলে নিয়েছেন।

এমন সময় এক সিন্দুক কাঠের।। ভাসিয়া আসিতে ছিল তাহাদের ঘাটে*

... ... ...

খুলিয়া দেখেন সেই সিন্দুকের মাঝে।। চাঁদের মতন এক শিশু রহিয়াছে*[১৪৯]

*কাশীদাসী মহাভারত*-এ 'নৃসিংহাবতার ও হিরণ্যকশিপু বধ' অংশে প্রহ্লাদের বিষ্ণুভক্তি পিতা হিরণ্যকশিপু মেনে নিতে না পারায় তার ক্রোধ চরমে উঠেছে। তাই পুত্রকে কঠিন শাস্তি দিয়ে বধ করতে চেয়েছেন। একে-একে তার সৈন্যদেরকে দিয়ে পুত্রের উপর অস্ত্রাঘাত করলেও কিছুতেই নিধন করতে পারে নি।

প্রহ্লাদে বেড়িল আসি যতেক বারণ। আজ্ঞামাত্র ধরিল যতেক দৈত্যগণ।।
অঙ্কুশ আঘাতে দন্ত দিল দন্তী গুলা। অঙ্গে ঠেকি ভাঙ্গে যেন সুকোমল মূলা।।
... ... ...
একান্ত আছয়ে যার নারায়ণে মতি। তাহার করিতে মন্দ কাহার শক্তি।।
... ... ...
ইহা শুনি যত দৈত্য প্রহ্লাদে লইল। বিষম অনল জ্বালি তাহাতে ফেলিল।।
কৃষ্ণ বলি অগ্নি-মাঝে পড়া মাত্র শিশু। শীতল হইল বহ্নি না হইল কিছু।।
... ... ...
সবে মিলি গিরি-শিরে প্রহ্লাদেরে তুলি। অবনীমন্ডলে তারে ফেলাইল ঠেলি।।
পড়ে শিশু নারায়ণ চিন্তিয়া অন্তরে। বালক শুইল যেন তূলার উপরে।।[১৫০]

হিরণ্যকশিপু পুত্র প্রহ্লাদকে মারতে নানা উপায় অবলম্বন করলেও কিছুতেই তার একবিন্দু ক্ষতি করতে পারেনি। অচল কৃষ্ণভক্তির জোরে সে বারবার রক্ষা পেয়েছে। মল্লগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রহ্লাদের কোনো ক্ষতি হয়নি। তাঁকে মারতে যজ্ঞ হলে ব্রাহ্মণরাই পুড়ে গিয়েছে। কালসাপ এনে দগ্ধ করালে পরম তেজ প্রহ্লাদের শরীরে থাকায় তাঁর কোনো ক্ষতি হয়নি। পাষাণ গলায় বেঁধে সমুদ্রে ফেললে কৃষ্ণের কৃপায় পাষাণ জলে ভেসে উঠেছে।

সেকেন্দর তাঁর রাজ্যের ভার পুত্র গাজির উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চেয়েছেন। কিন্তু গাজির ইচ্ছে ছিল ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়া। তাঁর এমন সিদ্ধান্তে পিতার ক্রোধের সম্মুখীন হয়েছেন। সেকেন্দারের ক্রোধটি ছিল মহাভারতের হিরণ্যকশিপুর ক্রোধের সমান। কুপুত্র থাকার থেকে সন্তান থাকারই প্রয়োজন নেই বলে তিনি মনে করেছেন। তাই তাঁকে নিধন করতে নানা অমানবিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন।

কু-পুত্র হইত ভাল না থাকে সন্তান।। এখন কাটিব তোরে করে খান খান*
জল্লাদ ডাকিয়া শাহা কহেন রুষিয়া।। আমার সমুখে একেও ফেলহ কাটিয়া*
... ... ...

তলওয়ার খুলিয়া মারে গাজীর কণ্ঠিতে।। আল্লাকে স্মরণ গাজী করে জোড় হাতে*
সদয় হইল আল্লা গাজীর উপর।। আইল আকাশ বাণী ভয় কিবা তো।।

... ... ...

যখন জল্লাদ আসি গাজীকে মারিল।। খোদার আজ্ঞায় চোট কনঠে না লাগিল*

... ... ...

দেখে সাহা সেকেন্দার বলে ক্রোধ হইয়া।। বড় বড় দশ হাতী আন সাজাইয়া

... ... ...

সুড়েতে ধরিয়া হাতী গাজীর কোমরে।। আছাড়ে কাছাড়ে দাঁত সর্ব্ব অংগে মারে*.

... ... ...

একতিল বেথা নাহি অংগে লাগে তার।। ভাংগিল হাতীর দাঁত পদ ভাংগে আর*[১৫১]

এরপর সেকেন্দর কাঠ, বাঁশ এনে আগুনের কুণ্ড করে তাতে গাজিকে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গাজি বিপদে পড়ে আল্লাকে ডেকেছেন। আল্লা গাজির ডাক শুনে তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন।

মেহেরবান হয়ে আল্লা গাজীর পরেতে।। অগ্নিকে করিল মানা তাহাকে পোড়াতে*
চারিদিকে জ্বলে অগ্নি দাউ দাউ করি।। গাজীর গায়েতে তাও নাহি লাগে তারি*[১৫২]

গাজির এমন ক্ষমতা দেখে সেকেন্দর পুত্রকে বড়ো যাদুকর ভেবেছেন। তাই পুত্রকে নিধন করার আরও কঠিন উপায় অবলম্বন করেছেন। দশমণ পাথর তার সঙ্গে বেঁধে সাগরেতে ফেলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গাজির ভরসা কেবলমাত্র আল্লা। তাই তিনি তাঁকে ডেকেছেন। গাজির ডাক শুনে আল্লা তাঁর প্রতি সদয় হয়েছেন।

সদয় হইল শূনে গাজীর ফরিয়াদ।। খসিয়া পড়িল যত বন্দনের ফাদ*
আল্লার আদেশে শিলা ভাসিয়া উঠিল।। তাহার উপরে গাজী উঠিয়া বসিল*[১৫৩]

অচল ঈশ্বরে ভক্তি কীভাবে ভক্তকে উদ্ধার করে তা মহাভারত এবং *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* উভয় কাহিনিতেই রয়েছে এবং প্রহ্লাদ কৃষ্ণভক্তির জোরে যে-ভাবে উদ্ধার পেয়েছেন গাজিও সেভাবে আল্লার প্রতি অবিচল ভক্তির জোরে পিতা সেকেন্দারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর কেচ্ছায় রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। বাকানন্দের মৃত্যুতে আকানন্দ শিবের ধ্যানে বসেছেন।

বহুত কান্দিয়া রাজা ভায়ের খাতের।। কৈলাশ পথে ধিয়ানেতে বসিল শবের*
কতক্ষন এইরূপে করিল সাধন।। মহাদেবে তারপরে হইল স্মরণ*[১৫৪]

মুসলমান কবির লেখা কেচ্ছা-কাহিনিতে শিবের মাহাত্ম্য কীর্তিত রয়েছে। আকানন্দ মহাদেবকে খুশি করতে সিদ্ধি খাইয়েছে। শিবের বর পেয়ে আকানন্দ ও বাকানন্দ দুই রাক্ষস অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। তারা প্রত্যহ মানুষ আহার করে এবং একসঙ্গে লড়লে ব্রহ্মা সহ ত্রিভুবনের সমস্ত দেবতা কম্পিত হয়। শিব নিজের জটা থেকে চক্রবাণ বের করে আকানন্দকে দিয়েছে। সেই অস্ত্র দিয়ে আকানন্দ গোরাচাঁদের অর্দ্ধেক গলা কেটে ফেলেছে এবং কিছু দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। খোদা নেওয়াজ গঙ্গার মর্তে আগমনের বিষয়েও দীর্ঘ কাহিনি বর্ণনা করেছেন। কবির বর্ণনায়-

ভগীরথ গিয়াছিল গঙ্গাকে আনিতে* পথেতে আসিতে গঙ্গা ঠেকিল পর্ব্বতে।।[১৫৫]

গঙ্গার মর্তে আগমন প্রসঙ্গটি মহাভারতে রয়েছে। কবির ভাষায়-

ভগীরথ প্রতি বলিলেন ভাগীরথী।
তোমার কারণে আমি আইলাম ক্ষিতি।।[১৫৬]

জলে পাথর ভেসে আসার ঘটনা রামায়ণে রয়েছে। রাম সেতুবন্ধন করেছেন।[১৫৭] *পীর গোরাচাঁদ*-এর কেচ্ছায় পাথর ভেসে আসতে দেখে পির সেখানে উপস্থিত হয়েছেন। এখানেও সেতুবন্ধনের কথা রয়েছে।

সাত পাথর বান্ধিয়া লইল কুতুহলে।। ভাসিয়া চলিল পাথর দরিয়ার জলে*
সুবাও পাইয়া পাথর ছুটে যেন তীর।। তার উপর আসন করেন গোরাই পীর*
গাঙ্গে যখন ভাটা হয় উজান ঠেলি আইসে।। বিলম্ব না করে পাথর পানির উপর ভাসে*
পানির ডাক অতিশয় আওয়াজ বড় শুনি।। আকুল সমুদ্র বয়ে আইল ত্রিবেণী*
ক্ষনে ডুবে ক্ষনে ভাসে ক্ষনে করে লুকি।। কখন কোথায় থাকে কিছুই না দেখি*
সাত পাথর সারি২ চলে পাটে২।। আসিল ঠেকিল পাথর মীরখাঁর ঘাটে*[১৫৮]

সত্যনারায়ণের কবিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের মতো করে কাব্যরচনা করতে চেয়েছেন। তাই তাঁদের কাব্যে সেইসব গ্রন্থের প্রতক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব রয়েছে। তাঁরা কাহিনি কিছুটা এক রেখে চরিত্র বদলে দিয়ে ঘটনা পরিবর্তন করেছেন, কিন্তু কবি শ্রী কবিবল্লভ একেবারেই উদাহরণ হিসেবেই রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি তুলে ধরেছেন।

কুন্তলা বলেন কান্ত করি নিবেদন। পাসায় হারিলে জবে যুধিষ্ঠির রাজন।।
দুস্বাসনে অনুমতি দিলেন রাজন।  দ্রৌপদিরে সভামাঝে করি বিবসন।।
আতঙ্গে দ্রৌপদি সতী গোবিন্দে স্বঙরে। বাঞ্ছ কল্পতরু প্রভু দয়া কর মোরে।
সত্যভামা সঙ্গে কৃষ্ণ পাসা খেল্যাছিল। দ্রৌপদি স্বঙরন করে গোবিন্দ জানিল।।
সেই মোট আমি জদি হরি প্রাণপতি। তুমি মোর কৃষ্ণ হবে আমি সে দ্রৌপদি।।[১৫৯]

মুসলমান কবিগণ একদিকে পৌরাণিক মহাকাব্যের কাহিনি অন্যদিকে লোকদেবতাকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনি একত্র মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তবে চরিত্রগুলি রামায়ণ ও মহাভারতের আদর্শে সৃষ্ট হলেও কোনো চরিত্রকে কোনো বিশেষ চরিত্রের অনুরূপ তিনি করেননি। যখন যে-ভাবে কাহিনি অগ্রসর হয়েছে সেভাবে পৌরাণিক চরিত্রগুলির সঙ্গে তুলনা হয়েছে। আবার পৌরাণিক কাহিনিগুলিও নিজের মতো করে সংযোজন করেছেন। পৌরাণিক মহাকাব্যের আদর্শ গ্রহণ করে নাটকীয়তা সৃষ্টি এবং কাহিনিকে বিশেষ গতি দান করেছেন। তাঁরা গ্রন্থগুলিকে হয়তো মহাকাব্যের মর্যাদা দিতে চেয়েছেন।

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনিগুলিকে মহাভারতের সমান মর্যাদা দেওয়া যায় না। রামায়ণ ও মহাভারত বিশালতার দিক থেকে বৃহৎ। সেখানে নানা কাহিনি ও উপকাহিনি রয়েছে। কাহিনির মধ্যে সমাজ, রাজনীতি, কূটনীতি স্থান পেয়েছে। তবে রামায়ণ, মহাভারতের কয়েকটি চরণের মিল লক্ষ করা গেলেও কবিদের কাব্যরচনায় মৌলিকতা রয়েছে। দেবেশ আচার্য বলেছেন-

মহাকাব্যের বিশেষ লক্ষণ এই যে তা কোন ব্যক্তির সুখ দুঃখের কাহিনি নয়, মহাকাব্যের রস সামগ্রিক এবং সার্বজনীন। কোনো খণ্ডিত চিত্তবৃত্তির প্রকাশ মহাকাব্য নয়। সর্বযুগের সর্বকালের সকল শ্রেণির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কাহিনি মহাকাব্যে রূপায়িত হয়। বহু ঘটনা সেখানে ঘটে, বহু কাহিনি সেখানে বিস্তারিত হয়, বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের বিচিত্র চিত্তবৃত্তির প্রকাশ থাকে সেখানে এবং সবগুলি আলঙ্কারিক রসের পরিপুষ্টি যেখানে হয় তখন তা হয়ে ওঠে ‘মহাকাব্য’।[১৬০]

সমসাময়িক সমাজ ও জীবনকে অতিক্রম করতে পারেনি বলে মহাকাব্য হয়ে উঠতে পারেনি। তবে বলা যায় না মঙ্গলকাব্যের কবিগণ রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনি অনুসরণ করেছেন বলেই কেচ্ছা-কাহিনির কবিগণ করেছেন। আসলে রামায়ণ, মহাভারত এমনই গ্রন্থ যেগুলির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

বৃন্দাবনদাস (জন্ম- আনুমানিক ১৫১৯ খ্রি.) *চৈতন্য ভাগবত*-এ (গ্রন্থ সমাপ্তিকাল- আনুমানিক ১৫৪২ খ্রি.)[১৬১] সাধুজনদের রক্ষা করা এবং দুষ্টদের বিনাশ করবার জন্য কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণের চৈতন্যদেব রূপে জন্মগ্রহণের কথা বলেছেন। কারণ কলিযুগ পাপে ভরে গিয়েছে।

ধর্ম পরাভব হয় যখনে যখনে
অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে দিনে
সাধুজন রক্ষা দুষ্ট বিনাশ কারণে
... ... ...
তবে প্রভু যুগ ধর্ম স্থাপন করিতে
যুগে যুগে অবতীর্ন হয়ে পৃথিবীতে।।[১৬২]

দ্বিজ রামধন সত্যনারায়ণের জন্মের একই কারণ দেখিয়েছেন। সেখানে পুত্র তার বাবাকে মান্যতা দেয়নি। ব্রাহ্মণকে সকলে নিন্দা করেছে। নারী স্বামী ব্যতীত অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণকে কুকর্ম করতে দেখা গিয়েছে। মানুষের মধ্যে জ্ঞানহীনতা দেখা দিয়েছে। সর্ব বর্ণ একাকার হয়ে গিয়েছে। অকুমারী নারীরা শৃঙ্গার প্রার্থনা করেছে। বিধবার পুত্র লাভ হয়েছে। এইভাবে কলিতে বড়ো অলক্ষণ দেখা দিলে সত্যনারায়ণের জন্ম নেওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে।

হেন কলি যুগে আমি হব অবতার। সত্যদেব বলি নাম হইবে প্রচার।।
হিন্দুতে বলিবে নাম সত্য নারায়ণ। সত্যপীর বলি নাম কহিবে যবন।।
হিন্দু আর মুসলমান দুই জাতি লয়ে। নাসিব কলির দুঃখ অবতার হয়ে।।[১৬৩]

এছাড়া কৃষ্ণদাস কবিরাজের *শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত* (আনুমানিক ১৫৯০-৯২ খ্রিষ্টাব্দের পর চৈতন্যচরিতামৃত রচিত হতে আরম্ভ করে)[১৬৪] গ্রন্থের প্রভাব রয়েছে গাজির কাহিনিতে। সেখানে বলা হয়েছে রাধাকৃষ্ণ এক লীলার প্রয়োজনে তারা আলাদা রূপ ধারণ করেছে।

রাধা কৃষ্ণ এক আত্মা দুই রূপ ধরি
অন্যন্যে বিলাস রস আস্বাদন করি।[১৬৫]

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে এই ধারণার ছাপ একটু হলেও দেখতে পাওয়া যায়।

যেমন সুন্দর গাজী তেমন সুন্দরী*
এক দেহ পড়েছে ওগো দুভাগ হইয়া।।[১৬৬]

গাজি ও চাম্পাবতী ঘুমন্ত অবস্থায় পাশাপাশি শুয়ে থাকলে পরিদের তাঁদের দুজনকে এক দেহ বলে মনে হয়েছে। উপরের আলোচনা সূত্রে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মুসলমান কবির লেখা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক সাহিত্যে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ ও অল্প পরিমাণে চরিত সাহিত্যের প্রভাব রয়েছে।

## ৩.ঘ. *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* ও নাথ সাহিত্য:

সুকুমার সেনের মতে আদি নাথ গুরু মৎস্যেন্দ্র ও স্থানীয় পির মসনদ-আলি দুইজনে মিলিত হয়ে হয়েছেন মছন্দলী বা মোছরা পির। পূর্ববঙ্গে মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ও সত্যনারায়ণ তিনজন মিলিত হয়ে হয়েছেন ত্রিনাথ অথবা ত্রৈলোক্যপির।[১৬৭]

*গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র সঙ্গে নাথ সাহিত্যের কাহিনিগত সাদৃশ্য খানিকটা লক্ষ করা গিয়েছে। তারই ভিত্তিতে এই সাহিত্যের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে। মীননাথ কদলী রাজ্যে গিয়ে ভোগবিলাসে দিন কাটাতে লাগলেন সমস্ত জপ, ধ্যান বাদ দিয়ে। তাঁর শিষ্য গোরক্ষনাথ গুরুকে উদ্ধার করার জন্য কদলী রাজ্যে গিয়েছেন। সেখানে গিয়ে গুরুর বিস্মৃত মহাজ্ঞান স্মরণ করিয়ে, সংসারের মোহ কাটিয়ে, যোগ সন্ন্যাসের পথে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। কিন্তু মীননাথ সহজে স্ত্রীপুত্র, সংসার ছাড়তে পারছিলেন না। গোরক্ষনাথ নিরুপায় হয়ে কদলী রাজ্যের রমণীদের বাদুড় করে দিয়েছেন।[১৬৮]

গাজি রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও রাজত্ব সামলাবে না বলেই ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ধনসম্পত্তি, রাজসুখ কোনো কিছুর প্রতিই তাঁর আসক্তি নেই। অথচ সেই গাজি চাম্পাবতীর রূপে নিমগ্ন হয়ে গিয়ে তাঁর সমস্ত দৃঢ়তা বিসর্জন দিয়েছেন। মটুক রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর কন্যাকে জয়লাভ করে বিবাহ করেছেন। বিবাহ করে গাজি সর্বক্ষণ চাম্পাবতীকে নিয়ে দাম্পত্যসুখ ভোগ করেছেন।

> খাইয়া শুইল গাজী চামপার ভবনে।। হেন কালে চামপাবতী প্রফুল্ল বদনে*
> সূগন্ধি পানের খিলী সহস্তে গড়িয়া।। পতির মুখেতে সতী দিলেন তুলিয়া।।
> হরিষে পালংগ পড়ে করিয়া শয়ন।। চুম্বিলেন দুইজনে দোহার বদন*
> আনন্দ দিলেন দেখা নিরানন্দ গেল।। পাইল যতেক কষ্ট সব পাশরিল*
> ডুব দিয়া দুইজনে সুখের সাগরে।। নানামতে রতি খেলা নিত্য নিত্য করে*[১৬৯]

গাজির সঙ্গে কালুও রাজসুখ ত্যাগ করে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। ভ্রাতার এইরূপ নারীসঙ্গ কালু কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। কালু ভাবতে লাগলেন গাজি সংসারবদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এই জাল কাটা তার সাধ্য নেই। ফকির হওয়া তার বিফলে গিয়েছে। সংসারবাসনা থাকলে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়ার দরকার ছিল না। কালু তাকে সংসারের মায়া কাটানোর চেষ্টা করেছেন। তাই সর্বক্ষণ বুঝিয়েছেন গাজিকে। কালু বোঝান গাজির অন্তরে যদি এক প্রেম থাকে তবে নারীকে কী দেবেন আর খোদাকে কী দেবেন। একটি সন্তান হলে তার মায়া বেড়ি লাগাবে। পুত্রের মুখ দেখলে খোদার প্রতি ভালোবাসা অর্ন্তদ্ধান হবে। গাজিকে বোঝাতে কালু কোরানের বাণী শুনিয়েছেন। মীননাথ যেমন গোরক্ষনাথের সহায়তায় সংসার থেকে নিজেকে মুক্ত করেছেন গাজিও তেমনি কালুর উপদেশ শুনে সংসারত্যাগ করার সিন্ধান্ত নিয়েছেন। গাজি শেষপর্যন্ত বলেছেন-

> বন্দীত নাহিক আমি নারীর পিরীতে।। নারী কি ধরিয়া মোরে পারিবে রাখিতে*
> শোন ভাই রাত কালে আমি চলে যাব।। রাজা রাণী কার কাছে কিছু না বলিব*
> নিদ্রা গেলে চাম্পাবতী নিশা রাতকালে।। চাম্পাকে নিদ্রায় ফেলি মোরা যাব চলে*[১৭০]

মীননাথ কদলী রাজ্য ত্যাগ করার সময় সেখানকার রাজকন্যারা তার পথ আটকালে গোরক্ষনাথ তাদেরকে বাদুড় করে দিয়েছেন। অপরদিকে গাজি মটুক রাজার রাজ্য থেকে চলে যাবার পরিকল্পনা করলে, চাম্পাবতী তা জানতে পেরে, অনেক অনুনয় করেছেন। তিনি গাজি কালুর অনুবর্তিনী হলে উভয়েই বিব্রত হয়েছেন। ফকিরের সঙ্গে নারী দেখলে লোকে হাসবে। চাম্পাবতীকে গাজি নিজের সাধনার পথে জঞ্জাল ভেবেছেন। সেইজন্য গাজি তাঁকে ফুক দিয়ে হরিদারফুল বানিয়ে দিয়েছেন। এই পর্যন্ত কাহিনি নাথ সাহিত্যের সঙ্গে মিল পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তারপরেও দেখা যায় গাজি তাঁকে ছাড়েননি। হরিদারফুলটি সঙ্গে নিয়েই ঘুরে বেড়িয়েছেন আর প্রয়োজন মতো মানুষ করে নিয়েছেন। তিন বছর এইভাবে চলার পর গাজি চাম্পাবতীকে শেওড়া গাছ বানিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন এবং কিছুদিন পরে তাঁকে নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরেছেন।

গোপীচন্দ্র ময়নামতির কাহিনির সঙ্গে হুবহু অনুকরণ লক্ষ করা গিয়েছে। মাতা ময়নামতীর সিদ্ধিলাভ প্রমাণের জন্য গোপীচন্দ্র গলায় পাথর বেঁধে দেওয়ার মতো নানা অমানুষিক নির্যাতন করেছেন। যে ঘটনাটি ঘটেছে গাজির উপর তাঁর পিতার অমানুষিক

অত্যাচার করার সময়। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া সম্পাদিত বাঙলা সাহিত্যে *গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান* গ্রন্থে আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র কাহিনি প্রসঙ্গে বলেছেন-

> নাথ সাহিত্যের গোপীচন্দ্র-ময়নামতির কাহিনী ও হিন্দু পুরাণের হিরণ্যকশিপু-প্রহ্লাদের কাহিনীর অন্ধ অনুকরণে এসব উপ-কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে।[১৭১]

## ৩.ঙ. কবিগান ও পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক পালাগান:

অষ্টাদশ শতকে কবিগান বাংলা জুড়ে প্রভাব বিস্তার করেছে। এইসব গায়কদের বলা হত 'কবিওয়ালা'।[১৭২] কবিগানের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে অথচ পালাগান সেই স্থান পায়নি। কবিগানে দু-দলের কবির মধ্যে হারজিতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে গানের মাধ্যমে। সাহিত্য অপেক্ষা শব্দচাতুর্য, রসরুচি, স্থূল আদিরসকে তারা বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সঙ্গীতের বিষয় ছিল ধর্ম সংক্রান্ত রাধাকৃষ্ণের কাহিনি। এরপর তারা বিরহ, সখীসংবাদ, আগমনি, ও ভবানী বিষয়ক গান রচনা করেছে। পরবর্তী কালে দুই কবি দলের মধ্যে বাগ্‌যুদ্ধ চলত যেখানে অশ্লীল কথা, খিস্তি-খেউড় প্রবেশ করেছে নির্দ্বিধায়। কবিওয়ালারা সাধারণত বাংলার বিত্তবান ও ভূস্বামীদের ভবনে কবিগান করেছে। নিধুবাবুর সৃষ্ট টপ্পা গান আধুনিক কালেও সমান আদরণীয়। কবিওয়ালা আধুনিক রুচির দিকে তাকিয়ে তাদের একটা জায়গা করে নিয়েছে। আধুনিক রুচির দিকে তাকিয়ে তারা গানের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছে।[১৭৩] তাই তারা তাদের পেশাটাকে একটি জনপ্রিয় জায়গায় দাঁড় করাতে পেরেছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাই কবিগানের আমরা পরিচয় পাই। কিন্তু লোকদেবতাকেন্দ্রিক পালাগানগুলির জনপ্রিয়তা ছিল না তা নয়। আসলে মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের নিয়ে করা গানের মতোই পির, ফকির, বিবির গানগুলি গাওয়া হয়েছে। তাই উজ্জ্বল ভাবে সেগুলিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। যদিও পরবর্তীকালে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে, সেখানে পালাগানের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

## ৩.চ. মান্য সাহিত্যের নিরিখে কেচ্ছা-কাহিনিগুলির পর্যালোচনা:

মানুষের জীবনে একঘেয়েমি এলে, তা থেকে মুক্তির উপায় খোঁজে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পালাবদলের মাধ্যমে নতুনত্ব এসেছে। এই তত্ত্বে মধ্যযুগের দেবদেবী নির্ভর সাহিত্যগুলি

মানুষকে আর নতুনত্বের স্বাদ দিতে পারছিল না। তাই উনিশ শতকে সাহিত্যে নবজাগরণ এলে মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠেছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-

> আধুনিক বাংলা সাহিত্যে চণ্ডী, মনসা, বাসুলীর স্থানে মানুষের কথা প্রধান হয়ে ওঠে। দেবতার স্থানে দুঃখনির্ভর মানবজীবনের অশ্রু বেদনার পুলকানুভূতিপূর্ণ বাস্তব কাহিনি উঠে আসে। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য থেকে দেবদেবীরা দল বেঁধে বিদায় নেন নি। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, গিরিশ্চন্দ্র, এঁদের বেশিরভাগ সাহিত্য পৌরাণিক কাহিনি নির্ভর। সেখানে দেবতাদের উপর মানবধর্ম চাপানো হয়েছে।[১৭৪]

রেনেসাঁস (পুনর্জন্ম), রিফর্মেশন (সংস্কার যুগ অর্থাৎ ধর্মসংস্কার, যে ধর্মসংস্কার সমস্ত কুসস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী) ও রেস্টোরেশন (পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ) এই জীবনবোধগুলি ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।[১৭৫] বাংলা সাহিত্যে সূচনা হয়েছে গদ্যের যুগ। জন্ম হয়েছে উপন্যাস, প্রহসন, নাটক, ছোটোগল্প, প্রবন্ধ, সমালোচনাধর্মী লেখা। ভারতবর্ষে ইংরেজরা আসার পর জনগণের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে। মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বদেশচিন্তা গড়ে উঠেছে। সাহিত্যে দেববাদ এবং ভক্তিরসের স্থানে মানুষ এবং মানবতাবাদ লক্ষ করা গিয়েছে। তারফলে অলৌকিকতার স্থানে এসেছে বাস্তবতা। ভারতচন্দ্রের *অন্নদামঙ্গল* কাব্যে এই আধুনিকতার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া গিয়েছে।

বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের হাত থেকে বিভিন্ন ধরণের উপন্যাসের জন্ম হয়েছে যেমন- রোমান্স, আত্মজীবনীমূলক, আঞ্চলিক, ঐতিহাসিক, কারা, গোয়েন্দা বা অপরাধমূলক, গথিক, চেতনাপ্রবাহমূলক। বটতলার সাহিত্যের জন্ম হয়েছে যেখানে খুবই নিম্নমানের মুদ্রণযন্ত্রের সাহায্যে অল্প খরচে বই ছাপা হয়েছে। এখান থেকে সমাজের খুব সাধারণ মানুষের কাহিনি গল্প বা উপন্যাসের মাধ্যমে উঠে এসেছে। যৌনতার কথা অবলীলায় এই সমস্ত মুদ্রণযন্ত্র থেকে ছাপানো হয়েছে। সাধারণ মানুষের বিনোদনের বিষয় হয়ে উঠেছে এই সমস্ত গ্রন্থ। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যখন এত বড়ো পালাবদল চলেছে ঠিক সেই সময় চব্বিশ পরগনায় বিভিন্ন পির-গাজি-বিবি এবং ফকিরকে নিয়ে রচিত হয়েছে ‘পুথি’, ‘পাঁচালি’ নাম দিয়ে বিভিন্ন কেচ্ছা-কাহিনি। এই সমস্ত কাহিনি কিছু পাঠকের মনের চাহিদা মিটিয়ে ছিল নিশ্চই। তা না হলে এতগুলি গ্রন্থ ছাপা হত না।[১৭৬] এই সমস্ত গ্রন্থে প্রচুর আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি শব্দের ব্যবহার হয়েছে। কবি বাংলা অন্বয়রীতি ব্যবহার করেছেন। ভাষার অলংকার প্রয়োগ করেছেন।

বাক্যও খুব একটা দীর্ঘ নয়। মূদ্রণযন্ত্রের দোষে বানানে কিছু ভুলভ্রান্তি আছে সেটি বোঝা যায়। আর এই ত্রুটির জন্যই বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থগুলি ঠাঁই পায়নি।

কিছু কবি বা পালাগায়ক আছেন যাঁরা পালাগান নিয়ে মেতে থেকেছেন। বিভিন্ন আসরে পালাগান করেছেন এবং পালাগান শিখিয়েছেন। প্রয়োজন বোধেই তাঁরা লোকদেবতা কেন্দ্রিক কাহিনি রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে যে এত পালাবদল হয়ে গিয়েছে তার খোঁজ হয়তো তাঁরা রাখেননি। রাখলে সেই সমস্ত সাহিত্যের প্রভাব পড়ত। কিংবা যদিও তাঁরা আধুনিক যুগের সাহিত্যের খোঁজ রাখতেন তবে পালাগানের কাহিনির সঙ্গে তার কোনো বিরোধ কিংবা সংযোগ নেই। তাঁরা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, গানগুলি যদি তাঁরা না-লিখে রাখেন, তবে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যাবে। একদল শিল্পী যাঁদের জীবিকা এই পালাগান গাওয়া, তাঁরা যদি তাঁদের শিল্পকর্ম না-লিখে রাখেন কিছুকাল পরে এগুলির কথা মানুষ ভুলে যাবে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, আধুনিকতার আঁচ তাঁদের সন্তানদের মধ্যেও লাগতে শুরু করেছে। তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম পড়াশোনা শিখে চাকুরি করতে চেয়েছে। গ্রামেগঞ্জের মানুষ অন্য কাজের সন্ধানে শহরমুখী হয়েছে। লোকদেবতাকেন্দ্রিক কাহিনিগুলি নিয়ে যে এক সময় বেশ চর্চা হত, তা বলা যায়। তবে সমস্ত কাহিনির মুদ্রিত রূপ পাওয়া গেলে একটি বড়ো ইতিহাস পাওয়া যেত তা নিশ্চিত করে বলা যায়। শুধু তাই নয় এগুলির চর্চার মধ্য দিয়ে বড়ো সাহিত্যগুণ সম্পন্ন কবির পরিচয় পাওয়া যেতে পারত।

কবিরা নিজেদেরকে বারবার হীন, দুঃখী বলেছেন। বৈষ্ণব বিনয় বশত হয়তো তাঁরা এইরূপ বলেছেন ভাবা যেতে পারে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গিয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ে গড়ে ওঠে ভারতবর্ষ এবং মুসলমানদেরকে নিয়ে গড়ে ওঠে পৃথক রাষ্ট্র। অনুমান করা যেতে পারে হিন্দু ও মুসলমান ভেদাভেদ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে লোকদেবদেবীকেন্দ্রিক কাহিনি রচনার ধারা নিমেষে ভেঙে গিয়েছে। লোকমুখে শোনা যায় আগে পিরেরা বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করত আর জোরে জোরে বলত ‘মুশকিল আসান’। এখন সেই ডাক কমই শুনতে পাওয়া যায়। তবে গবেষণা চলাকালীন এই রকম পিরের সন্ধান পেয়েছি যারা পিরের নাম করে গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে বেড়ায়। তবে তারা ভেকধারী কিনা সন্দেহ আছে।[১৭৭]

পির-গাজি-বিবি কাহিনিগুলির রচয়িতারা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের রীতি অর্থাৎ মঙ্গলকাব্য কিংবা অনুবাদ সাহিত্যের মতো পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচনা করেছেন। তাঁরা ধর্মীয় আখ্যানকাব্য রচনায় হাত দিয়েছেন মনে করে মধ্যযুগীয় ধর্মকেন্দ্রিক আখ্যান অনুসরণ করা শ্রেয় ভেবেছেন। তবে একথা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও ভাবা যেতে পারে যে কবিগণ আধুনিক যুগের সাহিত্যের সঙ্গে একেবারেই পরিচিত ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যে যেখানে বড়ো পালাবদল ঘটে গিয়েছে সেখানে কবিরা এসব উপেক্ষা করে ছিলেন।

সুকুমার সেনের *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থ[১৭৮] (১৯৯৩) থেকে জানা যায় হিন্দু দেবদেবী মুসলমান পির ও পিরানে পরিবর্তন হয়েছে অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে। তা হলে বলাই যায় অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে এই সমস্ত মিশ্রলোকদেবতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি রচিত হয়েছে। লোকদেবতাকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রভাব না পড়ে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে তার আরেকটি কারণ ভাবা যেতে পারে। সেসময় গ্রামে গঞ্জে চণ্ডীমণ্ডপে রামায়ণ ও মহাভারত সুর করে পড়া হত, তাই সেইসব কাহিনি প্রায় সকলেরই জানা ছিল। অপরদিকে মনসা, চণ্ডীর গীত অনেক আগে থেকেই গ্রাম বাংলায় মানুষের চিত্তহরণ করেছে। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ১০ই জানুয়ারি শ্রীরামপুর ব্যপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠা হয় এবং মার্চ মাসে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেসের কাজ আরম্ভ হয়েছে। এই প্রেস থেকে কৃত্তিবাসিরামায়ণ ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে এবং *কাশীদাসী মহাভারত* ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম প্রকাশ পেয়েছে।

এখনও পর্যন্ত গ্রাম বাংলায় যদি খোঁজ নেওয়া যায় অশিক্ষিত কিংবা অল্পশিক্ষিত মানুষজন লোকদেবদেবী নিয়ে মেতে আছেন। তাঁরা হয়তো লোকদেবদেবীকেন্দ্রিক পালাগানগুলি গেয়ে দেবেন, কিন্তু 'পুথি' বা 'পাঁচালি' নামের স্বল্প আয়তনের গ্রন্থগুলি গ্রামের খেটে খাওয়া মানুষের কাছে উপেক্ষিত হয়ে আছে। তাঁদের সন্তানেরা এখন আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি জেনে থাকবে, লোকশিল্পীরা এখনও তাদের বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছেন।

## ৩.ছ. রূপকথা ও পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক সাহিত্য:

রূপকথার গল্পের অন্তরালে রয়েছে রহস্যময় মাধুর্য। এই মাধুর্য পাঠকের হৃদয়ের গোপন কক্ষে নাড়া দিয়ে মনের অভ্যন্তরে সাড়া জাগিয়ে তোলে। আসলে কাহিনির মধ্যে রয়েছে কৌতূহল ও

রহস্য। গল্পগুলির মধ্যে রয়েছে প্রাচীনত্ব। চিরপরিচিত বস্তুগুলি অতিরঞ্জনের মধ্যে দিয়ে কাহিনির গতিধারা বয়ে যায়। কাহিনির মধ্যে রাজা ও রানির গল্প রয়েছে। গল্পে মনুষ্যেতর প্রাণীরা কথা বলে। সেখানে কেউ অবহেলিত হলে কিংবা দুঃখে দিন অতিবাহিত করলে পরিণতিতে তার দুঃখ মোচন হতে দেখা যায়। রাজা, রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্র এইসব কাহিনি শিশু মনকে যেন এক স্বপ্নের রাজ্যে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সেখানে খলনায়ক থাকবে, আকর্ষণীয় পরিবেশ থাকবে। শিশু মনের কল্পনার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়ে এক উৎকণ্ঠার সৃষ্টি করে। তাদের মন প্রসারিত হতে চায়। ছবির পর ছবি সাজিয়ে শিশুহৃদয় কল্পনার রাজ্যে অবাধে প্রবেশ করে। তারাও চায়, যে ভালো তার দুঃখ মোচন হোক এবং সুখ ফিরে আসুক। আর যে দুষ্টু, তার শাস্তি হোক। গল্পগুলি মিলনাত্মক।

কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে রূপকথাধর্মী অবাস্তব কাহিনির হদিশ আমরা পেয়ে থাকি। রাজা, রানি, রাজকন্যা, রাজপুত্র, রাজপ্রাসাদ, রাক্ষস, বড়ো বড়ো অট্টালিকা, প্রাকৃতিক বর্ণনা সেখানে রয়েছে। চরিত্রগুলির জীবনের সঙ্গে অবাস্তব কাহিনি মিশে রয়েছে। ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে সোনা, মণি মাণিক্যের আধিক্য। ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের সমাপন কাহিনির পরিসমাপ্তিতে।

রূপকথার গল্পগুলির কোনো নির্দিষ্ট লেখক ছিল না। সেখানে ঠাকুমা, দিদিমারা আপন খেয়ালে গল্প বলে গিয়েছে। তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য শ্রোতাকে আনন্দ দান। শিশু গল্প শুনতে শুনতে কল্পনার রাজ্যে বিচরণ করে তারপর নিদ্রাদেবী তাকে ঘুমের কোলে নিয়ে যায়। সেখানে সাহিত্য সৃষ্টির কোনো তাগিদ থাকে না। গল্প বলার সঙ্গে দু-পাঁচ লাইনের ছড়াও শিশুকে দোলা দিয়ে যায়। সেখানে এক একটি শব্দ মিলের প্রয়োজনে একটু বিকৃত করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে, কিন্তু তাতে শিশুহৃদয়ে আনন্দের ঘাটতি পড়ে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন-

> বাঙ্গালীর ছেলে যখন রূপকথা শোনে তখন কেবল যে গল্প শুনিয়া সুখী হয়, তাহা নহে-সমস্ত বাংলা দেশের চিরন্তন স্নেহের সুরটি তাহার তরুণ চিত্তের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাকে যেন বাংলার রসে রসাইয়া লয়।[১৭৯]

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির সৃষ্টির এবং জনসমাজে তা গ্রহণযোগ্যতার চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। এই গ্রন্থে আল্লা বড়ো হয়ে উঠেছে। নায়ক ও নায়িকারা বিপদে পড়লে

আল্লা তাদের সহায় হয়েছে। মৌখিক পরম্পরায় পালাগানগুলি জনসমাজে বিস্তার লাভ করলেও কাহিনিগুলি যখন লিখিত রূপ নিয়েছে তখন এই গ্রন্থগুলিতে নির্দিষ্ট লেখকের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে।

ভাষার ক্ষেত্রে উভয় সাহিত্যে পার্থক্য রয়েছে। পির সাহিত্যে বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের আধিক্য রয়েছে। রূপকথাধর্মী সাহিত্যগুলিতে যেটি লক্ষ করা যায় না। গঠনধর্মী বৈসাদৃশ্যের পাশাপাশি পরিবেশনগত পার্থক্য রয়েছে উভয় সাহিত্যে। পির সাহিত্যগুলি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিখিত এবং এইগুলি গান করার উদ্দেশ্যে রচিত। এগুলি দেবদেবী নির্ভর কাব্য। রূপকথাধর্মী কাহিনিগুলি ধর্মীয় নয়। সেগুলি কারোর মাহাত্ম্য কীর্তিত করবার জন্যে রচিত হয়নি।

দুই সাহিত্যের পাঠক ভিন্ন। পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক সাহিত্যগুলি সেই সমস্ত মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য যাঁরা ভগবানে বিশ্বাস রাখে। কবি সাহিত্যিকগণ ভক্তদের ডাকে সাড়া দিয়ে মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলি লিখে দিয়েছেন। সেখানে তাঁদের সাহিত্য হিসেবে কতটা গ্রহণযোগ্য, সেদিকে বেশি মনোযোগ ছিল। রূপকথাধর্মী গল্পের পাঠক শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রূপকথা নিয়ে বলেছেন-

> এই যে আমাদের দেশের রূপকথা বহুযুগের বাঙ্গালী-বালকদের চিত্তক্ষেত্রের উপর দিয়া অশ্রান্ত বহিয়া কত বিপ্লব, কত রাজ্য পরিবর্তনের মাঝখান দিয়া অক্ষুণ্ণ চলিয়া আসিয়াছে, ইহার উৎস সমস্ত বাংলা দেশের মাতৃস্নেহের মধ্যে। যে স্নেহ দেশের রাজ্যেশ্বর রাজা হইতে দীনতম কৃষককে পর্যন্ত বুকে করিয়া মানুষ করিয়াছে, সকলকেই শুক্ল সন্ধ্যায় আকাশে চাঁদ দেখাইয়া ভুলাইয়াছে এবং ঘুমপাড়ানি গানে শান্ত করিয়াছে, নিখিল বঙ্গদেশের সেই চির পুরাতন গভীরতম স্নেহ হইতে এই রূপকথা উৎসারিত।[১৮০]

রূপকথা কোন পৃথিবীতে ঘটে তার কোনো অস্তিত্ব নেই। কোনো একটি দেশের রাজা, রানি, রাক্ষসের গল্প নিয়ে রূপকথার সৃষ্টি। সেখানে মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলি আল্লার বন্দনা দিয়ে শুরু হচ্ছে। আল্লার সঙ্গে পির, গাজি, বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি রচনা করা কাহিনির মূল উদ্দেশ্য। এর উৎপত্তি হয়েছে আঞ্চলিক পরিবেশে। সেখানে আমরা আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার লক্ষ করেছি। রূপকথার গল্পগুলি সৃষ্টি হয়েছে বাংলার মা, দিদিমা, ঠাকুমাদের মুখ থেকে। তারাই যুগ যুগ ধরে বয়ে নিয়ে বেড়ায় কাহিনিগুলি।

আধুনিক সাহিত্যের সঙ্গে রূপকথাধর্মী সাহিত্যের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। রূপকথাকে বুঝতে গেলে অনুভূতি এবং কল্পনার প্রয়োজন। আধুনিক মন নিয়ে গল্পের গভীরে প্রবেশ সহজসাধ্য নয়। এগুলির মধ্যে নৈতিকতা খুঁজে পাওয়া যায়। শিশু মনে ভালো ও খারাপের বোধ জন্মায়। শিশুদের বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষামূলকও বটে। এই শিক্ষা তাদের সৃজনশীলতা এবং কল্পনার বিকাশে সহায়তা করে।

বর্তমানে রূপকথাকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় *ঠাকুমার ঝুলি, বেতাল পঞ্চবিংশতি*। সিনেমা, অ্যানিমেশন, সিরিজের মাধ্যমে এগুলি দেখানো হয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা *গুপী গাইন বাঘা বাইন* নিয়ে সত্যজিৎ রায় আস্ত একটা সিনেমা বানিয়েছেন। এই গল্পগুলি থেকে বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলি পালাগান, যাত্রা, নাটকের মাধ্যমে জনসমাজের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। এই সাহিত্যগুলিতে অবাস্তব কাহিনি থাকলেও, তা থেকে সমসাময়িক সমাজজীবন উঠে এসেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *ক্ষীরের পুতুল* (রচনাকাল- ১৮৯৬) গল্পে দেখা যায় রাজার দুই রানি। অভাগী বড়োরানি ভিখারিনির মতো জীবন অতিবাহিত করে। ছেঁড়াকাঁথায় ঘুমোয়, খুঁদ কুড়ো খায়, ভাঙা বাড়িতে থাকে। অথচ ছোটরানি সমস্ত সুখভোগ করে। সে যথার্থ রানির মতো জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু দুই রানিই ছিল নিঃসন্তান। রাজা বাণিজ্যে গেলে বড়োরানি রাজার কাছে বাঁদর চেয়েছে। সেই বাঁদরের বুদ্ধির জোরে বড়োরানির সুখ ফিরে এসেছে এবং ছোটোরানির জীবনে দুঃখ। বাঁদরের বুদ্ধিতে রাজা ও বড়োরানি মা ষষ্ঠীর কৃপা পেয়েছেন। তাঁরা ক্ষীরেরপুতুল থেকে একটি সত্যিকারের পুত্রলাভ করেছেন। যে পুত্র পরবর্তীকালে রাজসিংহাসনে বসবে। অবহেলিত বড়োরানি শেষপর্যন্ত স্বামী, পুত্র, দাস, দাসী নিয়ে সুখের সাম্রাজ্য বিস্তার করেছে।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের *ঠাকুরমার ঝুলি*-তে রয়েছে রূপকথাধর্মী গল্প। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঢাকা ময়মনসিংহ জেলার পল্লি অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে ঐতিহ্যবাহী মৌখিক কথাসাহিত্য সংগ্রহ করেছেন। দীনেশচন্দ্র সেনের সাহায্যে সেগুলি তিনি মুদ্রণ করেছেন। এই সমস্ত কথাসাহিত্যগুলি হল- *ঠাকুমার ঝুলি* (১৯০৭), *ঠাকুরদাদার ঝুলি* (১৯০৮) *ঠানদিদির থলে*।

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার বাঙালির হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে তাঁর *ঠাকুমার ঝুলি*-র জন্যে। বাংলার রূপকথার গ্রন্থ লালবিহারী দে রচিত *ফোক-টেলস্ অভ বেঙ্গল* রচনা করেছেন। বাংলার ঠাকুমা দিদিমাদের বলা গল্পগুলি হারিয়ে যাতে না যায়, তাই তিনি সংগ্রহ করেছেন তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। তাঁর গল্পগুলির বিষয় ডালিমকুমার, রাক্ষস-খোক্কস এবং ব্রহ্মদৈতি।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর লেখা *চিরকালের সেরা*। তিনি পান্তাবুড়ির গল্প, শেয়াল ও কুমির, টুনটুনি ও রাজা, পিঁপড়ে, গুপী গাইন ও বাঘা বাইনের গল্প করে গিয়েছেন। হুমায়ুন আহমেদের রূপকথাধর্মী গ্রন্থ হল *তোমাদের জন্য রূপকথা* তিনি এই গ্রন্থে ডাইনী, দৈত্য, শেয়াল নিয়ে গল্প লিখেছেন। হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান অ্যান্ডারসনের গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করেছেন কবি ও ঔপন্যাসিক বুদ্ধদেব বসু। এই গ্রন্থের নাম দেন *অপরূপ রূপকথা*।

সবশেষে বলা যায় রূপকথাধর্মী সাহিত্য কিংবা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনির বৈশিষ্ট্যগত কিছু মিল যেমন রয়েছে তেমনি বৈসাদৃশ্যও রয়েছে।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ২৭৬

২। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ৪৩

কবি এখানে গ্রন্থটির রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন-

তামাম হইল পুথি খোদার ফজলে*
বার শত সাতাশী সাল কার্তিক মাহার।।

৩। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪৭

কবি গ্রন্থ রচনাকাল সম্পর্কে বলেছেন-

তেরোশ পাঁচ সাল বারই ফাল্গুণে।। কলমে বিদায় করিলাম ভেবে গুণে।।

৪। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ.৬১। যদিও গিরীন্দ্রনাথ দাস এর রচনাকাল অনুমান করেছেন ১৩৭৪ সাল।

৫। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

৬। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন,* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ২২১

৭। বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* ১৩৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২৩৩

৮। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন,* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ২২৪

৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, দ্রষ্টব্য: ভূমিকা অংশ, পৃ. বারো।

১০। পূর্বোক্ত, দ্রষ্টব্য: বন্দনা অংশ।

১১। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১

১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ২০১

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৪৬

১৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *আলাওলের পদ্মাবতী* (২য় খণ্ড), জানুয়ারি ২০১৭, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, পৃ. ৬৮

১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৪০

১৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *আলাওলের পদ্মাবতী* (২য় খণ্ড), জানুয়ারি ২০১৭, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, পৃ. ২৭৩

১৮। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী,* দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ২৭৭

১৯। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র,* ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৭৮

২০। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

২১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৭৪

২৩। মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃ. ৫১০

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ.  ১৫

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

২৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫১

২৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫১

২৮। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫০৩

২৯। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা,* জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ৮১

৩০। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৭৯০

৩১। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী,* দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ২৭৭-২৮৩

৩২। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৬

৩৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৩

৩৪। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা,  পৃ. ২

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২

৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

৩৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

৩৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৩৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৪০। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৫৪

৪১। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৩

৪২। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ৫৩

৪৩। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৩

৪৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪

৪৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২০

৪৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ১২

৪৭। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৭৮

৪৮। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন (সম্পা.), *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র,* ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৬৩

৪৯। আরবি ফারসি মিশ্রিত বাংলা ভাষাকে যাবনী মিশাল ভাষা বলে। সুকুমার সেন বলেছেন 'হিন্দু-মুসলমানের কাজের ভাষা' বা 'ব্যবহারিক বাংলা'। ভারতচন্দ্র বলেছেন- 'যাবনী মিশাল'

দ্রষ্টব্য: লিংক https://bn.m.wikipedia.org>wiki

৫০। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, দ্রষ্টব্য: ভূমিকা অংশ।

৫১। পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ।

৫২। পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ।

৫৩। দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, (সম্পা.) *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* গ্রন্থের ভূমিকা অংশ দেখলে সেখানে সুফি ধর্মের ব্যাখ্যা রয়েছে। সুফি ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা জানতে পারা যায়।

৫৪। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ১

৫৫। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১

৫৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, দ্রষ্টব্য: ভূমিকা অংশ।

৫৭। পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ।

৫৮। আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি,* ১৪০৭, গতিধারা, ঢাকা, পৃ. ১৯৬

৫৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ১৮

৬০। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ৩৩২

৬১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৯

৬২। আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আদি ও মধ্যযুগ), ২০০৯, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ২৮২

৬৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৬৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

৬৫। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান*, ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ৩২

৬৬। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

৬৭। ক্ষেত্র গবেষণায় জানা গিয়েছে।

৬৮। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩০

৬৯। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা,* জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ৮৫

৭০। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী,* দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ২৩১

৭১। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১২৭

৭২। আহমেদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা,* ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পটভূমিকা অংশ।

৭৩। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২১

৭৪। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা,* জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ৫

৭৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩

৭৬। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৫

৭৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১২২

৭৮। ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সংকলিত ও সম্পা.), *কেতকাদাস খেমানন্দের মনসামঙ্গল*, ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, পৃ. ১৬

৭৯। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা*, জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ৯৪

৮০। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৮

৮১। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী*, দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ২৪৪

৮২। ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সংকলিত ও সম্পা.), *কেতকাদাস খেমানন্দের মনসামঙ্গল*, ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লী, পৃ. ৪৮, ১৩২ নং. শ্লোক।

৮৩। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১০

৮৪। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*, ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২০

৮৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৩৩২

৮৬। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী*, দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ৯৪

৮৭। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৬০

৮৮। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৮৮৫

৮৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০৫

৯০। শ্রী কবিবল্লভ, 'সত্যনারায়ণের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ৩০৯

৯১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

৯২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৫

৯৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৭

৯৪। দ্বিজ রামধন, 'সত্য নারায়ণের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দঃ ২৪ পরগনা, পৃষ্ঠা ৩৮১

৯৫। দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৯

৯৬। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ৩১০

৯৭। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ৪৩

৯৮।দ্রষ্টব্য:https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A3%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%AC

৯৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৩২৬

১০০। পূর্বোক্তপৃ. ৩৪৪

১০১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৪

১০২। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা,* জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ২৯

১০৩। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৩৯৮

১০৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫৩

১০৫। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৩১৫-৪১৯

১০৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫৫

১০৭। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৪৭৩-৫৮৫

১০৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৫১

১০৯। ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস,* ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৩১৫

১১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২৯

১১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭৫

১১২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৯৫

১১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১১৪। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত* (১৯৯০) গ্রন্থ থেকে জানা যায়- কুলীনগ্রামের মালাধর বসুকে, রুক্‌নুদ্দিন বরবক শাহ্ ভাগবত রচনার জন্য 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খান এবং তাঁর ছেলে ছুটি খানও তাঁদের হিন্দু সভাকবিদের মহাভারত রচনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে মহাভারতের একজন অনুবাদক বলেছেন *রামায়ণ*-মহাভারতের গল্প শুনতে মুসলমানেরা খুব ভালোবাসতেন। পৃ. ৩৯

১১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না*, ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা, পৃ. ষোলো।

১১৬। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৯৪

১১৭। মণ্ডল, সুজিত কুমার (সম্পা.), *বনবিবির পালা*, ২০১০, গাঙচিল, কলকাতা, পৃ. ১২

১১৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৯৫

তাঁর গ্রন্থ থেকে জানা যায়-

> পশ্চিম-বাংলার ইসলামী সংস্কৃতি ও সাহিত্য তথাকথিত ইসলামী বাংলায় নির্বাহ হতে লাগল, কেউ কেউ সেমিটিক রীতিতে উল্টো করে (অর্থাৎ ডান থেকে বাম দিকে) বাংলা বই ছাপাতে লাগলেন। কলকাতায় এই ধরনের অসংখ্য ছাপাখানা গজিয়ে উঠল। এখান থেকে কদর্য কাগজে কদর্যতর ছাপায় আরবী-ফারসী কিস্‌সা (অর্থাৎ গল্প), লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, আলফা-লায়লা (অর্থাৎ আরব্য উপন্যাস) এবং ইসলামী ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মাচার সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশিত হতে লাগল। ছাপার রীতিতে মুসলমানী ঢং অনুসৃত হল, ভাষায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া হল- ফলে এ-সব বই হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হয়ে রইল, এবং বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর কোন যোগই রইল না।

১১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

১২০।দ্রষ্টব্য: https://en.m.wikipedia.org/wiki.Upendrakishore_Ray_Chowdhury

১২১। রায়চৌধুরী, উপেন্দ্রকিশোর, *ছোটদের রামায়ণ,* দীপ্তাংশু মণ্ডল (সম্পা.), ২০১০, পাবলিশিং প্লাস, কলকাতা, পৃ. ২২

১২২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ২২

১২৪। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪

১২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

১২৬। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরাম পাঁচালী' *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৪৮৪

১২৭। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৮

১২৮। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরাম পাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৪৮২

১২৯। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৮

১৩০। ভট্টাচার্য, শ্রী সুধীভূষণ (সম্পা.) *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীত* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৬৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ২০২-২০৮

১৩১। ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী,* দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, পৃ. ৫৭

১৩২। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২

১৩৩। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরাম পাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৯৯

১৩৪। পৃ. ৯৯

১৩৫। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১০

১৩৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১৩৭। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরাম পাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২০৮

১৩৮। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৩

১৩৯। বিনয় ঘোষ জানিয়েছেন হাতিয়াগড় পির গোরাচাঁদের ধর্মপ্রচারের অন্যতম কেন্দ্র।

দ্রষ্টব্য: ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (তৃতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ১১৫

১৪০। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ.৫

১৪১। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরামপাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২১০

১৪২। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২১।

১৪৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩।

১৪৪। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরামপাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২১০

১৪৫। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪৪

১৪৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ১

১৪৭। মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃ. ৬৪৪

১৪৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৮

১৪৯। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪

১৫০। মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃ. ৪৬৭

১৫১। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৬

১৫২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৫৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭

১৫৪। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* পূর্বোক্ত, পৃ. ১২

১৫৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

১৫৬। মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত,* ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা, 'ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও সগরবংশ উদ্ধার' অংশ পৃ. ৪০৫

১৫৭। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরাম পাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৩৬।

১৫৮। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ,* (প্রকাশক এবং প্রকাশকাল অজ্ঞাত) গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২৮

১৫৯। শ্রী কবিবল্লভ, 'সত্যনারায়ণের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দ. ২৪ পরগনা, পৃ. ৩১২

১৬০। আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আদি ও মধ্যযুগ), ২০০৯, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা, পৃ. ৪২০

১৬১। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৮৬

১৬২। দাস ঠাকুর, শ্রীল বৃন্দাবন, *শ্রীচৈতন্যভাগবত,* শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), দেব সাহিত্য কুটীর, পৃ. ১২

১৬৩। দ্বিজ রামধন, 'সত্য নারায়ণের পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দ. ২৪ পরগনা, পৃ. ৩৮২

১৬৪। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৯০

১৬৫। সেন, সুকুমার, মুখোপাধ্যায়, তারাপদ (সম্পা.) *কৃষ্ণদাস বিরচিত শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত,* ভাদ্র ১৪১৫, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ২১

১৬৬। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২২

১৬৭। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ.৪১০

১৬৮। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৬৩

১৬৯। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৭৬

১৭০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭

১৭১। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান*, ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ৯৭

১৭২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত*, ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৭৪

১৭৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪

১৭৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৫

১৭৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৮

১৭৬। বটতলার লেখক ও প্রকাশকেরা অর্থনৈতিক লাভ এবং ব্যাপক চাহিদার কথা চিন্তা করে বিভিন্ন পুঁথি, পাঁচালি, লোককাহিনি, পুরাণ, পঞ্জিকা প্রকাশ করতেন। বিভিন্ন কেচ্ছাকাহিনিও প্রকাশ পেতো।

১৭৭। দ্রষ্টব্য: চিত্র নং- ৪ ও ৫

১৭৮। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য*, ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

১৭৯। মিত্রমজুমদার, দক্ষিণারঞ্জন, *ঠাকুমার ঝুলি*, জানুয়ারি ২০২২, শিশু সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. চোদ্দ।

১৮০। পূর্বোক্ত, পৃ. চোদ্দ।

# চতুর্থ অধ্যায়

## পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গ্রন্থে তৎকালীন বাংলার সমাজচিত্র

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক স্বল্প আয়তনের মুদ্রিত কাহিনিগুলি থেকে তৎকালীন সমাজজীবনের সন্ধানে অগ্রসর হয়েছি। কাহিনিগুলির মধ্যে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের প্রভাব প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে পড়লেও ইতিহাস-জীবনের সঙ্গে সমাজবোধ মিশে যেতে দেখা গিয়েছে। ধরাবাঁধা একটি গল্পকে কেন্দ্র করে কবিগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে সমাজলগ্ন মানুষের কথা নিয়ে এসেছেন। এজন্য তাঁদেরকে সচেতন উদ্যোগ নিতে হয়নি। বিভিন্ন কাহিনির নিবিড় পাঠে আমরা জানতে পেরেছি সমাজের সুনির্দিষ্ট কিছু প্রথা ও রীতিনীতি। যেগুলির দ্বারা মানুষের জীবন ও চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজের বাইরে গিয়ে তারা কিছু সিধান্ত নিতে পারে না। সমাজ কী বলবে বা ভাববে সে বিষয়ে সর্বদা সজাগ থাকে। ব্যক্তি ও সমাজের যৌথ বন্ধনের মাধ্যমে মানুষ সমাজবদ্ধ জীবে পরিণত হয়। এই অধ্যায়ে সমাজ এবং মানুষের সম্পর্কটি দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকে। কোনো সাহিত্যিকই তাঁর সমসাময়িক সমাজকে বাদ দিয়ে লিখতে পারেন না। মধ্যযুগের সাহিত্য ছিল ধর্মনির্ভর। পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তিত হলেও তাঁদের জীবন ছিল মানবধর্মী। বনবিবি আর্তজনের মা। বিপদে পড়লে তাঁর নাম নিলে তিনি তাকে উদ্ধার করেন। অথচ সেই বনবিবির জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই কঠিন বাস্তবের সামনাসামনি হতে হয়েছে। অসীম ক্ষমতার অধিকারিণী হওয়া সত্ত্বেও নিজের দুঃখ নিবারণ করতে অক্ষম হয়েছেন। মা গুলালবিবি নির্দয়ের মতো সদ্যজাত কন্যা বনবিবিকে জঙ্গলে ফেলে পুত্রসন্তান শাজঙ্গলিকে নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। গভীর জনমানবশূন্য নির্জন অরণ্যে পশুদের সঙ্গে তাঁকে বেড়ে উঠতে হয়েছে। গোরাচাঁদের অসীম ক্ষমতা। নিজ বাহুবলে অনেক যুদ্ধজয় করেছেন। আবার কবরে শুয়ে অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। অথচ যুদ্ধ করতে গিয়ে তাঁর অর্দ্ধেক গলা কেটে গিয়েছে। নিজের মৃতুকে তিনি রোধ করতে পারেননি। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে বনের অবলা গরু চোখের জল ফেলেছে। নিজের দুরবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেননি। কালু মনে মনে যা চান বিধাতা তাঁকে তাই দেন, অথচ নিজের জীবন কাহিনি শুরু হয়েছে এক কঠিন সত্যের মধ্য দিয়ে। তাঁর আসল পিতা-মাতা কে তা জানা যায় না। নদীতে কাঠের সিন্ধুকে শিশু কালু ভেসে

এসেছিলেন অজুপার কাছে। কালু বারবার অপমানিত হয়েছেন ইসলাম ধর্মাবলম্বী হওয়ায়। মটুক রাজার অন্ধকার কারাগারে তিনি বন্দি ছিলেন। গাজি অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক ব্যক্তি। তাঁর কথায় আল্লাও সাড়া দেন। পিতার সামনে আল্লার প্রতি পরম ভক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন। আল্লাও তাঁর ভক্তির মর্যাদা দিয়ে পিতার নির্দয়তার হাত থেকে উদ্ধার করেছেন, কিন্তু বিধর্মী হওয়ার জন্য তাঁকে বারবার অপমানিত হয়ে কাঁদতে হয়েছে। নিজের চেষ্টায় বাহুবল দেখিয়ে চাম্পাবতীকে লাভ করেছেন। সত্যপির তাঁর কুমারী মায়ের কলঙ্কমোচন করতে পারেননি। আবার পুজো পাবার জন্য ভক্তদের কাছে বারবার ছুটে যেতে হয়েছে। কবিগণ পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি বর্ণনা করলেও বাস্তব সত্যকে কখনও অস্বীকার করতে পারেননি।

ঊনবিংশ শতকে ইংরেজরা আমাদের দেশ শাসন করেছে। বিদ্যাবুদ্ধিতে মানুষ পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুগামী হয়ে উঠতে চেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনেক পরিবর্তন এসেছে। মধ্যযুগের ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যকে পিছনে ফেলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মধ্যযুগের সাহিত্যের চরিত্রকে গ্রহণ করে আধুনিক সাহিত্যের জন্ম হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের *বীরাঙ্গনা* (১৮৬২) কাব্যের নায়িকারা। সাহিত্যে পদ্য মাধ্যম ছেড়ে গদ্য মাধ্যম অবলম্বন করা হয়েছে। উপন্যাস, প্রবন্ধ, ছোটোগল্পের মতো জনপ্রিয় ধারা গড়ে উঠেছে। অথচ এই সময় কিছু কবি রচনা করছেন মধ্যযুগেরই আঙ্গিকে পির-গাজি-বিবি কেন্দ্রিক পাঁচালি কাব্য।

প্রত্যেক সাহিত্যেরই কিছু না কিছু গুরুত্ব আছে। স্বল্প আয়তনে রচিত কাহিনিগুলিতে হিন্দু ও ইসলাম দুই ধর্মের মানুষের সম্পর্ক, বাঙালি মুসলমানদের পরিচয়, তাদের সমাজ ও সংস্কৃতির কথা উঠে এসেছে। যুদ্ধ করে কন্যা জয়, ঘরজামাই থাকার রীতি, ভ্রাতৃপ্রীতি, জ্যোতিষ চর্চা, অতিথিসেবা, দিব্যি দিয়ে কথা বলার প্রবণতা, আংটি বিনিময় করে নারী ও পুরুষের পরস্পর আপন করে নেওয়া, পান খাওয়ার রেওয়াজ, বিভিন্ন কুসংস্কার, বিবাহ রীতি, বৈষ্ণব প্রভাব, বধূর বাড়ির মেয়েদের জামাতাকে নিয়ে হাস্যপরিহাস, সতিনকাঁটা, গরিবের দুঃখকষ্টের ছবি ফুটে উঠেছে।

## ৪.ক. *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-র সমাজচিত্র:

*গাজী কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-টি (রচনাকাল- ১২৬০ সাল অর্থাৎ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দ,

প্রকাশ সাল- ১৩৯৩) একশো বছরের বেশি পুরোনো গ্রন্থ। এখানে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ।

গাজি ও কালু রাজসুখ ভোগ না করে ফকির হয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। এইসমস্ত ফকির একসময় সমাজে ছিল। আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া বলেছেন-

> ত্রয়োদশ শতাব্দীর একদম গোড়া থেকে শুরু করে অষ্টাদশ এমনকি ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তর ভারত, মধ্য এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে অসংখ্য ইসলামপ্রচারক পীর-দরবেশ এসেছিলেন বাঙলায়। এঁদের সঠিক সংখ্যা নিরুপণ করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।[১]

তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং কারও অনিষ্ট করে না বলে মানুষের বিশ্বাস। তাদেরকে মানুষ আল্লা প্রেরিত দূত ভাবে। সকল সম্প্রদায়ের দীনদুঃখী মানুষকেই তারা নানাভাবে সাহায্য করে। গাজি, কালু সুন্দরবনে গিয়ে কাঠুরিয়াদের প্রভূত সম্পত্তি দিয়েছেন। শ্রীদাম রাজার অপরাধ ক্ষমা করেছেন। সাম্প্রদায়িক ভেদাবেদ তাঁরা করেননি। বনবিবি দুখেকে দক্ষিণরায়ের কবল থেকে বাঁচিয়ে অনেক সম্পত্তি দিয়েছেন। দক্ষিণরায়কে ক্ষমাও করেছেন। বনবিবি দুখেকে ধোনার অপরাধ মার্জনা করতে বলেছেন। কাহিনির এই দিকগুলির মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বনবিবির ক্ষমাশীল, দানশীল এবং রক্ষাকর্তীর রূপটি চিত্রিত হয়ে আছে। মটুক রাজা নিজের কন্যাকে গাজির হাতে তুলে দিয়ে রাজ্যবাসী সমেত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। শ্রীদাম রাজা গাজির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতিয়েছেন।

ফকিরের ধর্ম কী কালুর মুখ থেকে কবি বারবার বলিয়েছেন। কালু গাজিকে বুঝিয়েছেন নারীসঙ্গ, সংসার করা, সুখে পরিবারের সঙ্গে দিন কাটানো এগুলি ফকিরের ধর্ম নয়। ফকিরের নারীসঙ্গ লোকের চোখে খারাপ দেখায়। গাজি প্রবৃত্তির টানে বিবাহ করলেও স্ত্রীকে ত্যাগ করার পরিকল্পনা করেছেন। চাম্পাবতীর কাতর অনুনয়ে বাধ্য হয়ে সঙ্গে নিলেও তাঁকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছেন।

সেকেন্দর অজুপার রূপে মুগ্ধ হয়ে পত্নী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিবাহের মধ্য দিয়ে সেকেন্দর ও তাঁর পুত্র গাজি ভিনরাজ্যের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তুলেছেন। দুই দেশের রাজা তাঁদের সুন্দরী কন্যাকে নিজেদের পরিত্রাণের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পাতালের রাজা এবং মটুক রাজা উভয়েই যুদ্ধে হেরে যাবার পর তাঁদের কন্যাকে শত্রুপক্ষের হাতে তুলে

দিয়েছেন। আবার কোনো রাজা যদি জুলহাসের মতো দর্শনধারী রাজপুত্র পেয়ে যান তবে নিজের কন্যা ও রাজ্যের ভার তাঁর উপর দিয়ে নিশ্চিন্তে থেকেছেন।

হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে কালু ও গাজি মুসলমান হওয়ায় মাঝেমধ্যেই সমাজের কাছে তাঁদের অবজ্ঞা পেতে হয়েছে। রাজা শ্রীদাম তাঁদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় খাদ্য না-দিয়ে অপমান করে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। গাজি রাজপুত্র হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র মুসলমান হওয়ায় মটুক রাজা নিজ কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিতে অস্বীকার করেছেন। তবে শেষপর্যন্ত হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হতে দেখা গিয়েছে। শ্রীদাম, মটুক রাজা কালু ও গাজির কলাকৌশলের কাছে হেরে গিয়ে মুসলমান হয়েছেন। তাঁদের রাজ্যের প্রজারাও মুসলমান হয়েছে। মটুক রাজা নিজ কন্যা চাম্পাবতীকে গাজির হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছেন। মুসলমানদের এদেশে এসে জোর করে ভয় দেখিয়ে কিংবা বিবাহসূত্রে হিন্দুদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার ঘটনা সামনে এসেছে। গাজি, কালু যে ইসলাম ধর্ম বিস্তারের জন্য বেরিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় আরেকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে। তাঁরা একদিন সাগরের তীরে জলদেবতার তপে রত তিনশো জন যোগীর জপতপ ভেঙেছেন। যোগীগণ ক্রোধ সংবরণ করতে না-পেরে মারতে উদ্যত হয়েছেন। গাজি তাঁদের দেব দর্শন করানোর বিনিময়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

গাজী বলে মোর কথা শোন যোগীগণ।। করাইতে পারি যদি দেব দরশন*
হবে কি না মোসলমান করহ স্বীকার।।[২]

গাজি পির বলে তিন ডাক দিলে খোয়াজ খিজির ভেসে উঠেছেন। পদ্মপাতায় পির উঠে বসে দেখা দিয়েছেন। এইভাবে যোগীদের দেব দর্শন ঘটেছে।

যোগীগণ বলে ধন্য ধন্য শাহাগাজী।। যাহার অধীন দেব মোরা যাকে পুজি*
তখন গাজীর কাছে সকলে আসিয়া।। হইলেন মুসলমান কলেমা পড়িয়া*
তার পরে শাহা গাজী লয়ে সাধুগণে।। গড়িলেন মসজিদ এক জান সেইখানে*[৩]

এই অলৌকিক কাহিনিগুলি কতখানি সত্য তা প্রমাণিত নয় কিন্তু পির-ফকিরের নামে এমন অলৌকিক কাহিনি প্রচলিত ছিল এবং মানুষ তা বিশ্বাস করত গাজির কাহিনি থেকে জানা যায়।

আব্দুর রহিম সাহেব পুরোহিতদের লোভ রঙ্গকৌতুকের মধ্য দিয়ে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। ছীরা ও দোরা নামের দুই মাঝির বাড়িতে পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে আমন্ত্রিত বেছু ও মিছু নামের দুই পুরোহিত ভেড়া দেখে লোভ সামলাতে পারেনি। তাদের লোভের পরিচয় নিম্নে দেওয়া হল।

মেষ দেখি দুই দ্বীজে কাঁচা খেতে চাহে।। ডাকিয়া দোরার কাছে বেছুদেব কহে*
বড় ভেড়ার দিবে অন্ডকোশ মোরে।। অভিশাপ দিব যদি দেহ অন্য কারে*
শুনিয়া ঠাকুর মেছু কহে পাটনীকে।। আমি নিব অণ্ডকোষ না দিবে বেছুকে*
কহিছে ঘরণী মোর তিনি গর্ভবতী।। অণ্ডকোগ খাইবারে অভিলাষ অতি*
বেছু বলে মেছুদের অণ্ডকোষ মোর।। মেছু বলে শোন বেছু গালে খাবি চড়।।[৪]

বড়ো ভেড়ার অণ্ডকোষ কার সেই নিয়ে দুই দ্বিজের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা চলেছে। শেষকালে তাদের বাগ্‌যুদ্ধ কিলাকিলিতে পরিণত হয়েছে। কবি দুই পুরোহিতের লোভ বাস্তবসম্মত ভাবে দেখিয়েছেন।

সমাজের কুসংস্কারাবদ্ধ মানুষের কথা উঠে এসেছে সাগরে কাঠের সিন্দুকে কালু ভেসে আসার মধ্য দিয়ে। এই ঘটনায় সাগরে সন্তান বিসর্জনের মতো কুসংস্কারের কথা মাথায় আসে। হিন্দুদের মধ্যে এই কুসংস্কার দেখতে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারী শরিফে পির মোবারক গাজির থানের পাশে একটি পুকুর আছে। ক্ষেত্র গবেষণায় জানা গিয়েছে কোনো নারীর কয়েকটি সন্তান মৃত জন্মালে কিংবা দীর্ঘদিন নিঃসন্তান থাকলে মোবারক গাজির থানে তারা সন্তান বিসর্জনের মানত করে। তাই প্রথম সন্তান হলে বড়ো হাড়িতে করে মোবারক গাজির নামে বিসর্জন দেয়। সেই সন্তান আবার ভেসে তার কাছে চলে আসে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপাল কুণ্ডলা* উপন্যাসে গঙ্গাসাগরে এক মায়ের সন্তান বিসর্জনের কথা আমরা পড়েছি।[৫] এই কাজের কোনো বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি নেই। তবুও মানুষ এই ভিত্তিহীন কাজগুলি করে। বাঁধা দিলে তাদের বিশ্বাসে আঘাত পড়েছে বলে মনে করে।

দক্ষিণরায়ের গাজির সঙ্গে যুদ্ধের প্রস্তুতিকালীন আত্মপ্রত্যয় দেখে ভালো লেগেছে, কিন্তু যখন তিনি প্রস্তুত হয়ে বেরিয়েছেন তখন কিছু অশুভসংকেত তাঁর মনোবল দুর্বল করেছে। যেগুলি তাঁর মধ্যে কুসংস্কারাবদ্ধ ভাবে দানা বেঁধেছে।

যাত্রা কালে হাঁচি তার বামেতে পড়ীল।। চক্ষেতে মাছি উড়িয়া বসিল*

চলিতে পড়ীল বীর উষ্ঠা খেয়ে পায়।।     দেখে আর কাঠুরিয়া কাঠ লয়ে যায়*
রহ রহ তিন ডাক শূনিল পশ্চাতে।।     সমুখেতে মরা আর দেখেন চক্ষেতে*
অ-যাত্রা দেখিয়া দেও ভাবে মনে।।[৬]

যাত্রাকালে এমন অশুভসংকেত দেখলে যথার্থ বীরও দুর্বল হয়ে পড়েন। অশুভসংকেত যেমন মনোবল নষ্ট করে তেমন শুভসংকেত মনোবল বাড়িয়ে দেয়। গাজির যুদ্ধ যাত্রাকালে ডান নাকেতে শ্বাস বয়েছে। হাতির উপর মাহুতের অবস্থান, মালিনীর হাতে ফুল দেখা, গয়লানির দুধ ও দই নেওয়ার জন্য হাঁকডাক, সধবা রমণীর ভরা কলশি কাঁখে নিয়ে যাওয়া, এক বর্ণ গাভি বৎস দেখার মধ্য দিয়ে শুভসংকেত পেয়েছেন। মানুষের মধ্যে এইরূপ নানা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। এই বিশ্বাস এমন দৃঢ়বদ্ধ ভাবে গাঁথা থাকে যে তার থেকে টলানো যায় না। কিছু কুসংস্কারের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান দিতে পারলেও সব ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়নি। অজ্ঞতা থেকে কুসংস্কারের জন্ম নেয়। কেবল দক্ষিণরায় কিংবা গাজি নয়, সমাজে এমন মানুষ বহু রয়েছে যারা এই বিশ্বাস নিয়ে বড়ো হয়। একটি শিশু তার বাবা-মা, বাড়ির বড়োদের ধর্মীয় বিশ্বাস দেখে বড়ো হয়। আর সেগুলিই তাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাসা বাঁধে। এর কোনো যুক্তি আছে কিনা জানতে চাইলে উত্তর পাওয়া যায় না।

দক্ষিণানগরে মটুক রাজার অধীনে একটি মৃত্যুজীব কুণ্ডা ছিল। মানুষ কিংবা যে-কোনো প্রাণীর মৃতদেহের উপর এই কুণ্ডার জল ছিটিয়ে দিলে তারা জীবিত হয়। গাজির সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন তাঁর সমস্ত সৈন্যসামন্ত, হাতি, ঘোড়া মারা গেলে রাতের বেলা কুয়ো থেকে জল তুলে তাদের উপর ছিটিয়ে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে। গাজি কুয়োর জলকে অপবিত্র করে দেওয়ার জন্য গোমাংস নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। যারফলে কুয়োর জল অপবিত্র হয়ে অলৌকিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে। এমন অনেক পুকুর এখনও পর্যন্ত গ্রাম বাংলায় আছে। মানুষের বিশ্বাস এই জল ব্যবহার করে মানুষের রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়। এখনও বিভিন্ন মন্দির বা মাজারে তেল পড়া, জল পড়া ব্যবহার করা হয় রোগীকে সুস্থ করতে। অনেক শীতলা মায়ের নামে পুকুর রয়েছে। হামবসন্ত হলে সেই পুকুরের জল ঘটি করে তুলে মায়ের নাম করে রোগীর দেহে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। বাড়ির নানাস্থানে ছড়িয়ে দিয়ে ভাবেন বাড়ি শুদ্ধ হয়ে গিয়ে রোগ ধীরেধীরে দূর হয়ে যাবে। এগুলি সবই ধর্মীয় বিশ্বাস যেগুলি অযৌক্তিকতা থেকে উদ্ভূত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সীতাকুণ্ডুতে দেওয়ান গাজির মাজারের সামনে এমন শীতলা মায়ের নামে পুকুর রয়েছে।

সমাজে জ্যোতিষির উপর মানুষের ভরসা অপরিসীম। তাদের কথা হুবুহু মিলে যায় বলে মানুষ বিশ্বাস করে। মা অজুপা জ্যোতিষির কাছ থেকেই জেনেছে যে জুলহাস পাতাল রাজার কন্যাকে বিবাহ করে রাজকন্যা ও রাজত্ব নিয়ে সুখে দিনযাপন করছে। ছাপাই নগরে সকল প্রজার ঘরে আগুন লাগলে জ্যোতিষির মাধ্যমেই রাজা শ্রীদাম জানতে পেরেছে যে গাজি ও কালু দুই পিরকে ঘাড় ধরে রাজ্যের বাইরে বের করে দেওয়ার প্রতিশোধ হিসেবে তাঁরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন। চাম্পাবতী জ্যোতিষ গণনার মাধ্যমেই জানতে পেরেছেন গাজি তাঁর স্বামী হবেন। এখনও মানুষের মধ্যে এই ধারণা রয়েছে যে জ্যোতিষি একটি মানুষের ভবিষ্যতের খবর দিতে পারে।

অতিথি আপ্যায়নের কথা আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা *সভ্য অসভ্য* গল্পে পড়েছি।[৭] সেখানে আমেরিকার এক আদিম নিবাসী তাঁর যৎসামন্য সম্বল দিয়ে ইউরোপীয় এক সভ্য ব্যক্তিকে রাত্রিকালীন বিপদ থেকে বাঁচিয়েছেন। তথাকথিত সভ্য মানুষটিকে আহার এবং আশ্রয় দিয়ে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তেও এইরূপ অতিথি আপ্যায়নের পরিচয় পেয়েছি। একদা বনের মধ্যে গাজি ও কালু প্রবেশ করে সাত কাঠুরিয়াকে তাঁদের আশ্রয় ও খাদ্যের প্রয়োজনের কথা বলেছেন। অতিথি শোনা মাত্রই কাঠুরিয়াগণ জোড় হাত করে সালাম করেছেন (প্রণাম করেন)। তাঁদেরকে শয্যা করে দিয়ে জল এনে পা ধুইয়ে দিয়েছেন। ঘরে চাল, ডাল, টাকা না থাকায় নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় কুড়ুলগুলি বন্ধক রেখে তাঁদের অন্নের সংস্থান করেছেন। দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের এইরূপ অতিথি আপ্যায়ন মুগ্ধ করেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অঙ্গ এই অতিথি আপ্যায়ন। তাছাড়া কাঠুরিয়াদের জীবনযাপন দেখে বোঝা যায় তখনকার সমাজে হতদরিদ্র মানুষ ছিল যারা দিন এনে দিন খায়।

সুবর্ণের কড়ি দিয়ে নৌকা পার করে দেওয়ার রীতির কথা এই গ্রন্থে উঠে এসেছে। গাজি মাঝিকে পার করে দিতে বললে-

ছিরা বলে দেহ আগে সুবর্ণের কড়ি/এককড়া কম নহে এক বিংশ কুড়ি।[৮]

গাজি ও মাঝির কথোপকথনে বিনিময়প্রথার দিকটি উঠে এসেছে।

গাজী বলে শোন ছিরা মোর কথা লও।। দুই গোটা ভেড়া রাখী পার করি দাও।[৯]

ছিরা ও ডোরার পিতার বাৎসরিক কাজে ভেড়া দুটি লেগে যাবে ভেবে তারা তাতে রাজি হয়ে গিয়েছে।

বিবাহের ক্ষেত্রে ঘটকের ঘটকালি করতে গিয়ে পাত্র কিংবা পাত্রী যথাযথ না হলে তার কপালে দুঃখ জোটা চিরপরিচিত ছবি। ঘটকালি করতে গিয়ে ঘটকের মার খাবার করুণ উদাহরণ হল কালু। কালু মটুক রাজার কাছে চাম্পাবতী ও গাজির বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলে তাঁর উপর অমানুষিক অত্যাচার এবং কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে। যতদিন না গাজি মটুক রাজাকে হারাতে পেরেছেন ততদিন কালু কারাগারের বন্দিদশায় কাটিয়েছেন।

আংটি বিনিময় করে পরস্পরকে নিজের করে নেওয়ার ঘটনা গাজি ও চাম্পাবতীর মধ্যে পাওয়া গিয়েছে। পরিদের পরামর্শ মতো এক রাতের জন্য তাঁদের সাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা পরস্পর আংটি পরিয়ে একে অপরকে নিজের করে নিয়েছেন এবং একে অপরকে প্রতিশ্রুতি, ভালোবাসা ও আনুগত্য দেখিয়েছেন।

মুসলমানদের বিবাহের ক্ষেত্রে সাক্ষির প্রয়োজন। বিবাহের জন্য উকিল অনেকবেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। গাজি ও চাম্পাবতীর বিবাহের আগে উকিল এসে কবুল করিয়ে বিবাহ দিয়েছে।

তরিত উকিল সাক্ষী পাঠাইয়া দিল।। উকিলের কাছে চামপা কলি করিল*
পশ্চাতে সাহেব গাজী করিল সীকার।। বিবাহ বন্ধন শক্ত হইল দোহার*[১০]

গাজি ও চাম্পাবতীর বিবাহে বিভিন্ন নিয়ম পালন গ্রন্থে দেখানো হয়েছে। বিবাহের সময় বর কনেকে সাজানো, নাপিত এসে নখ কেটে দেওয়া হয়েছে। এই দিনে নাপিতের উপদ্রপের শেষ থাকে না।

নাই বেটা বড়ঠেটা এক নখ কাটি।। তিন বোঝা সিদা সেই বান্ধিলেক আটি*
তবু বেটা বলে বাকি রহিলেক ডাল।। ডাল ডাল করি সেই ফুলাইল গাল*
ডাল পেরে ফের বলে রহিলেক তেল।। তেল তেল করি বুক শুখাইয় গেল*
তেল পেয়ে বলে ফের রহিলেক নুন।।[১১]

উৎসব উপলক্ষে হিন্দু রাজাদের গৃহে যে আমোদ-প্রমোদ ছিল, তা কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। নানা জাতির বাদ্য বাজে, বাজি ফাটে, নৃত্যশিল্পী, গায়কের আবির্ভাব হয়।

রাজবাড়ি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান থাকলে সকলেই আমন্ত্রিত হয়। রঙ্গকৌতুক হয় নতুন বরকনেকে নিয়ে। মটুক রাজার ঘরের বধূগণ গাজির সঙ্গে মজা করেছে। কেউ ঝাউ-এর দানা এনে সুপারির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে। কেউ চইপাতা পানের সঙ্গে সাজিয়েছে। হুকোতে কেউ গোবর সাজিয়ে গাজির সম্মুখে ধরেছে। গাজিও বধূদের আঁচল ধরে হেয়ালি করেছেন। তিনি হেঁয়ালি করে বলেছেন-

তোমাদের পতীগণ সকলি বর্ব্বর।। রমণী হইয়া কর রমণীর ঘর*[১২]

তাদের ঘরের পুরুষরা রতিশাস্ত্র পাঠ করেনি। তারা যদি রতির পণ্ডিত হত, তাহলে বধূগণের ঠাট ভেঙে দিত। তাঁর রসিকতা শুনে বধূগণ মুখে কাপড় দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

মটুক রাজার পক্ষ নিয়ে দক্ষিণরায় দানবের কাছে সাহায্যের জন্য গিয়েছেন। দানব তাঁকে গাজি ও চাম্পাবতীর বিয়ের পরামর্শ দিয়ে যুদ্ধ থামাতে বলেছেন। বিধর্মী হলেও গাজির পিতা অনেক বড়ো রাজা। সকল রাজার চূড়ামণি তিনি। টাকা দিয়ে এমন পাত্র পাওয়া যাবে না। তার সঙ্গে বিয়ে দিতে মটুক রাজার আপত্তি থাকার কথা নয়। এখানে ধর্মের থেকে টাকা, বংশের আভিজাত্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

কত বড় রাজা সেই এত অভিমান।। গাজীর বাপের নহে দাসের সমান*
বলি রাজা তার সুতা গাজীর জননী।। সকল রাজার তাঁরা হয় চুড়ামণি*[১৩]

গাজি চাম্পাবতীকে বিবাহের পর পরিত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড়। গাজির সিদ্ধান্তে চাম্পাবতী পায়ে ধরেছে। মটুক রাজা হেরে গিয়ে প্রাণ হারাবার ভয়ে গাজিকে জামাই হিসেবে মেনে নিয়েছেন। পাতালের রাজা শাহা সেকেন্দরের কাছে হেরে গিয়ে প্রাণ হারানোর ভয়ে প্রাণাধিক কন্যাকে পুরস্কারস্বরূপ তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন। এইভাবে পুরুষেরা নারীদেরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

হারিয়া সে মহারাজ, ফেলে তার তক্ত তাজ, সেকেন্দার শাহার পায়ে গেরে*
আজুপা নামেতে কন্যা, ছিল রূপে অতি ধন্যা; সেকেন্দার হাতে শূপে দিল।।[১৪]

ঊনবিংশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো মহান মানুষের ইচ্ছাশক্তির জোরে মেয়েরা স্কুলে যাওয়া শুরু করেছে। মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরনোর অল্পবিস্তর স্বাধীনতা পেয়েছে। অথচ চাম্পাবতী প্রাসাদের বাইরে যাওয়ারই অনুমতি পাইনি। তিনি রাজার মেয়ে হতে পারে, কিন্তু তাঁর স্বাধীনতা ছিল না। পিতা, ভাই, মামা ছাড়া অন্য

কোনো পুরুষের মুখ দেখার সুযোগ তাঁর ঘটেনি। যুদ্ধে হেরে গিয়ে মটুক রাজা নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভিন্নধর্মী ফকির গাজির সঙ্গে কন্যাকে বিবাহ দিয়েছেন। সমগ্র পরিবার মুসলমান হয়েছেন।

সর্বকালে নারীর প্রতি পুরুষের অত্যাচারের ঘটনা আমরা অবগত হয়েছি সাহিত্যের মাধ্যমে। রাবণ সীতাকে হরণ করে লঙ্কায় আটকে রেখেছে। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বৃত্রসংহার*-এ ইন্দ্রের স্ত্রী সচী দেবীকে হরণ করে অসুরেরা আটকে রেখেছে।[১৫] ছাপাইনগরের রাজা শ্রীদামের স্ত্রীকেও জোর করে মসজিদে আটকে-রাখার ঘটনা লক্ষ করা গিয়েছে।

আছিল রাজার রাণী পালঙ্কে বসিয়া।।
হঠাৎ আসিয়া জিনে গেলেন লইয়া*[১৬]

চাম্পাবতী তাঁর প্রাণনাথ গাজিকে পাওয়ার জন্য বারবার আত্মবিলাপ করেছেন। তার মনের কথা মা ছাড়া কাউকে জানাতে পারেননি। ঊনবিংশ শতকের নারী হয়েও তিনি পরাধীন। অথচ মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধা, ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পরিপূর্ণ প্রেমময়ী নারী। মহুয়া চন্দ্রসূর্য সাক্ষি করে চাঁদকে নিয়ে দেশান্তরী হয়েছে। সমাজের প্রতিবন্ধকতা, পথের প্রতিকূলতা, গুরুজন, ভয়কে অতিক্রম করে প্রিয় মিলনে ছুটে গিয়েছে।[১৭] পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলিতে নারীদের সামাজিক অবস্থা খুব সম্মানজনক ছিল না। ঊনবিংশ শতকে নারী আন্দোলনের ঢেউ কেবলমাত্র কলকাতাকে কেন্দ্র করে তরঙ্গায়িত হয়েছিল বলা যায়। তাও সেটি সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং বেশিরভাগটাই সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

হিন্দু ও মুসলমান বিবাহ সামাজিক ভাবে স্বীকৃত নয়। মটুক রাজা কন্যা চাম্পাবতীকে মুসলমান গাজির সঙ্গে বিবাহ দিতে চাননি। গাজির সঙ্গে মটুক রাজার আঠারো দিনের জীবনমরণ যুদ্ধ হয়েছে। মটুক রাজা বাধ্য হয়েছেন গাজির সঙ্গে কন্যা চাম্পাবতীকে বিবাহ দিতে এবং মুসলমান হতে। এই গ্রন্থে জানতে পারা যায় জোরজবরদস্তি ধর্মান্তরণের কথা।

কালিদাস দত্তের লেখা *বড়খাঁ গাজির গান* প্রবন্ধে সমসাময়িক সমাজের কথা জানা যায়। ব্রাহ্মণদের বিয়ের উপকরণ হিসেবে যা লাগে, তা কালুর কথায় উঠে এসেছে।

কালু বলে বিভা করতে হয়েছে বড় মন। সত্যি করে বল দেখি কত আছে ধন।।

... ... ...

এখন তিনশত বামন চাই একুশ জোড়া শাড়ী। চিনি সন্দেশ মেঠাই চাই তিনশত হাঁড়ি।।
খির দই কত চাই নাহি লেখা জোকা। জলদি করে দাও ভাই হাজার খানেক টাকা।।[১৮]

এই প্রবন্ধে গ্রাম্য গালিগালাজ লক্ষ করা গিয়েছে।

রামা বেধোর মাগেরে করিব কড়ে রাঁড়ি।[১৯]

## ৪.খ. বনবিবির মাহাত্ম্য-কেন্দ্রিক গ্রন্থে সমাজচিত্র:

*বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি* এবং *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ এবং ধোনা দুঃখের পালা) দুটি কেচ্ছা-কাহিনিতেই অভিন্ন সমাজচিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। কেবল প্রকাশভঙ্গি আলাদা। ১৩০৫ সাল বারোই ফাল্গুণ অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে আবদুর রহিম সাহেবের গ্রন্থটি প্রকাশ পেয়েছে। মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) প্রকাশের সময়কাল সম্বন্ধে কবি বলেছেন-

বার শত সাতাশী সাল কার্ত্তিক মাহার।। সাত তারিখের বাত আছিল জুম্মার*[২০]

অর্থাৎ ১২৮৭ সালের কার্ত্তিক মাসের শুক্রবার। রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা* গ্রন্থে কুমকুম চট্টোপাধ্যায়ের 'নারী ও শিক্ষা' প্রবন্ধ থেকে জানা যায়- ঊনবিংশ শতকে পুরোনো প্রথাগত জীবন থেকে মানুষ মুক্তি খুঁজেছে। এই শতকে সতীদাহ প্রথা, পুরুষের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ নিবারণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে এবং বিধবা বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা চলেছে। বিভিন্ন সামাজিক আন্যায়ের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালি মনীষীগণ লেখনী ধারণ করেছেন। সেই সমস্ত পুরুষেরা নিজেদের পরিবারের মেয়েদেরকেও শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে চেয়েছেন। তাঁরা নারীকে দেখতে চেয়েছেন আদর্শ সঙ্গিনী, গৃহিণী, ও আদর্শ মা হিসেবে। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দে নব প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ে নিজেদের কন্যাদের পড়ানোর চেষ্টা করেছেন। মেয়েরাও পুরুষদের সহযোগিতায় সাহিত্যের আঙিনায় প্রবেশ করতে ইচ্ছুক হয়েছে। ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত *বামাবোধিনী* পত্রিকায় মেয়েরা নারীশিক্ষা, ব্রাহ্মসমাজ অনুমোদিত সমাজসংস্কার, স্ত্রীস্বাধীনতার কথা লিখতে শুরু করেছেন।[২১] তাদের লেখার মধ্য থেকে বিদ্রোহের সুর বেরিয়ে এসেছে। তবে এই সমস্ত সাহিত্য চর্চা কিংবা নারীদের প্রগতি কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন প্রান্তীয় অঞ্চলের মেয়েরা যে অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল সেই অন্ধকারেই থেকেছে। লোকদেবতাকেন্দ্রিক

গ্রন্থগুলিতে সেই আঞ্চলিক জীবনের কাহিনি উঠে এসেছে। সেখানে মেয়েদের জীবনের করুণ অবস্থা আজও দূর হয়নি। পুরাণ, মঙ্গলকাব্যের মতো কেচ্ছা-কাহিনির নারীদের দুর্দশা সমতুল্য। তারা প্রায় সকলেই কমবেশি সমাজ এবং পরিবার উভয় ক্ষেত্রেই লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। অন্যের স্ত্রীহরণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, পণপ্রথা, নারীকে ছলনা, নারীকে পুরস্কার হিসেবে ব্যবহার, কন্যাসন্তানকে অবহেলা, সতিনকাঁটা প্রভৃতি সমস্যা পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিতে উঠে এসেছে।

শিশু শ্রমিক, অর্থবানদের নিঁচু তলার মানুষের শোষণের চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। দুখে সংসারের হাল ধরতে গরু চরিয়ে অর্থ উপার্জন করেছে।

দুখে বলে চাচা আমি না হইনু রোজগারি।। গুজারি গয়ালিনির গরু চরাইয়া ফিরি*
সেই মজুরিতে যাহা ডাল চাল পাই।। ঘরেতে আনিয়া তাহা মায়ে পোয়ে খাই*[২২]

সে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের আশায় ধোনার সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে মধু সংগ্রহ করতে। ধোনা তাকে বিবাহের লোভ দেখিয়ে বিপদ সঙ্কুল জায়গায় টেনে নিয়ে গিয়েছে এবং বিপদের মুখে ফেলে মোম-মধু নিয়ে ঘরে ফিরেছে। দুখের মা বাধ্য হয়ে ছেলে পাঠিয়ে শেষপর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে গিয়েছে।

ফুলবিবি সন্তান জন্ম দিতে না পারায় সমাজ তাঁকে আঁটকুড়ি ও বাজা বলেছে। সে স্বামীর অন্যত্র বিবাহের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছে। সন্তানের জন্য এবরাহিম দ্বিতীয় বিবাহ করেছেন। এবরাহিমের ফুলবিবির প্রতি নিষ্ঠুর উক্তি শোনা গিয়েছে।

লাড়কা না হইবে বিবী তোমার উদরে
দোছরা বিবাহ করা চাই মোর তরে*[২৩]

এবরাহিমের ব্যবহারে মনে হয়েছে নারীরা পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র। নারীরাও নিজেদেরকে সন্তান ব্যতীত জীবন মূল্যহীন ভাবে। তাই ফুলবিবির উক্তি-

আটকুড়া মরিয়ে যাবে যাহানেতে।।
গাছ নাহি শোভা পায় বেগর ফলেতে*[২৪]

বন্ধ্যাত্বের কারণে সমাজে পুরুষকে দায়ী না করে নারীকেই দোষারোপ করা হয়, তাই ফুলবিবির এমন আক্ষেপের উক্তি। গর্ভধারণ করতে না পারায় তাঁর বিবাহ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে গিয়েছে।

অর্থাভাবে গরিব পিতা সুপাত্র নয় জেনেও কন্যাকে তার হাতে তুলে দেয়। কন্যারা অসৎ পাত্র জেনেও পিতার বাধ্য থাকে। ভাগ্যের হাতে তারা নিজেকে সঁপে দেয়। এবরাহিমের প্রথম স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও সা জলিল নিজ কন্যাকে তার হাতে তুলে দিয়েছে। তখন গুলালবিবির উক্তি-

ভালা বুরা জানা নাহি আমার দরকার*
যাহাকে শুপিবে তুমি করিব কবুল।।
মা বাপের কথা নাহি করিব অদুল*[২৫]

ঊনবিংশ শতকে নারীদের এমন করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে।

ষোড়শ শতক কিংবা ঊনবিংশ সতিনকাঁটা সমাজে সর্বদা বিরাজমান। সাহিত্যে তার প্রতিফলন লক্ষ করা গিয়েছে। মনসামঙ্গলে দেবী চণ্ডী মনসাকে সতিন ভেবে এক চোখ কানা করে দিয়েছে।

অঙ্গার দাহনে চণ্ডী মোরে কৈল কানি।[২৬]

চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে ফুল্লরা সুন্দরী নারীর ছদ্মবেশী চণ্ডীকে সতিন ভেবে বারমাস্যা শুনিয়েছে।[২৭] স্বামী কালকেতুর কাছে তার অন্যায়ের জন্য কেঁদে অভিযোগ জানিয়েছে। প্রথমে কালকেতু ফুল্লরাকে কাঁদতে দেখে এক বাস্তবধর্মী প্রশ্ন করেছেন-

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা। কার সঙ্গে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কৈলি রাতা।[২৮]

চণ্ডীমঙ্গলের বণিকখণ্ডে ধনপতির প্রথম স্ত্রী লহনা স্বামীর বিয়ের খবর পেয়ে দুঃখিত হয়েছে। খুল্লনার মা রম্ভাবতী সতিন ঘরে কন্যাকে বিয়ে দিতে রাজি ছিলেন না। সতিনের ষড়যন্ত্রে খুল্লনা বনে ছাগল চরাতে বাধ্য হয়েছে। সেজন্যে তাকে সমাজের কাছে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।[২৯] অন্নদামঙ্গলে বহুপত্নীক হরিহরের গৃহে সতিনদের নিত্য কলহে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছেন দেবী অন্নপূর্ণা। অন্নদার অবস্থা কবি বর্ণনা করে বলেছেন-

চারি সতিনীর সদা বড়ই কন্দল।।
...        ...        ...
কন্দলে কন্দলে ক্রোধ হৈল অন্নদার।
ছাড়িতে বাসনা হৈল কেবা রাখে আর।।
যেখানে কন্দল দেবী না রন সেখানে।[৩০]

দেবী অন্নপূর্ণা বাধ্য হয়ে ভবানন্দের গৃহে গমন করেছেন। বনবিবির মুদ্রিত কাহিনিতে সতিনের হিংসার ছবি লক্ষ করা গিয়েছে। দশমাসের গর্ভবতী গুলালবিবিকে ফুলবিবি বনবাস করতে বাধ্য করেছে কারণ তাঁর সুখের সংসারে সে কাঁটা স্বরূপ তৃতীয় ব্যক্তি হিসেবে প্রবেশ করেছে। এবরাহিম ফুলবিবিকে অনেক তিরস্কার করেও তার হিংসা থেকে গুলালবিবিকে বাঁচাতে পারেননি।

প্রজানুরঞ্জনের জন্য রামচন্দ্র সন্তানসম্ভবা সীতাকে পরিত্যগ করেছেন। ভাতৃ আদেশে লক্ষ্মণ ছলনার আশ্রয় নিয়ে বাল্মীকির আশ্রমের কাছে সীতাকে ছেড়ে এসেছেন।[৩১] এমন ঘটনা গুলালবিবির সঙ্গে ঘটতে দেখা গিয়েছে। এবরাহিমও দশমাসের সন্তানসম্ভবা, পথ পরিশ্রান্ত গুলালবিবিকে জঙ্গলে একাকী রেখে পালিয়ে গিয়েছেন। তিনি গুলালবিবিকে বিপদের মুখে না ফেলে পিতা-মাতার কাছে রেখে আসতে পারতেন। ঊনবিংশ শতকে একটি মেয়ে বিয়ের পর তাঁদের কাছে থাকবে এটি খুব বিস্ময়ের বিষয় নয়। সমাজে বিধবা, স্বামী পরিত্যাজ্য মেয়েদের প্রথম আশ্রয়স্থল ছিল তার পিতার ঘর। প্রাচীন থেকে আধুনিক অসহায়, অত্যাচারিত নারী যেন এক সূত্রে বাঁধা রয়েছে। সীতার থেকেও গুলালবিবির অবস্থা আরও ভয়ানক বলা যায়। সীতা বাল্মীকি মুনির মতো একজন পরম ধার্মিকের কাছে আশ্রয় পেলেও গুলালবিবি সেই আশ্রয়টুকুও পাননি। হিংস্র জীবজন্তু ভরা জঙ্গলে কোনো মানুষের সাহচর্য, সহানুভূতি, ভালোবাসা ছাড়াই নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে দুই যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। সন্তান প্রসবের পর তিনি কন্যাসন্তানকে জঙ্গলের মধ্যে পরিত্যাগ করে পুত্রসন্তানকে নিয়ে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। নারী জন্ম নিয়ে তিনি স্বামীর অবহেলা পেয়েছেন। তারই প্রতিশোধ নিতেই হয়তো কন্যা বনবিবিকে হিংস্র পশুদের মুখের গ্রাস করে রেখে অন্যত্র গিয়েছেন। বনবিবি আক্ষেপ করে বলেছেন-

বেটার দরদ মাগো হৈল তেরা দেলে।। না করিলে দয়ামায়া বেটি লাড়কি বলে*

এক গর্ভে হইনু বহিন আর ভাই।। কার ভাগ্যে হৈল দয়া কার ভাগ্যে নাই*[৩২]

এবরাহিম ফুলবিবির নির্দেশ মেনে গুলালবিবিকে বনবাসে পাঠিয়েছেন। আবার নিজের কষ্ট দূর করতে কয়েক বৎসর পর তাঁকে ফিরিয়ে আনতে জঙ্গলে গিয়েছেন। এবরাহিম দ্বিতীয় স্ত্রীকে এইভাবে নিজের হাতের খেলার সামগ্রী করে তুলেছেন। গুলালবিবিও নিজেকে হয়তো পুরুষের দাসী ভেবেছেন। তাই স্বামী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে সাময়িক মান অভিমান করে

পুত্রকন্যাকে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে গৃহে ফিরতে চেয়েছেন। তাঁকে যথার্থ উনিশ শতকের নারী ভাবা যেতে পারতো যদি তাঁর প্রতিবাদী রূপটি পাঠক দেখতে পেতো। যেমন ভাবে মধুসূদনের বীরাঙ্গনা নায়িকারা প্রতিবাদ করেছে। ১৮৬২ খ্রি. মাইকেল মধুসূদন দত্ত *বীরাঙ্গনা কাব্য* লিখেছেন। তাঁর কাব্যের নায়িকারা প্রত্যেকেই প্রতিবাদী চরিত্র। *দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা* পত্রকাব্যে শকুন্তলার পত্রে উঠে এসেছে-

গন্ধর্ব বিবাহচ্ছলে ছলিলে দাসীরে।[৩৩]

তারা গুরুপত্নী হয়ে পুত্রসম শিষ্যের প্রতি আসক্ত হয়ে তাকে পত্রে বলেছে-

জীবন মরণ মম, আজি তব হাতে[৩৪]

*দ্বারকানাথের প্রতি রুক্মিণী*-তে ভীষ্মক রাজপুত্রী রুক্মিনীর ভ্রাতা যুবরাজ রুক্ম চেদীশ্বর শিশুপালের সঙ্গে বিবাহ স্থির করলে, সে তা প্রত্যাখ্যান করে দ্বারকানাথকে কায়, মন দিয়েছে। তাই কৃষ্ণকে উদ্ধারের জন্য পত্র লিখেছে।

হর মোরে! হরে লয়ে দেহ তাঁর পদে,
হরিলা এ মনঃ যিনি নিশার স্বপনে।[৩৫]

রামচন্দ্রকে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত করলে কেকয়ী রাজাকে অসত্যবাদী বলে দোষারোপ করেছে। নানান কটুক্তি করে রাজার মন পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছেন। সূর্পনখা বিধবা হয়েও লক্ষ্মণকে প্রণয় পত্র প্রেরণ করেছেন। এইভাবে *বীরাঙ্গনা* কাব্যে প্রত্যেকটি নারীচরিত্র বীরাঙ্গনা হয়ে উঠেছেন। সমসাময়িক কালে গড়ে ওঠা কেচ্ছা-কাহিনিগুলিতে বনবিবি নারায়ণীর মধ্যে তেজস্বিনী নারীর প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেলেও অন্যান্য নারীরা ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

সীতা দীর্ঘদিন লঙ্কায় বন্দি থেকে স্বামীর কাছে ফেরার পর সমাজের সামনে অগ্নিপরীক্ষা দিয়েছে। তবুও তাঁর কলঙ্ক রামচন্দ্র দূর করতে পারেননি। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা নানাভাবে সমাজের সামনে সতীত্বের পরীক্ষা প্রদান করেও কলঙ্ক ঘোঁচেনি। গুলালবিবি সাত বছর বনবাস করলেও তাঁকে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে দেখা যায়নি। খুশি মনেই স্বামীর সঙ্গে তিনি গৃহে ফিরেছেন। কৌতূহল জাগে দীর্ঘ বনবাসের পর গুলালবিবি স্বামীর সঙ্গে গৃহে ফিরে নির্দয় সমাজের হাত

থেকে কি আদেও রেহাই পেয়েছেন! রামচন্দ্র ক্ষমতাবান এবং ধর্মবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি, ধনপতি সওদাগর বৃত্তবান মানুষ অথচ তাঁরা তাঁদের প্রাণাধিক স্ত্রীদের সামাজিক লাঞ্ছনা, কুরুচিপূর্ণ আচরণ থেকে বাঁচাতে পারেননি। সমাজের বিষদন্তের কামড় থেকে এবরাহিম স্ত্রীকে বাঁচাতে পেরেছেন কিনা কিংবা গুলালবিবির বনবাস নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠেছে কিনা কবি বিষয়টি তুলে ধরলে তখনকার সমাজে মুসলমান মেয়েদের সামাজিক অবস্থানটা আমাদের কাছে স্পষ্ট হত। বনবিবি পিতা-মাতার সঙ্গে ভ্রাতা শাজঙ্গলিকে গৃহে ফিরতে নিষেধ করে নিজেও ফেরেননি। এক্ষেত্রে কবি তাঁর প্রতিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

পণপ্রথার মতো সামাজিক কুপ্রথায় বলি হয় অনেক মেয়েই। মা বনবিবির কৃপায় দুখে প্রভূত ধনসম্পত্তির মালিক হয়ে গিয়েছে। তার প্রয়োজন ছিল না বিয়েতে যৌতুক নেওয়ার। অথচ ধোনা কন্যার বিয়েতে বহুল পরিমাণে যৌতুক দিয়েছে দুখেকে সন্তুষ্ট করতে।

দুখেকে শুপিল ধোনা বেটি আপনার।। খুসিতে মোহিত হইল অন্দর বাহার*
দেহাজ যৌতুক ধোনা বেশুমার দিল।। মহা ধুমধামে নওশা বিদায় হইল*[৩৬]

কিছু সংসারে মেয়ের এবং তার পিতার সম্মান নির্ভর করে পণ দেওয়ার উপর। পণ দিয়ে একটি মেয়ের বিয়ে দিলে পণের শিকার একা কন্যা নয়, কন্যার পিতা-মাতাও। কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা কষ্টে উপার্জিত অর্থ অন্যের হাতে তুলে দেয় কন্যা শ্বশুর বাড়িতে সুখে থাকবে এই আশায়।

পিতৃতন্ত্র এই বিশেষ ব্যবস্থার দ্বারাই মেয়েদের চিন্তাভাবনা, চলাফেরা, পোশাক-আশাক, আড্ডা, গল্প, হাসিকান্না নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা নারীদের অনেক লাঞ্ছনা, অপমান থাকলেও কিছু নারী আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। পিতৃতন্ত্রের জাঁতাকলে পড়ে বনবিবির শৈশব কালটি ছিন্নভিন্ন হলেও নিজের ক্ষমতাবলে 'আঠারো-ভাটির মা' হয়ে উঠেছেন। রাজশ্রী বসু বাসবী চক্রবর্তী সম্পাদিত *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা* গ্রন্থে বলা হয়েছে-

পিতৃতন্ত্র শুধু পিতা বা পুরুষের অনুশাসন নয়, পিতৃতন্ত্র হলো নারীর ওপর পুরুষের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখার সামাজিক উপায়।[৩৭]

মা নারায়ণী বনবিবির সঙ্গে দক্ষিণরায়ের যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছেন। তাঁর মতে একজন নারীর কাছে জিতে-যাওয়া মূল্যহীন এবং হারলে অখ্যাতি। নারায়াণী

মেয়েদের সম্বন্ধে এমন ধারণা পোষণ কোরে নিজের ক্ষমতাকে ক্ষুদ্র করেছেন। তিনি দক্ষিণরায়কে বলেছেন-

লড়াইতে যাব আমি, আওরতের সাথে না লড়িবে।।
কপালেতে আছে যাহা, অবশ্য হইবে তাহা, হেরে আইলে অক্ষ্যাতি হইবে*
তুমি কথা রাখ মেরা মানে হানি হবে তারা, তুমি থাক আমি যুদ্ধে যাই।।
কহে এয়ছা রায়মনী খেতি নাই হারি যিনি, তোমাকে যাতে দিব নাই*[৩৮]

উনিশ শতকে নারীর এমন মানসিকতা হতাশ করে। মেয়েদের সম্মান যে পুরুষের সমান নয় তা মেয়েরাই মনে করে। অথচ ঊনবিংশ শতকে বিদ্যাসাগর, রামমোহনের মতো বেশ কিছু মহাপুরুষ মেয়েদেরকে পুরুষের সমকক্ষ বানানোর জন্য সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে, তাদের জন্য লড়াই করেছেন। সমাজে তাদের আধিকারগুলিকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ আগেও লক্ষ করা গিয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষি। সুলতানা রিজিয়া (১২০৫-১২৪০) ছিলেন ইলতুৎমিসের কন্যা। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি দক্ষ সৈন্য হিসেবে নিজের বীরত্ব দেখিয়েছেন। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ (জন্ম- ১৯ নভেম্বর, ১৮২৮; মৃত্যু- ১৮ জুন, ১৮৫৮) ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিপ্লবী নেত্রী হিসেবে পরিচিত। সাহিত্যে প্রমিলা, শ্রীখণ্ডী যুদ্ধ করেছেন পুরুষদের সঙ্গেই। সেক্ষেত্রে তাঁদের আমরা বীর নারী হিসেবেই দেখেছি।

কেবলমাত্র নারীদের বঞ্চনার কথা বললে সমাজের সম্পূর্ণ রূপ উঠে আসে না। তাই পুরুষদের কথাও বলতে হয়। রাবণ সীতাকে হরণ করলে রামচন্দ্রের প্রতিটি মুহূর্ত যন্ত্রণায় কেটেছে। তাঁকে উদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছে এবং কলঙ্কও দূর হয়নি। প্রজানুরঞ্জনের জন্য সীতাকে বনবাসে দিয়ে আমৃত্যু তিনি বিচ্ছেদকষ্ট পেয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনাকে সমাজের কাছে সতীত্বের পরীক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি ধনপতিকে অপমানিত হতে হয়েছে।

বণিক-সমাজমধ্যে রাঘাই ইতর।
কত তিরস্কার করে সভার ভিতর।।
রাঘাইর বচনে প্রিয়া পাইনু বড় লাজ।
হেঁট মুণ্ডে রৈনু আমি জ্ঞাতি সমাজ।।[৩৯]

এবরাহিম গুলালবিবিকে বনবাস দিতে বাধ্য হয়েছেন প্রথম স্ত্রীর প্ররোচনায়। সাতবছর সেকারণে তাঁকে কষ্ট পেতে হয়েছে। সন্তান লাভের জন্য এবরাহিমকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে

হয়েছে। অথচ ফুলবিবির শর্ত মানায় সন্তানদের বুকে চেপে পিতৃসুখ অনুভব করতে পারেননি। সন্তান হারা মা যখন দুখেকে হারানোর বেদনায় অন্ধ, কালা হয়ে ধুলায় গড়াগড়ি খেয়েছে তখন দুখেও মায়ের কাছে না ফিরতে পারার জন্য কষ্ট পেয়েছে। সংসারে সতিনকাঁটা দেখা দিলে হরিহরের মতো এবরাহিমেরও শিবের নীলকণ্ঠ ধারণের মতো অবস্থা হয়েছে।

ধোনা মৌলের মতো মানুষও সমাজে লক্ষ করা গিয়েছে। মায়ের মন ভুলিয়ে ধোনা তার একমাত্র সম্বল দুখেকে মোম-মধু সংগ্রহ করতে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছেন। জলাজঙ্গলময় সুন্দরবনে বাঘের উপদ্রপে মানুষের প্রাণ যে-কোনো মুহূর্তে চলে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। অর্থের প্রত্যাশায় দুখে সেখানে গিয়েছে। জলকাদা ভরা প্রাকৃতিক পরিবেশে নানা বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ধোনার সঙ্গে তার অন্যান্য সঙ্গীরাও গিয়েছে। এইভাবে ভাটির দেশে মানবজীবন জীবনঘাতী পেশায় নিযুক্ত হয়ে আছে। জঙ্গলে দক্ষিণরায় দুখেকে দেখে নর রক্ত খাওয়ার সাধ হয়েছে। কঠোর জীবনসংগ্রামের পাশাপাশি তাদের একটি পরিবার আছে। সেই পরিবারের মানুষজন তাদেরই ফেরবার অপেক্ষায় বসে থাকে। সংসারে অভাব, অনটন তাদের নিত্যসঙ্গী। তারা ফিরলে তবে সংসারের অন্য মানুষেরা খেতে পাবে। দুখের মা যেমন একমাত্র সন্তানের জন্য অধীর ভাবে অপেক্ষা করেছে। সুন্দরবনে প্রায় প্রতিটি ঘরে আর্থিক দুরবস্থার কারণে শিশুরাও কাজে নিযুক্ত হয়ে যায়। চায়ের দোকান, মিষ্টির দোকান, হোটেলে, কেউবা গরু চড়াতে সারাদিন কাটিয়ে দেয়। দুখে সংসারের অভাব দূর করার জন্য গরু চরিয়ে বেড়িয়েছে। সংসারের হাল ধরতেই সে ধোনার সঙ্গে বিপদসঙ্কুল জঙ্গলে যেতে রাজি হয়েছে।

যারা জঙ্গলে যায় তাদের পরিবারের লোক জঙ্গলে যাবার আগে এবং যতদিন জঙ্গলে থাকে ততদিন বিবিধ পূজাচার ও সংস্কার পালন করে। সুন্দরবনকে ‘মা বনবিবির মহল’ বলে। যে নৌকায় বনজসম্পদ আহরণে-যাওয়া হয় তাকে ‘মায়ের মন্দির’ বলে মনে করা হয়। নৌকার ‘গলুই’ অংশে মায়ের মন্দির বা ‘থান’ নির্মিত থাকে।[৪০] হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে যারা সুন্দরবনে মহাল করতে যায় তারা মা বনবিবিকে স্মরণ করে পুজো করে।

সুন্দরবন অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকায় বনবিবিকে ঘিরে বিশেষ সংস্কৃতি গড়ে উঠছে। সুন্দরবনের অরণ্য ভীতি থেকে কাল্পনিক চরিত্র বনবিবি উঠে এসেছে। বনবিবির পুজো ও

হাজতের পাশাপাশি তাঁকে কেন্দ্র করে মেলা হয়। এই অঞ্চলের জেলে, বাউলে, মউলে, কাঠুরিয়া প্রমুখ জঙ্গলজীবী মানুষ বনবিবির পুজো হাজত দেয়। কোথাও নিত্য পুজো হয়।

বনবিবির মাহাত্ম্য-কাহিনি নিয়ে বিভিন্ন পালাগান পালাগায়করা গেয়ে থাকেন। লোকদেবতার পূজানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে দেবদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক পালাগান আসরে পরিবেশিত হয়। অতীতে কতিপয় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ পালাগানগুলিকে পাঁচালি আকারে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লিপিবদ্ধ করেছেন। চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি গবেষক ড. দেবব্রত নস্কর লোকদেবতাকেন্দ্রিক পালাগানগুলিকে 'পাঁচাল গান' বা পিরুলী গান' এবং গানের দলকে 'পাঁচাল গানের দল' বা 'পিরুলী গানের দল' বলেছেন।[৪১] তিনি জানিয়েছেন- চব্বিশ পরগনায় লোকায়ত দেবদেবীকেন্দ্রিক পালাগানগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়- ১) পাঁচালি পালার ধারা (হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী দেবদেবী অবলম্বনেও ২) কেচ্ছা-কাহিনির ধারা (পির, গাজি, বিবি মাহাত্ম্য অবলম্বনে)। কিন্তু উভয় প্রকার পালাগানই লোকসমাজে 'পাঁচাল গান' নামে পরিচিত। পাঁচালি শব্দের অর্থ গীতিকাব্য বিশেষ বা গীতাভিনয় বিশেষ।

বনবিবির পালাটি সৃষ্টি হয়েছে ভাটির দেশকে কেন্দ্র করে। ভাটির দেশ তথা চব্বিশ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের লোকসমাজের অনেক পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। বনবিবি ভাটির প্রধান। আঠারো-ভাটিতে তিনি সবাকার মা। সুকুমার সেন বনবিবি সংক্রান্ত আলোচনা করতে গিয়ে নামকরণ করেছেন 'আঠারো-ভাটির পাঁচালী'।[৪২] সেখানে বনবিবি পালার কাহিনি, *গাজী কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* নিয়ে আলোচিত হয়েছে। বিনয় ঘোষ বলেছেন-

> নদনদীবহুল বাঙলা দেশের ভাটা দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হয় বলে সমুদ্রকূলবর্তী দক্ষিণদেশ ভাটিদেশ নামে পরিচিত ছিল। চব্বিশপরগণা থেকে বাখরগঞ্জ পর্যন্ত সমগ্র নিম্নবঙ্গের নাম ছিল 'বারভাটি' 'অঠারভাটি' ইত্যাদি।... সমুদ্রের তুফান-ঝড়-বন্যায় অনেক সময় ভাটি অঞ্চল ডুবে গিয়েছে, আবার ভেসে উঠেছে। সুন্দরবনের জমিও অনেকবার বসে গিয়েছে।[৪৩]

অধ্যাপক সুজিত কুমার সম্পাদিত *বনবিবির পালা* গ্রন্থে বলা হয়েছে- নদীর ভাটা দক্ষিণ দিকে বয়ে যায় তাই সুন্দরবন নিম্নদেশ বা ভাটির দেশ।[৪৪]

জলা জঙ্গলময় সুন্দরবন অঞ্চল। জলে কুমির এবং ডাঙ্গায় বাঘ, এই নিয়ে মানুষ কঠোর জীবনসংগ্রাম করে চলেছে। সংসারে তাদের নিত্য অভাব। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছর পরেও

অনেকের স্যাঁৎসেঁতে মাটির ঘরে দিন কাটে। নিত্য অভাবের মাঝেও দেখা যায় শোষণের ছবি। সুদখোর, মহাজন, পুরোহিত, সরকারি কর্মচারী, প্রতিবেশী, রাজনৈতিক নেতা কোনো না কোনো ভাবে তাদের ঠকায়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জন্য অনেকেই প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হয়। সুন্দরবনের মানুষদের দুঃখকষ্ট, রোগ, মৃতু, বিপদ, বিপত্তি, দুর্বিপাক, দুরবস্থা থাকলেও এদের আনন্দ, শান্তি, পরিতৃপ্তি আছে। এত কষ্টের মধ্যেও তারা উৎসব পালন করে, আমোদ-আহ্লাদে যোগ দেয়। মেলা, পার্বণ, সঙ, গাজন, পাঁচালি, যাত্রা, পুতুলনাচ, তর্জা, টপ্পা, আখড়াই, নামকীর্তন, খেলাধুলা, নাচগান, ঘোড়াদৌড়, কাছিটানা প্রভৃতি নানা সংস্কৃতি চর্চাও করে।[৪৫]

সুন্দরবনের মানুষ বিবি, গাজি, পিরপীরানি, ফকির, দরবেশ এই নিয়ে মেতে থাকে। এ তথ্যের দৃষ্টান্ত আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি, গাজী কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে আছে। আঞ্চলিক কবিতাতেও এই দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। প্রদীপ কুমার বর্মণের লেখায় ফুটে উঠেছে।

হাজীবাবা গাজীবাবা গোঙ্গাদেবীর থানে
ভোরে ওটে মেটো বাতাস পীর-পীরালি গানে
নদী-নালা খানা ডোবা বোন-বাদাড়ের দেশে
শত দুঃখি মানুষ একেন পোরান খুলে হাসে।[৪৬]

নিত্য অভাবের মাঝেও মানুষ একটু বিনোদন পেতে চায়। পির, গাজি, বিবিকে কেন্দ্র করে পুজো ও মেলা হয়। এইসব নিয়ে সুন্দরবনের ছোটো থেকে বৃদ্ধ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মেতে ওঠে। গাভির প্রথম বাচ্চা হলে তারা প্রথম পানযোগ্য দুধ নিয়ে আজও মানিকপিরের ঢিবিতে ঢেলে দুগ্ধস্নান করায়।[৪৭] শীতলা, কালী, মনসা, বনবিবি, পির, গাজি, বাস্তুপুজো এবং মেলা হয়। মেলাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীরা অর্থের মুখ দেখতে পায়।

সুন্দরবনের মানুষ জলে নৌকা নিয়ে জলজ ও বনজসম্পদ আহরণে বের হয়। এখানে সম্পদ সংগ্রহকারীরা এক কাল্পনিক দৈবশক্তিকে বিশ্বাস করে জীবন, জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। তারা মান্যতা দেয় মা বনবিবিকে। এছাড়া আছেন দক্ষিণরায়, নারায়ণী, বিশালাক্ষী, বদরপির, প্রভৃতি। জঙ্গলে যারা কাঠ সংগ্রহে যায় তারা কখনো একা যায় না। বনদপ্তরের অনুমতি নিয়ে আবার কখনও চুরি করে ৭-৮ জন মিলে একটি দল নিয়ে যায়। সংগৃহীত

সম্পদের সমান ভাগ তারা করে। যেমন ভাবে ধোনা ও মোনা দলবল নিয়ে মোম-মধু সংগ্রহে গিয়েছেন।

একটু খুঁজে দেখলে সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক শিল্পীও পাওয়া যাবে। বহু যাত্রার দল, অসংখ্য শিল্পী, নাট্যকার, পালাকার, পালাগায়ক এখানে দেখতে পাওয়া যাবে। বর্তমানে পালাগায়ক যাত্রাগায়কের সংখ্যা অনেক কমে যাচ্ছে। মানুষ নগরমুখী হচ্ছে বিভিন্ন কাজের সন্ধানে। বছরের একটা নিদিষ্ট সময়ে হওয়া যাত্রাগান বা পালাগান গেয়ে তাদের সারাবছর সংসার চলে অতি কষ্টে। তাদের ঘরে ছেলেমেয়েরা এখন লেখাপড়া শেখার ফলে আর এই পেশায় নিযুক্ত হতে চায় না। এককালে যাঁরা দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা, জমিদার সাজতেন এখন তাঁরা অনেকেই ঠিক মতো খেতে পান না। রোগের ওষুধ পান না। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যে কোনোরকমে টিকে আছেন।[৪৮]

## ৪.গ. খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর গ্রন্থে সমাজচিত্র:

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর গ্রন্থে তৎকালীন সমাজচিত্র উঠে এসেছে। মুসলমান ফকিরের হিন্দুদের জোর পূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। গোরাচাঁদের কথা না শুনলে তিনি অভিশাপের ভয় দেখিয়েছেন। পির ফকিরকে নিয়ে সমাজে বেশ কিছু অলৌকিক কাহিনি ছড়িয়ে আছে তার প্রতিফলন রয়েছে এই গ্রন্থে। তাদেরকে নিয়ে সাধারণ মানুষের ধারণা খুব ভালো ছিল না তেমনি তাদের অলৌকিক ক্ষমতাকে বিশ্বাস করেছে। তাই তাদেরকে অনেকেই ভয় ও ভক্তি করেছে।

গোরাচাঁদের জন্ম দিল্লীর একটি মুসলমান পরিবারে। মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অমায়া জঙ্গলে উপস্থিত হয়েছেন। এখানে অনাহারে কাটানোর পর বালেণ্ডানগরে গিয়েছেন। চন্দ্রকেতু রাজাকে নিজের অসাধারণত্বের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু রাজা তাঁকে গুরুত্ব দেননি। তিনি রাজাকে মুসলমান হতে বললে রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মত জানিয়েছেন। পির তাঁকে অভিশাপ দিয়েছেন। ফকিররা ইসলাম ধর্মপ্রচার করতে আসতেন এই ঘটনা তার প্রমাণ। গোরাচাঁদ এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

পয়দা চৈয়দ কুলে গোরাই নাম ধরি।।　　তুড়িয়া কুফর যত মুসলমান করি*
মেরা বাত নাহি রাখ,　　　　দেমাগ করিয়া থাক,

সব তেরা যাবে দাহপড়ি।।

ঝুট না জানিবে তুমি, বদ দোওয়া যে দিলাম আমি,

যেয়ছা তুমি করিলেন যে আড়ি।।

পীরের সেই বদ দোওয়ায়, চন্দ্রখেতুর রাজা তায়,

এখানে বিরান তাহাতে হইল।।[৪৯]

এরপর গোরাচাঁদ ছোন্দলকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণরায়ের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। পিরের মুখে চন্দ্রকেতু রাজার পরাজয়ের কথা শুনে খুশি মনে দক্ষিণরায় নিজের রাজত্ব ভাগ করে দিয়েছেন এবং ভক্তি করেছেন।

গোরাচাঁদ অসহায় মানুষকে উদ্ধারের জন্য হাতিয়াগড় গিয়েছেন। সেখানে আকানন্দ নামে একজন রাজা এবং তাঁর ভাই বাকানন্দ প্রত্যেক দিন একটি করে মানুষ মেরে খায়। রাজ্যের মানুষকে তারা শান্তিতে বসবাস করতে দেয় না।

মমিন কহে দেশের রাজা বাকানন্দ রায়।। দিন গেলে সে একটি মানুষ ধরে খায়*

আমরা যতেক প্রজা তাহার আমলে।। একান্ত তলব মোরে যাইতে দেউলে*

মাতা পিতা বন্ধু ভাই খাইল একে২।।[৫০]

গোরাচাঁদ থাকবার জন্য মুসলমান পরিবার খোঁজেন। কোনো হিন্দু বাড়ি তাঁদেরকে আশ্রয় দেয়নি। অনেক খুঁজে তাঁরা একটি মুসলমান পরিবারের সন্ধান পেয়েছেন আশ্রয়ের জন্য যেখানে মালিকের নাম মোমিন। মোমিনের পূর্বপুরুষদের রাজার হাতেই মৃত্যু হয়েছে। পির গোরাচাঁদ তাকে উদ্ধার করতে চাইলেও সে বিশ্বাস করতে পারেনি। এই ঘটনায় ফকিরের উপর মানুষের অবিশ্বাসের চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। মোমিন পিরকে অসম্মানকর কথাও বলে।

আমার তলব চিঠি তুমি কেন যাবে।।

বুঝিয়া ফিকির করে খানা পানি খাবে*[৫১]

গোরাই সমস্ত অপমানকে জয় করে মোমিনকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আকানন্দের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অর্দ্ধেক গলা কেটে গিয়েছে।

গোরাচাঁদের কষ্ট দেখে কবিলা গাই তাঁর উপর নিজের দুধ ঢেলে দিয়ে কষ্ট কমানোর চেষ্টা করেছে। কানু ও কিনু ঘোষ দুই গয়লা কবিলা কম দুধ দেওয়ায় তাকে নিগ্রহ করেছে। পির এসব দেখে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং অভিশাপ দেওয়ার কথা বললে কানু ও কিনু ঘোষ তাঁর

কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে। গয়লাদের ক্ষমা করে দিয়ে গোরাচাঁদ গোর খুলতে বললে তারা সমাজের ভয় পেয়েছে। তাদের জাতিকুল চলে গেলে সমাজ পায়ে ঠেলবে। রাজার বাড়ি খবর গেলে রাজা ঘরবাড়ি কেড়ে নেবে। পির তাদের আশ্বস্ত করলে তারা তাঁর জন্য কবর খোলে। চোর মারফত রাজার কানে খবর পৌছায়। রাজা তোড়লমনকে আদেশ দিয়েছেন গয়লাদের ধরে আনবার। বাদশা তাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনায় তৎকালীন সমাজের সুশাসন ব্যবস্থা নজরে আসে। পরের দিন বিচার হবে শুনে গয়লাদের স্ত্রীরা গোরে গিয়ে শোক করলে গোরাচাঁদ বাদসাকে স্বপ্ন দিয়ে সমস্ত ঘটনার বিবৃতি দিলে বাদসা তাদেরকে বেকসুর খালাস করে দেয়। তারপর থেকেই সকল গয়লারা মিলে গোর পোক্ত করে দেয় এবং কবরে দুধ ঢালতে লাগে।

সেই হইতে আজতক যত গোওয়ালানে।।
হামেসা ঢালেন দুধ খোসালিত মনে*[৫২]

বাদসার নির্দেশে পেয়ার বালেণ্ডায় জায়গির বসিয়েছেন। সেখানকার মানুষদের তিনি সুখে বাস করার সুযোগ, তিন সন কর মাপ করে দিয়েছেন। পেয়ার চোর ডাকাতকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে উপযুক্ত ন্যায় ব্যবস্থা করেছেন। গোরাচাঁদের নির্দেশে মানুষকে জলের সুবিধের জন্য পেয়ার প্রজাদের দিঘীও খনন করে দিয়েছেন। এ যেন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কালকেতুর নগরপত্তনের দৃশ্য।

## ৪.ঘ. সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিতে সমাজচিত্র:

সত্যপির একজন কাল্পনিক পির অথচ কাহিনিগুলি থেকে পিরের প্রতি মানুষের ভক্তির কথা উঠে এসেছে। সত্যপির হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসমন্বয়ের দেবতা। হিন্দুর ঠাকুর সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানদের পির একই ব্যক্তি। তাঁরা আলাদা কেউ নন। কবিদের মধ্যে সেই ধর্মীয় ভাবনা সর্বদা কাজ করে চলেছে। তাঁরা এক গভীর ভাতৃত্বের বন্ধনে জড়িয়ে রয়েছে তা বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা রয়েছে। সত্যপিরের সঙ্গে তাঁর ভক্তদের গভীর সম্পর্কের কথা উঠে এসেছে। অন্যদিকে সামাজিক হিংসা, দ্বেষ, বিশ্বাসঘাতকতা, অবক্ষয়ের কথা উঠে এসেছে।

কুমারী মায়ের গর্ভে সত্যপিরের জন্ম হয়েছে। কুমারী অবস্থায় গর্ভধারণ সমাজের কাছে লজ্জার। পিতা-মাতা, ভাই, গুরুজন সকলের কাছে সন্ধ্যাবতীকে নিন্দিত হতে হয়েছে। লজ্জা

ঢাকতে সন্ধ্যাবতীকে রাজ্য ছাড়তে হয়েছে। সাপে কামড়ে মৃত্যু হয়েছে বলে সকলে প্রচার করেছে। তাঁর পিতাকে কোতাল কলঙ্কমোচনের উপায় হিসেবে বলেছেন-

কোতত্তাল বলে রাজা বুদ্ধি নাহি তোর।। সন্ধ্যার সমান একটা মুরত গঠ তারে*
নুর নদীর ঘাটে তাটে বাল্ল ঘাট দিয়া।। সাধ করহ তার গাতিগণ লিয়া*
সন্ধ্যাবতী মৈল বলি সকলে জানিবে।। এমন প্রকারে তার কলঙ্ক ছাপিবে*[৫৩]

একটি মেয়ের সুরক্ষা তার পিতা-মাতা, ভাই, দাদা, পরিবার, আত্মীয় কেউ দিতে পারেনি। বারবার সন্ধ্যাবতীকে সেকারণে বিলাপ করতে দেখা গিয়েছে, কিন্তু সমাধান পাননি। গর্ভবতী হয়ে অসহায়ের মতো ঘুরে বেরিয়েছেন। বনবিবির কাহিনির গুলালবিবির মতো তার বনবাস করতে হয়েছে।

সন্ধ্যাবতীর কাহিনিটি বাস্তবধর্মী ভাবে কবি উপস্থাপন করেছেন। এখানে অলৌকিকতা কম রয়েছে অন্যান্য পির, ফকির কাহিনির থেকে। বনবিবির কাহিনিতে দেখা গিয়েছে গুলালবিবি গর্ভাবস্থায় বনবাস করলেও তাঁর কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। হুরেরা এসে আহার জোগান দিয়েছে। বনের পশুরা তাঁকে সর্বদা সাহচর্য দিয়েছে। পরিবারের কাছে তিনি প্রতাড়িত হলেও আল্লা সর্বদা তাঁর প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। বনের মধ্যে নিরাপদে তিনি যমজ সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কিন্তু সন্ধ্যাবতী বনে বাস করার অনুকূল পরিবেশ পাননি। বনের পশুরা তাঁকে খেতে গিয়েছে। সবার কাছে বাঁচবার জন্য তিনি অনুনয় করেছেন। ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে গিয়েছেন। খাবারের সন্ধান পেলেও রান্না করে খেতে হয়েছে। কবি কৃষ্ণহরি দাস একটি মেয়ের সামাজিক অবস্থানটি বাস্তবসম্মতভাবে তুলে ধরেছেন।

সমুদ্রে বাণিজ্যে যাত্রার প্রসঙ্গ মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যগুলিকে স্মরণ করায়। সেই বাণিজ্যযাত্রার বর্ণনা রয়েছে সত্যপিরের মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে। যেমন- দ্বিজ রামধন প্রণীত *সত্য নারায়ণের পুথি*, মোছান্নেফ মুনশী ওয়াজেদ আলি *সত্য পীরের পুথি*, কৃষ্ণহরি দাস রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*।

এখনও বাংলার বিভিন্ন জায়গায় সত্যপিরের পুজো হয়। গৃহের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, গৃহের মঙ্গল, নবদম্পতির মঙ্গল, পুত্রসন্তান প্রাপ্তি, ধন প্রাপ্তির জন্য সত্যপিরের পুজো দেওয়া হয়।

আটকুড়ার পুত্র যদি হয় সত্য ভাবে।। নিধনের ধন হয় পীরের অভাবে*[৫৪]

মানুষের বিশ্বাস অনাচারী মানুষের শাস্তি সত্যপির দেন। তাই মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে তিনি এক কচ্ছপকে বলেছেন-

বিধবা হইয়া তুমি কচ্ছমাস খাইলা।। সেই অপরাধে ফলে কচ্ছবিনী হইলা*
আমার পরসে তোর পাপ হৈল দূর।। পুষ্পরথে চড়ে তুমি যাও স্বর্গপুর*[৫৫]

মোছান্নেফ মুনশী ওয়াজেদ আলির রচিত *সত্য পীরের পুথি*-তে সুন্দরকে বারবার হত্যা করেছে তার বৌদিরা। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে মানুষকে হত্যা করতে তারা পিছুপা হয়নি। তাদের মধ্যে সর্বদা পৈশাচিকতা কাজ করেছে। প্রত্যেকবারই সে প্রাণ ফিরে পেয়েছে সত্যপিরের কৃপায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষ করা গিয়েছে যে সত্যপির সুন্দরের বৌদিকে না আটকে সুন্দরকে রক্ষা করেছে। বৌদিরা তাদের কৃতকর্মের ফল হিসেবে স্বামীদের কাছে মৃত্যুদণ্ড পেয়েছে, কিন্তু সেটিতেও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখানে আইনের শিথিলতা লক্ষ করা গিয়েছে। যে সুশাসন ব্যবস্থা *পীর গোরাচাঁদ*-এর কাহিনিতে লক্ষ করা গিয়েছে তা এই মুদ্রিত পুথিটিতে নেই। গোরাচাঁদকে গয়লারা কবর দিলে তাদেরকে দেশের শাসক শাস্তি দিয়েছে। বনবিবির কাহিনিতে বনবিবি আঠারো-ভাটির রক্ষাকর্তী। তিনি দক্ষিণরায়ের অপরাধের শাস্তি দিয়েছেন।

সমাজে জাতপাত ভেদাভেদের এবং তার পরিণামের কথা সত্যপির ও হীরার কথোপথনে জানা গিয়েছে।

হীরা বলে মোর হাতে কেহ নাহি খায়।। তুমি যে খাইতে চাহ শুনি লাগে ভয়*
অধম মুচার কুলে জনম আমার।। মোর হাতে জল কেহ না করে আহার*
সত্যপীর বলে মোর জাতি ভেদ নাই।। যে জন ভক্তি করে তার হাতে খাই*[৫৬]

সত্যপির যেমন আর্ত মানুষের পাশে থেকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন তেমনি রেগে গেলে অভিশাপ দেন বলে মানুষ বিশ্বাস করেন।

মোগল আমি জবর কারী, সকলের জাত মারি, আছে আমার কলমার জোর*
... ... ...
সত্যপীর ক্রোধ হৈল, মোগলের শাপ দিল, আচম্বিতে চক্ষু হৈল কানা[৫৭]

শিকড় নিয়ে ওষুধ তৈরি করে অসৎ কাজে ব্যবহার করার ঘটনা রয়েছে। সওদাগরের ভাই সুন্দরকে তার বৌদিরা মাথায় ওষুধ মাখানো শিকড় লাগিয়ে দিয়ে সোয়াপাখি করে রেখেছে। রাজকন্যা সত্যপিরের মাধ্যমে জানতে পেরেছে তাদের ঘরের সোয়াপাখিটি আসলে সুন্দর। তার মাথায় ওষুধ মাখানো শিকড় খুলে দিলেই আবার মনুষ্য রূপ ধারণ করেছে।

এত বলি ঔষধের আনিল শিকড়।। বান্ধিয়া দিলেক জড়ী মস্তক উপর*
এমন শিকড় বেন্ধে দিল দুই জনে।। পক্ষী করে উড়াইল সাধুর নন্দনে*[৫৮]

মোছান্নেফ মুনশী ওয়াজেদ আলির রচিত *সত্য পীরের পুথি*-তে জ্যোতিষ গণনার প্রসঙ্গ বারেবারে লক্ষ করা গিয়েছে। *পীর গোরাচাঁদ* কিংবা *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথিতে*-ও এই চিত্র লক্ষ করা গিয়েছে। গ্রাম্য কুসংস্কারগুলি বর্ণিত হয়েছে সমস্ত কাহিনিতে। পদ্মের উপর পদ্ম, লাল জিনের সুন্দর ঘোড়া, কলশি ভরা পুকুরের ঘাট, ডান দিক থেকে শৃগাল বামদিকে বেঁকে যাওয়া, লাল ফুল নিয়ে মালিনী যাওয়া প্রভৃতি শুভক্ষণ দেখে বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গ রয়েছে। দুর্বল মানুষের উপর সবলের অত্যাচার লক্ষ করা গিয়েছে। বাড়ির কর্তা ব্যবসার কাজে বাইরে গেলে পরিবারের দুর্বল মানুষের উপর বাকি সদস্যরা অত্যাচার করেছে।

পির, ফকিরের কাহিনিগুলিতে বৈবাহিক সম্পর্কগুলি গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন- গাজির সঙ্গে চাম্পাবতীর বিবাহ, সুন্দরের সঙ্গে বিমলার বিবাহ। সন্ধ্যাবতীর বিবাহ না হয়েও গর্ভবতী হওয়ায় সমাজে লাঞ্ছনা পেয়েছে। প্রত্যেকটি বিবাহের মধ্য দিয়ে সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। হিন্দু ঘরের কন্যার সঙ্গে মুসলমানের বিবাহ যেমন সমাজ মানে না তেমনি রাজার কন্যা উপযুক্ত পাত্র হওয়া সত্ত্বেও কাঙালের গলায় মালা দিলে মানুষের দ্বারা নিন্দিত হয়।

সত্যপিরের বেশকিছু কাহিনিতে দেখা গিয়েছে মানুষের মনে সত্যপির কিংবা সত্যনারায়ণ এক, কিন্তু তিনি ভক্তের একমাত্র আরাধ্য দেবতা নয়। হিন্দু কবিদের লেখা গ্রন্থে দেখা গিয়েছে হিন্দু ভক্তরা অন্যান্য দেবদেবীদেরও আরাধনা করে। কোন দেবতার পুজো করলে বিপদ মুক্তি হবে কিংবা অভিষ্ট লাভ করবে সেই নিয়ে তারা দ্বিধান্বিত। মুসলমান ভক্তদের মনেও সেই সংশয় দেখা গিয়েছে। তারা পির ফকিরের কেরামতি দেখে ভক্তি করেছে। ভয় পেয়ে সম্মান করেছে, কিন্তু মনে প্রাণে শ্রদ্ধা করে আল্লাকে। পির, গাজি, বিবিও আল্লার মহিমা প্রচার করেছে।

সত্যপির আর্ত মানুষের সেবা করেন, বিপদ মুক্ত করেন, বিবাহ দেন, ধনসম্পত্তি দেন; কিন্তু তিনি বরখান গাজি, বনবিবি, গোরাচাঁদের মতো প্রতাপশালী নয়। তিনি যুদ্ধ করে, ক্ষমতা দেখিয়ে তাঁর পুজো প্রচার করেননি। তিনি মানুষকে সহযোগিতা করে নিজের মহিমা প্রচার করেছেন। তাই সত্যপির বাংলায় প্রায় প্রত্যেক ঘরের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে পেরেছে। প্রতিটি পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনিগুলি তৎকালীন সামাজিক দলিল হিসেবে গুরুত্ব অপরিসীম।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১৮

২। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৮৩

৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

৫। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে 'সাগরসংগমে নবকুমার' অংশে গঙ্গাসাগরে একজন মা সন্তান বিসর্জন দিয়ে আর তুলতে পারেনি।

দ্রষ্টব্য: বিশ্বাস, তপনকুমার (প্রকা.), *কপালকুণ্ডলা,* ১৪২৩, স্পেকট্রাম অফসেট, কলকাতা, পৃ.৬

৬। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৬১

৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'সভ্য ও অসভ্য' গল্পে আমেরিকার এক আদিম নিবাসী তাঁর যৎসামন্য সম্বল দিয়ে ইউরোপীয় এক সভ্য ব্যক্তিকে রাত্রীকালীন বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিলেন।

৮। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৫৬

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬

১০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫

১২। পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৪

১৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২

১৫। মুখোপাধ্যায়, তরুণ (সম্পা.), *হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বৃত্র-সংহার,* জুন ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ৮২

১৬। সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৪

১৭। মুখোপাধ্যায়, সুখময় এবং গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর (সম্পা.) 'মহুয়া পালা', *ময়মনসিংহ-গীতিকা,* জানুয়ারি ২০১০, ভারতী, কলকাতা, 'প্রেমের জয়' অংশ, পৃ. ২০

১৮। দত্ত, শ্রী কালিদাস, 'বড়খা গাজির গান', *ভারতীয় লোক-যান,* শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল (সম্পা.) ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, কলকাতা, পৃ. ২৬

১৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

২০। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ৪৩

২১। বসু, রাজশ্রী, চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* ২০১৪, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, পৃ. ১৯৬

২২। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ২১

২৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩

২৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ২

২৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪

২৬। গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবনবীক্ষার আলোকে,* ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। তিনি উদ্ধৃত উক্তিটি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল,

অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রাদেব সম্পা., প্রথম সংস্করণ ১৩৮৪, পৃ. ২০ গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছেন।

২৭। মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা,* জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, পৃ. ৭৯

২৮। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০

২৯। ভট্টাচার্য, শ্রী সুধীভূষণ, *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গল চণ্ডীর গীত* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৬৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ২০২

৩০। রায়, ভারতচন্দ্র, 'অন্নদামঙ্গল', *ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের গ্রন্থাবলী,* দে ব্রাদার্স (প্রকা.), ১৩২৯ সাল, হিন্দুপ্রেস, কলকাতা, 'বসুন্ধরার জন্ম' অংশ পৃ. ২৩৫

৩১। ওঝা, কৃত্তিবাস, 'শ্রীরাম পাঁচালী', *রামায়ণ,* ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ৪৮২

৩২। খতের, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা (মেছুয়া বাজার স্ট্রীট), পৃ. ১০

৩৩। পাল, শ্রাবণী, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য,* পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃ. ১৪১

৩৪। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯

৩৫। পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৪

৩৬। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৪৬

৩৭। বসু, রাজশ্রী, চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* ২০১৪, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, দ্রষ্টব্য: ভূমিকা অংশ।

৩৮। সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি,* ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ১৬

৩৯। ভট্টাচার্য, শ্রী সুধীভূষণ, *দ্বিজ মাধব রচিত মঙ্গল চণ্ডীর গীত* (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৯৬৫, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ২০২

৪০। দ্রষ্টব্য: নস্কর, দেবব্রত, *সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ,* ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ২০৫

৪১। পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৪২। সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৭৩

৪৩। ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি* (তৃতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ১৯৯৪, প্রকাশভবন, কলকাতা, পৃ. ১০৩

৪৪। মণ্ডল, সুজিত কুমার, *বনবিবির পালা,* মার্চ ২০১০, গাঙচিল, কলকাতা। তিনি লিখেছেন-

> ভাটির দেশ কেন "আঠারো" ভাটি হল জানা যায় না। তবে মুসলমান পির-ফকিরদের কাছে 'আঠারো' সংখ্যাটি বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে যেমন: আঠারো মোকাম, আঠারো চিজ প্রভৃতি। পির-পিরাণির পুণ্যভুমি ভাটিরদেশ তাই পবিত্র দেশ বোঝাতে 'আঠারোভাটি' নামে অভিহিত হয়েছে মনে হয়। কারও মতে , আঠারোবার ভাটিতে নৌকা বহিয়া যে দেশের এক সীমা হইতে আর এক সীমা পর্যন্ত অতিক্রম করা যায় তাহাই আঠারোভাটি প্রদেশ। পৃ. ২৪২

৪৫। হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা* (প্রথম খণ্ড), ২০০১, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, পৃ. ১৪

৪৬। মণি, কালীপদ (সম্পা.), 'ওওরসূরি', *বাদাবনের পাঁচালি,* ২০০৭, প্রিয়নাথ প্রকাশনী, দ. ২৪ পরগনা, পৃ. ৮৭

৪৭। হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা* (প্রথম খণ্ড), ২০০১, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, পৃ. ১৫

৪৮। হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা* (প্রথম খণ্ড), ২০০১, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা, পৃ. ১৬

৪৯। নেওয়াজ, খোদা, *পীর গোরাচাঁদ*, (প্রকাশক এবং প্রকাশকাল অজ্ঞাত) গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃ. ৩

৫০। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬

৫১। পূর্বোক্ত, পৃ. ৮

৫২। পূর্বোক্ত, পৃ. ২১

৫৩। দাস, কৃষ্ণহরি, 'সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি', *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), ড. রমাপ্রসাদ নাগ ও এন জুলফিকার (সম্পা.), অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পৃ. ৩২৬

৫৪। আলি, মুনশী ওয়াজেদ, 'সত্য পীরের পুথি', পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭৪

৫৫। দাস, কৃষ্ণহরি, 'সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩১

৫৬। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

৫৭। পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪২

৫৮। শ্রী কবিবল্লভ, 'সত্য-নারায়ণের পুথি', পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১০

# পঞ্চম অধ্যায়

## বাংলার পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক নির্বাচিত মাহাত্ম্য-কাহিনি: কাব্যগুণ বিশ্লেষণ

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি, বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি, পীর গোরাচাঁদ* কিংবা মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা) গ্রন্থে দেখা যায় সেখানে সুনির্দিষ্ট একটি কাহিনি রয়েছে। পরিসমাপ্তি উপন্যাসের মতোই মিলনাত্মক মনে হয়েছে। কাহিনির মধ্যে দৃঢ়বদ্ধ গঠন এবং কার্যকারণ শৃঙ্খলা রয়েছে। একটি পরিণতির দিকে অগ্রসর হয়েছে। প্লট যৌগিক এই কারণেই মূল কাহিনিকে শিল্পসৌকর্য করতে এক বা একাধিক উপকাহিনির নির্মাণ রয়েছে। ঘটনা ও চরিত্রের নিবিড় সম্পর্ক লক্ষ করা গিয়েছে।

কবিগণ যথাযথ সংলাপ ব্যবহার করে কাহিনি ও চরিত্রের বিন্যাস ঘটাতে পেরেছেন। আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ ঘটিয়ে সংলাপের মধ্যদিয়ে চরিত্রদের আবেগ, অনুভূতি, সুখ-দুঃখের কথা ব্যক্ত হয়েছে। বাংলা শব্দের পাশাপাশি আরবি, ফারসি, হিন্দি, তুর্কি, বিভিন্ন শব্দের মিশ্রণ যা সমসাময়িক সমাজের ভাষার ছাঁদকে তুলে ধরেছে। কিছু শব্দ অভিধানে খুঁজে পাওয়া যায়নি আঞ্চলিকতার জন্য তা বোঝা গিয়েছে। এই আঞ্চলিক শব্দের জন্য সংলাপ হয়ে উঠেছে আরও প্রাণবন্ত।

কাহিনির পটভূমি কোনো একটি নির্দিষ্ট নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পটভূমিতে নতুন একটি কাহিনি গড়ে উঠেছে। গ্রাম বাংলার নদীনালা, গাছপালা, জঙ্গল, মসজিদ, কখনো বা রাজপ্রাসাদের কোনো এক কক্ষে ঘটনা ঘটতে দেখা গিয়েছে।

উপন্যাসে মানুষের জীবনের নানা অসঙ্গতি, সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, কৌতুকের সমন্বয় ঘটান ঔপন্যাসিক। কবিগণ শব্দ বা কথা সাজিয়ে পাঁচালির ঢঙে পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে নির্মাণ করেছেন কাব্য। তাঁরা শব্দচয়নে খুব বেশি অলংকার প্রয়োগ না করলেও করেছেন। যতটা সহজ স্বাভাবিক ভাবে লেখা যায় তাই লিখেছেন। কিছু আটপৌরে আঞ্চলিক শব্দও ব্যবহার করেছেন। যার জন্য আঞ্চলিক সাহিত্য হিসেবে থেকে গিয়েছে। গ্রন্থের প্রথম থেকে শেষপর্যন্ত অন্ত্যমিল বজায় রেখে যাওয়াটা কম প্রতিভার বিষয় নয়।

আব্দুর রহিম সাহেব, খোদা নেওয়াজ, মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি, শ্রী কবিবল্লভ, কৃষ্ণহরি দাস, দ্বিজ রামধন, প্রমুখ কবিদের কাব্যে সৃজনশীলতা, বস্তুনিষ্ঠতা, সংবেদনশীলতা, জীবনরস তন্ময়তা রয়েছে। তাঁরা তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল যা একজন ঔপন্যাসিকের সাধারণ গুণাবলি।

মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে নাটকীয় উপাদান বা নাট্যরস অনেকখানি রয়েছে। তাঁরা এই সমস্ত কাব্যরচনা করেছেন রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্রণালী অনুসারে। বিষয়বস্তুতেও অনেক মিল রয়েছে। আব্দুর রহিম সাহেবের *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে পাত্রপাত্রীর নানা কথোপকথন রয়েছে। সেখানে কবির বিবৃতিও রয়েছে। যেমনটা রয়েছে বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে। এই কাব্যের মতোই বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র, বিচিত্র নাট্যদৃশ্যের মধ্যদিয়ে কাহিনির অগ্রগতি হয়েছে। সেখানে রয়েছে নাটকীয় দ্বন্দ্ব। নাট্যকার অন্তরালে থেকে যেন পাত্রপাত্রীর মুখ দিয়ে বক্তব্য বলেছেন আর পাঠক তা উপভোগ করেছে। এখানে বিভিন্ন চরিত্র রয়েছে, কিন্তু মূল চরিত্র তিনটি যেমন- গাজি, কালু ও চাম্পাবতী। বিভিন্ন ঘটনায় কথোপকথনের সময় তিনটি চরিত্রকে কোনো না কোনো ভাবে নিযুক্ত দেখা গিয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁদের সঙ্গে অন্য কোনো চরিত্রের নাট্যগুণ সমন্বিত কথোপকথন রয়েছে।

প্রত্যেকটি মুদ্রিত কাহিনিতে নাটকীয় গুণ রয়েছে। কাহিনিগুলি জনসমাজে পালাগান, গীতিনাট্য, যাত্রা হিসেবে পরিবেশন করা হয়। সেখানে নাটকীয় গুণ না থাকলে দর্শকের ভালোলাগবে না। দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্যই কাহিনির মধ্যে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। সুখ-দুঃখ, হাসিকান্না, কমিক সব কিছু মিলিয়ে পাঠককে আকর্ষিত করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনা, চরিত্র, বিচিত্র নাট্যদৃশ্য ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একপ্রকার দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি তৈরি করাই উদ্দেশ্য। *পির গোরাচাঁদ*-এ গোরাচাঁদকে কেন্দ্র করে ভিন্ন কাহিনি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ বহু দৃশ্যের সমাগম রয়েছে। বিভিন্ন দৃশ্যে বিভিন্ন নাটকীয় চমক কবি দেখিয়েছেন। কাহিনিটিও সংলাপধর্মী। সেখানে কবির বিবৃতিও রয়েছে। সত্যপিরের মুদ্রিত পুথিগুলিতে নাটকীয় উপাদান রয়েছে। সত্যপিরের জন্মকেন্দ্রিক নানা ঘাতপ্রতিঘাত রয়েছে। এছাড়াও তাঁর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বিভিন্ন কাহিনি রয়েছে যেখানে নাটকীয় উপাদান রয়েছে বলা যায়।

প্রাচীনযুগের সাহিত্য এবং মধ্যযুগের সাহিত্য রচিত হয়েছে সুরতাল সহযোগে। চর্যাগীতিতে রাগরাগিণীর উল্লেখ রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে অভিনয়যোগ্য নাটগীত বলা হয়।

মঙ্গলকাব্যগুলি পাঁচালির ঢঙে গাওয়া হত। আরাকান রাজসভার কবি দৌলত কাজি ও আলাওল পাঁচালি রীতিতেই কাব্যরচনা করেছেন। দৌলত কাজির *লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না* কাব্যে বারবার 'পাঁচালী' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনিগুলি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা। এখানে আড়া, আদ্ধা, ঠেকা তালের উল্লেখের পাশাপাশি ধুয়োর ব্যবহার রয়েছে অর্থাৎ সমগ্র গ্রন্থটি গান করবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছে। ধুয়ো ব্যবহারের মধ্য দিয়ে কবি কাহিনির গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন। চমৎকারিতা এবং পাঠক মনে টানটান উত্তেজনা বৃদ্ধি করতে কবি এর ব্যবহার করেছেন। কবি প্রতিবারই কাহিনির বিশেষ মুহূর্তে ধুয়ো ব্যবহার করেছেন।

আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে বিভিন্ন রসের সন্নিবেশ লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন- শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র। গাজি, কালু ও চাম্পাবতীর জীবনের নানা কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে বেশ কিছু চরিত্র সৃজনের মাধ্যমে। চরিত্রগুলির ব্যবহারিক আচরণের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন রসের উদ্রেক হয়েছে। ফকিরের জীবনের দ্বিধাজর্জর নিয়ে সৃজিত হয়েছে বিভিন্ন রসের। বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা হাস্যরসের প্রাধান্য দেখা গিয়েছে। কবি অনেক অসঙ্গতি ও অস্বাভাবিকতার মধ্য দিয়ে হাস্যরসের অবতরণ ঘটিয়েছেন। রস বিচারে এই গ্রন্থটি শ্রেষ্ঠ বলা যেতে পারে। বালক গাজির উপর পিতা সেকেন্দরের অমানুষিক অত্যাচার পাঠকের মনে করুণরস, অদ্ভুতরস, ভয়ানকরস, রৌদ্ররসের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এছাড়া গাজির সঙ্গে দক্ষিনাদেও কিংবা মটুক রাজার যুদ্ধে বীররসের আধিক্য লক্ষ করা গিয়েছে। গাজি ও চাম্পাবতীর প্রেমের মধ্য দিয়ে শৃঙ্গাররসের প্রাধান্য পেয়েছে।

আব্দুর রহীম সাহেবের লেখা *বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি কিংবা* মোহাম্মদ খাতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরানামা* গ্রন্থে করুণরসের আধিক্য লক্ষ করা গিয়েছে। বনববি সংক্রান্ত মুদ্রিত কাহিনিতে করুণরসের পাশাপাশি বীররসের প্রাধান্য রয়েছে। মা বনবিবি ও তাঁর ভাই শাজঙ্গলী আঠারো-ভাটি দখলের উদ্দেশ্যে গিয়ে নারায়ণীর সঙ্গে বনবিবির তুমুল লড়াই হয়েছে। বনবিবি ও নারায়ণী দুজনেরই বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

*পীর গোরাচাঁদ*-এ বীররস, করুণরসের আধিক্য রয়েছে বলা যায়। গোরাচাঁদ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে দেশান্তরে বেরিয়েছেন। আকানন্দ ও বাকানন্দের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়েছে। আকানন্দের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর অর্ধেক গলা কেটে গিয়েছে। তাসত্ত্বেও তিনি মরণ-পণ যুদ্ধ করে দুই রাক্ষসকে বধ করে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করেছেন। অর্ধেক গলাকাটা অবস্থায় তাঁর করুণ দৃশ্য কবি বর্ণনা করেছেন। সেই অবস্থায় তিনি যুদ্ধ করেছেন। কাটা অংশ থেকে গড়িয়ে পড়া রক্ত নিজের জামা দিয়ে মুছেছেন। এর থেকে পাঠকের মনে ভয়ের সঙ্গে বিস্ময়েরও সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টি হয়েছে অদ্ভুতরস, ভয়ানকরস এবং করুণরসের।

## ৫.ক. ভাষা, ছন্দ ও বৈয়াকরণিক পর্যালোচনা:

বাংলা সাহিত্যে প্রধান স্রোতের পাশাপাশি অপ্রধান সাহিত্যের নিদর্শনগুলিও আমাদের অতীতকে ধরে রেখেছে তাদের ভাষা, ছন্দ, অলংকার, প্রবাদ-প্রবচন ও বিষয়বস্তুতে। বাংলায় হিন্দু, ইসলাম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের ভাষায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় দেশি, বিদেশি অনেক শব্দ অঙ্গীভূত হয়েছে। এই সমস্ত মিশ্রভাষা সাহিত্য-শৈলী নির্মাণে সহায়তা করেছে। ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ পুথি সাহিত্যকে 'মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য' বলেছেন। ১৩২৪ সালে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি জানিয়েছেন-

> পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটলে পুথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হত।[১]

আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি, গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি,* মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরানামা,* খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ,* জয়রদ্দির *মানিক পিরের জহুরানামা* তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই গ্রন্থগুলিতে আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি, দেশি, তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম প্রভৃতি ভাষার ব্যবহার রয়েছে। সম্ভবত কবিগণ যে সমাজে কাটিয়েছেন সেখানে আঞ্চলিক ভাবে এইসব ভাষার প্রয়োগ ছিল। এছাড়াও *দীপন* পত্রিকায় সত্যপিরের যে মুদ্রিত পুথি, পাঁচালির পরিচয় পাওয়া গিয়েছে সেখানে ভাষার বিভিন্ন বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে। ভাষা ব্যবহারের এই বৈচিত্র্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভাষার প্রেক্ষাপটগুলিকে বিচার করে দেখা দরকার।

আরবি ফারসি ব্যবহারের প্রসঙ্গে আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান গ্রন্থে* বলেছেন-

> ষোড়শ শতাব্দীর পরে বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে শুধু মুসলমান নয়, অমুসলমান কবিদের রচনায়ও তা ঘটতে থাকে। অন্যান্যের মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণরাম দাস ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের বিশেষ উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। স্থান বিশেষে বিশেষ পরিবহ সৃষ্টির জন্য তাঁরা প্রচুর আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহার করেছেন। এ সময়ের অনেক মুসলমান কবির রচনায় আরবি-ফারসি শব্দের সাধারণ ও স্বাভাবিক প্রয়োগ দেখা যায়।[২]

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় হিন্দু মুসলমান এক হয়ে একত্রে জীবনযাপন করে চলেছে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও। তাদের জীবনের দুঃখ, ব্যথা ও আনন্দ প্রকাশের নানা ধারা বয়ে চলেছিল এই স্রোতের বাইরে। সাধারণ জীবনে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে সাহিত্যের মুখ্য স্রোতের বাইরে সাধারণ কবিপ্রতিভার যতটুকু বিকাশ ঘটেছিল সেগুলিতে কবির বা সাহিত্যকারের আঞ্চলিক ও উপভাষাগত বা অন্যান্য সামাজিক ও ধর্মীয় ভাবনার গভীর সম্পর্কের চিত্র রয়েছে সর্বত্রই। সেখানে কখনও ধর্মের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লোকায়ত জীবনের অনেক কিছুই এক ধর্মের আঙিনা থেকে অন্য ধর্মের আঙিনায় বয়ে গিয়েছে। এই জাতীয় সাহিত্যে ভাষার উপরিতলের কাঠামোটি লোকমুখের কাছাকাছি, তাই এর ভাষা উদ্দিষ্ট পাঠক বা শ্রোতার জীবনধারাতেই বয়ে চলে। সে কারণে এর ভাষায়, শব্দচয়নে যেমন ঔপভাষিক প্রভাব থাকে তেমনি তার মধ্যেও আরও স্বল্পপরিসরের আঞ্চলিকতা থাকে। এটিই তার মধ্যে একধরণের অনন্যতা আনে। জহুরানামার ছত্রে ছত্রে সেটি স্পষ্ট। আরও একটি বিষয় এখানে প্রকাশ পেয়েছে। তা হল প্রত্যেক ভাষাভাষীই তার নিজস্ব একটি ভাষিক জগতে বাস করে। সেখানে তার ঐতিহ্য, জাতিবর্ণ, লিঙ্গগত-সামাজিক অনুভূতি, ঐক্য-অনৈক্য, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা ও একটি বিশেষ জীবনদর্শনের রসে জারিত হয়ে থাকে। সেগুলিই তার দৈনন্দিন জীবনের ভাষিক ছন্দে গাথায় বাইরে এসে পরস্পরের মধ্যে ঐক্য ও সংহতির আবেদন জানিয়ে যায়। এই জহুরানামা সেই সাক্ষ্য বহন করছে।

জহুরানামার ভাষাবৈচিত্র্য, আখ্যানের গঠন বা আঙ্গিকগত দিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। শৈলীতত্ত্বের নিরিখে দেখা হয়েছে বিশেষণ প্রয়োগের বিশিষ্টতা, ধ্বন্যাত্মক শব্দের

প্রয়োগ, চিত্রকল্প, অলঙ্কার। আখ্যানরীতির আলোচনায় কথনশৈলীর প্রসঙ্গ এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে বৈচিত্র্যময় কথনরীতির ব্যবহার।

**আব্দুর রহীম সাহেব প্রণীত *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-র গঠনবৈশিষ্ট্য:**

*বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি* ঊনবিংশ শতকের আঞ্চলিক ভাষার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে। এটি তেরশো পাঁচ সালে লেখা। বিষয়বস্তুর মধ্যে অনেক শব্দ বা পদ আপাত দৃষ্টিতে বানান ভুল জনিত ত্রুটি বলে মনে হবে। আসলে ঐ সময়ে এইরূপ উচ্চারণের পৃথকতা ছিল বলে অনুমিত হয়। সাধারণ মানুষের বা লোকসমাজের মুখের ভাষার দৃষ্টান্ত হিসেবে এগুলি বিবেচনার যোগ্য। যেমন- জেহেল খানায়, কেলশে, হশ হারা, হসরেতে, ছেপাই, দোছরা, শারাব প্রভৃতি। এমনি অজস্র শব্দ পাওয়া যাবে (দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট- ১)।[৩] এগুলি কবির দৈনন্দিন জীবনের শব্দভাণ্ডারের মধ্যে এসে ঠাঁই করে নিয়েছে। বিশেষ আঞ্চলিকতার আর একটি সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর শব্দবন্ধের ব্যবহারে। যেমন–

আটকুড়ি বাজা মোরে সকলে কহিবে। (পৃ. ৪)
কাটারি মারিলি (পৃ. ৩৫)
কুড়ালি গলায় বেন্ধে (পৃ. ৩৮) ইত্যাদি।

**সাধু ও চলিত বাংলার প্রভাব:**

ঊনবিংশ শতকে মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষা হিসেবে গড়ে ওঠেনি সেভাবে। গদ্য সাহিত্যে বা কাব্য কবিতা রচনার ক্ষেত্রে সাধু ও চলিত মিশ্রণের প্রাচীন উপকরণের ব্যাপকতা ছিল। বাংলা কবিতার ভাষা সাধু, চলিত মিশ্রভাষা। এই গ্রন্থে সাধু ও চলিত শব্দের মিশ্রণ রয়েছে। সাধারণত ক্রিয়াপদ, সর্বনামপদ, তৎসম ও তৎভব শব্দের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ হয়ে থাকে। যেমন-

করিয়া (ক্রিয়া)> করে

আসিয়া (ক্রিয়া)> এসে

করিল (ক্রিয়া)> করল

হইল (ক্রিয়া)> হল

তাহার(সর্বনাম)> তার ইত্যাদি।

চাক ভাঙিবার যবে যাইবে বনেতে।।    মেরা নাম লিবে ভাঙিবার প্রথমেতে*
তাহা বাদে দিবে হাত মধুর ভাণডারে।।  মৌমাছি উড়িয়া ভাগিয়া যাবে দুরে*
আর এক বাত আছে কহি তুঝে এবে।।  একজনে সাথে লিয়া বনেতে যাইবে*
নাহি দিব মোম মধু তোমাকে ভাঙিতে।।  তামাসা দেখিবে ঘুরে ফিরে জংগলেতে* (পৃ.- ২৬)

সাধুভাষার শব্দ– যাইবে, লিবে, দিবে, উড়িয়া, ভাগিয়া, কহি, লিয়া, নাহি দিব, ভাঙিতে, দেখিবে, তাহা বাদে প্রভৃতি। চলিত শব্দ- যাবে, আছে, জেনে, এসে, প্রভৃতি। আঞ্চলিক শব্দ- এয়ছা, যেয়ছা, দোছরা, ছামনেগোটা গ্রন্থের যত্রতত্র এই জাতীয় ব্যবহার রয়েছে। শব্দচয়নে এই গ্রন্থের ভাষা অধ্যাপক সুকুমার সেনের মতে 'এছলামি বাংলা'[৪]। ইংরেজ আমলের শুরু থেকে কলকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবি, ফারসির সঙ্গে বাংলা ও হিন্দির মিশ্রণ খুব ঘন হয়েছিল তখনকার সেই গ্রন্থের ভাষা যথার্থ 'এছলামি বাঙ্গাঁলা'।

গওসিয়া কিংবা ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত লোকদেবতাকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলিতে সাধু ও চলিতের একত্র ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। ভাষার ছাঁদে কবিতার ভাষার প্রাচীনত্বের প্রভাব যেমন ছিল তেমন অন্যান্য বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের নানা ধরণের যে কাব্যসাহিত্য ছিল তার ছাপ রয়েছে। আব্দুর রহীম সাহেব *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি, গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি, বোন বিবী জহুরানামা, পীর গোরাচাঁদ*-এর ভাষায় এই রীতিরই প্রভাব লক্ষ করা গিয়েছে। খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর গ্রন্থে সাধু ও চলিতের দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হল-

পহেলা আরজ করি নামেতে আল্লার।। চৌদা ভুবন বিচে যার অধিকার*
খালেক মালেক সেই গফুরের রহিম।। জলিল জব্বর তিনি কুদরত আজিম*
তার কুদরতের সিমা কে কহিতে পারে।। আমি কি লিখিব যাহা পয়গম্বর নারে* (পৃ.-১)

মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেবের *বোন বিবী জহুরা নামা*-র কাহিনি লেখা সমাপ্ত হয় বারোশত সাতাশী সাল কার্ত্তিক মাহার অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। এখানে সাধু, চলিত ভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে। কয়েকটি লাইন নিম্নে উদ্ধৃত হল।

আল্লা পাক পরোয়ার,    সৃজন পালন যার
তার তারিফের বানি,    আমি কি কহিতে জানি,

এমন ক্ষমতা কোথা মোর*
পহেলা আপন নুরে,        নুরনবী পয়দা করে
ফের সেই নবীর নুর হইতে।।
চৌদা ভুবন বিচে,        যত কিছু সব আছে ,
সৃজিলেন আপন কৃপাতে* (পৃ.- ১)

প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর *আলালের ঘরের দুলাল* (১৮৫৮খ্রি.) রচনা করেন। তিনি প্রথম সাধুভাষার পাশাপাশি কলকাতার কক্‌নি ভাষা অর্থাৎ চল্‌তি বুলি এবং আঞ্চলিক উপভাষার সাহায্য নিয়েছেন। ঠিক তেমনি লক্ষ করা যায় অষ্টাদশ শতকের শেষ থেকে রচিত পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে সাধুভাষার সঙ্গে চলিতভাষা কিংবা আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছে। ১৮৬২ সালে কলকাতার চলতিবুলি অবলম্বন করে কালী প্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোম প্যাঁচা ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে পূর্ণ কাহিনি রচনা করেছেন। তিনি *হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায়* চলতিকথা ব্যবহার করেছেন। খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ* রচনা করেন ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে। প্যারীচাঁদ মিত্র কিংবা কালীপ্রসন্ন সিংহের সমসাময়িক কালে রচিত হয়েছে গ্রন্থটি।

**মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের সাহেব প্রণীত *বোন বিবী জহুরা নামা-র* গঠনবৈশিষ্ট্য:**

এই মুদ্রিত গ্রন্থে কবির বিবৃতি যেমন আছে তেমনি চরিত্রের মুখেও কবি সংলাপ বসিয়েছেন। এখানে সাধু, চলিত, আঞ্চলিক শব্দ, এছাড়া আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু ভাষার শব্দ উঠে এসেছে। শিশির কুমার দাস ‘আখ্যানের বাক্য’ শীর্ষক রচনায় বিবরণাত্মক বাক্য ও চরিত্রদের কথোপকথনধর্মী সংলাপ আখ্যানের এই দুই ভাগ করে বিবরণাত্মক বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

> ঘটনার সঙ্গে ঘটনার যোগসূত্র ধরিয়ে দেওয়া, তাদের কালানুক্রমিক উপস্থিত করা, অনেক সময় চরিত্রদের শারীরিক মানসিক অবস্থার বর্ণনা দেওয়া, কিংবা বস্তুজগতের বর্ণনা করা[৫]

সংলাপ সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ সরকার বলেছেন-

> সংলাপের মাধ্যমে কাহিনী অগ্রসর হলেও, সংলাপ প্রধানত অন্তর্জীবনের সঙ্গে পাঠকের পরিচিতি ঘটায়। পাত্রপাত্রীর আবেগ-অনুভূতি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হয় সংলাপের মাধ্যমে।[৬]

**কবির বিবৃতি:**

আল্লা পাক পরোয়ার, সৃজন পালন যার, কৃপা তাঁর অসীম সাগর।।
তার তারিফের বানি, আমি কি কহিতে জানি, এমন ক্ষমতা কোথা মোর (পৃ. ১)

কবি এখানে আল্লার মহিমা প্রচার করেছেন।

**চরিত্রের মুখে সংলাপ:**

বেরাহিমে কহে মিয়া বৈস তবে তুমি।। বেটিকে এ কথা আগে পুছে আইসি আমি*

যদি সেহ শুনে রাজি হয় এই বাতে।। সাদী তেরা দেলাইব তাহার সহিতে* (পৃ. ৪)

এবরাহিম বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে গেলে শা জলিল তাঁকে বসতে বলে মেয়ের ইচ্ছার কথা জিজ্ঞেস করতে যাওয়ার কথা বলেছেন।

**স্বগতোক্তিমূলক সংলাপ:**

কহে মোরে ধোনা চাচাজি দে যাবে ঘরে* দেশেতে যাইয়া চাচা ধনবান হবে।।
আমার মা আনাথিনী ভিক্ষা মেঙ্গে খাবে* কান্দিয়া বেটার শোকে কানা অন্ধ হৈইয়া।।
মাটে ঘাটে পড়ে শেষে যাইবে মরিয়া* এই জন্যে নানামতে ভুলাইয়া মোরে।।
এনে ছিলা ধোনা চাচা ভাটির সহরে*' (পৃ. ২২)

ধোনা এবং দক্ষিণরায়ের কথোপকথন দুখে শুনেফেলে। ধোনা কেঁদোখালির জঙ্গলে দক্ষিণরায়ের নররক্ত খাওয়ার লালসা পূরণ করে মোম-মধু নিয়ে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরবে। এইকথা জানতে পেরে সে উপরি উল্লিখিত স্বগতোক্তিটি করেছিল।

**উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ:**

কেন বাছা মা বলিয়া ডাকিলে আমারে।। কহ কি বিপদ এয়ছা ঘটেছে তোমারে*
কহে মোরে ধোনা চাচা আনে ভুলাইয়া।। রায়কে আমারে দিয়া যাবে মধু লিয়া*
রায়মণি বাঘ হইয়া খাইবে আমায়।। এই দুখে পড়ে আমি ডাকি মা তোমায়।। (পৃ. ২৩)

দুখে বিপদে পড়ে মা বনবিবিকে ডাকে। বনবিবি ও তার মধ্যে এই কথোপকথন হয়েছে।

**সমাজের রূঢ় বাস্তবধর্মী সংলাপ:**

কহ কি হুকুম কৈল নবী নেক জাত।। বেরাহিমে কহে বিবী কি কব সে বাত*
শুনিলে দুঃখিত পাছে হওগো অন্তরে।। দোছরা করিতে সাদী কহিলে আমারে*
আওলাদ না আছে বিবী তেরা সেক-মেতে।।বিস্বাস না কর তুমি যদি এই বাতে*
আমাকে হুকুম দেহ- সাদী করিবারে।। তবে যে আওলাদ হইতে পারে মেরা ঘরে* (পৃ.-২)

ফুলবিবির গর্ভে সন্তান না হওয়ায় এবরাহিম দ্বিতীয় বিয়ে করতে চেয়েছেন।

**সাধু, চলিত ও আঞ্চলিক ভাষার মিশ্রণ:**

ফকির জলিল শাহা খোসালিত হইয়া।। গোছল দিয়া বেরাহিমে দুলা সাজাইয়া*
আর আর মহলার লোক যত ছিল।। সেতাবি করিয়া সবে মাঙ্গাইয়া নিল*
বসিল আসিয়া সবে মজলিস করিয়া।। গোলাল আর বেরাহিমে দেলাইতে বিয়া*

...

দুলা ও দুলহীন দিয়া মাবারক দোয়া * বিদায় হইয়া সবে চলে যায় ঘরে।। ( পৃ. ৫)

সাধুভাষার শব্দ- হইয়া, দিয়া, সাজাইয়া, বসিল, আসিয়া, করিয়া প্রভৃতি।

চলিতভাষার শব্দ- ছিল, নিল, যায় প্রভৃতি।

আঞ্চলিক শব্দ- খোসালিত, গোছল প্রভৃতি।

**আব্দুর রহিম সাহেব প্রণীত *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি-র* গঠনবৈশিষ্ট্য:**

**সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ:**

*গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে সাধু, চলিতের মিশ্রণ রয়েছে বহুক্ষেত্রে।

তোমাকে রাজত্ব <u>দিয়া</u> তীর্থে <u>চলে</u> <u>যাব</u> (পৃ. ৩)

কিংবা

কন্যা তারে সুপে <u>দিয়া</u> মহারাজা খোসাল <u>হইয়া</u>,
পাতালেতে চলিয়া যে <u>গেল*</u> (পৃ. ২)

দিয়া, হইয়া, চলিয়া, সাধুভাষা এবং চলে যাব, গেল চলিতভাষা।

**স্বগতোক্তিমূলক সংলাপ:**

কোথা রব বাপ হইল বিপদে আমার* যত দুঃখ দিল বাপে কার কাছে কর।।
নিথুর বাপের দেশ আর নাহি রব* এ দেশ ছাড়িয়া আমি জাব পালাইয়া।।(পৃ. ৯ )

পিতার অত্যাচারে দুঃখ পেয়ে গাজির এমন স্বগতোক্তি শোনা গিয়েছে।

**উক্তি-প্রত্যুক্তি মূলক সংলাপ:**

আমার নিকটে আজি করিবে এ পণ*

পথে ঘাটে দেখা যদি হয় কার সাথে।। তাহাকে ছালাম তুমি নারিবে করিতে*
একথা কবুল যদি নাহি কর ভাই।। রমার সঙ্গেতে আমি আর রব নাই*
... লজ্জিত হইয়া গাজি কহিলেন তবে*
নাহি চিনি কালু ইনি খোয়াজ খিজির।। (পৃ. ১৩)

রাস্তাঘাটে গাজির কারোর সঙ্গে দেখা হলে সালাম করাটা কালুর একেবারেই পছন্দ নয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে গাজি ও কালুর উক্তি-প্রত্যুক্তি লক্ষ করা গিয়েছে।

**কার্যকারণাত্মক বাক্য:**

i) আমি বিনা পুত্র কন্যা নাহি আর।।
মরিবেন পিতা মাতা শোকেতে আমার* (পৃ. ৩)

ii) পাতালের রাজা ছিল দর্প ভরে সে বলিল রাজ কর না দিব কখন।।
তবে শাহা সেকন্দার, লইতে তাহার কর, গেল চলে তাহার ভবন* (পৃ. ২)

iii) এই যে ঐশ্বর্য কি কামে আসিবে।।
মরিলে কিছুই সঙ্গে নাহিক যাইবে * (পৃ. ৫)

ix) যদিচ মরিতে বাছা এসব সেদ্দেতে*
তখনি তেজিতাম প্রাণ খেয়ে বিষ গুলি।। (পৃ. ৮)

v) না পাইলে বাছা মোর প্রাণ হারাইব* (পৃ. ১১)

**বিদেশি ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষার একত্র সমাবেশ:**

বাংলার সঙ্গে আরবি, ফারসি, তুর্কি, উর্দু, শব্দের ব্যবহার রয়েছে। এছাড়াও প্রচুর আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার রয়েছে।

**বাক্য গঠনপ্রণালী:**

বাক্য গঠনরীতি বাংলাকেই অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ থেকে কাহিনি আরম্ভ হয়েছে। তবে বাক্যের লাইনগুলি বাম দিক থেকে শুরু হয়ে ডান দিকে এসে শেষ হয়েছে।

**ছন্দের ব্যবহার:**

কবি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে সম্পূর্ণ গ্রন্থটি লিখেছেন।

পয়ার ছন্দের প্রয়োগ-

> কোকাফ দেশেতে বাস করে পরীগণ।। তার মধ্যে ছয় পরী প্রথম যৌবন*
> লাল পরী নীল পরী আর কালু পরী।। চান পরী সোনাপরী আর ছোট পরী*
> এই ছয় পরী আর পরী লয়ে সাথে।। আল্লার সংসার দেখে আরোহিয়া রথে* (পৃ. ২০)

ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ-

> গাজী কালু এক সাথে, চলিল কানন পথে
> সমুখে সাগর এক পায়।।
> তরণা জাহাজ নাই, তটে বসে দুই ভাই,
> বলে আল্লা পড়িলাম দায়।। (পৃ. ১২ )

এছাড়া দুটি চরণের শেষে মিলের প্রবণতা রয়েছে। যেমন-

> প্রথমে বন্দিনু নাম প্রভু নিরজন।।
> এতিন ভুবনে যত তাহার সৃজন* (পৃ. ১)

প্রথম এবং দ্বিতীয় চরণের শেষে 'জন' রয়েছে অর্থাৎ অন্ত্যানুপ্রাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

আবার

সৃজিয়া সকল জীবে আহার যোগায়।।

সুখ দুঃখ রোগ মৃত্যু তাহার আজ্ঞায়* (পৃ. ১)

এখানে দুটি চরণের শেষে 'আয়' অন্ত্যানুপ্রাস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

**শব্দদ্বৈতের ব্যবহার:**

ব্যাপক শব্দদ্বৈতের ব্যবহার রয়েছে। যেমন- মনে মনে, একে একে, দিনে দিনে, মিঠা মিঠা, টানিয়া টানিয়া, দাউ দাউ, লক্ষ লক্ষ, দ্বারে দ্বারে, ঘরে ঘরে, যায় যায়, আল্লা আল্লা, ধীরেধীরে, চল চল ইত্যাদি।

**প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব:**

খানা পিনা (পৃ. ৯), পাত্র মিত্র (পৃ.  ৯), জানিয়া শুনিয়া (পৃ. ৬), পথে ঘাটে (পৃ. ১৩) প্রভৃতি।

**বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব:**

দিবা নিশি (পৃ. ৫),

**অনুকার শব্দে শ্বব্দদ্বৈত:**

আছাড় কাছাড় (পৃ. ৬)

**উষ্ম থেকে ঘৃষ্ট ধ্বনিতে রূপান্তর:**

উষ্ম ধ্বনি ঘৃষ্ট ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়েছে। যেমন- সালাম> ছালাম

**বিশেষণ পদের ব্যবহার:**

তাহার **পরম** সখা নবী মোহাম্মদ (পৃ. ১)

তাঁর পক্ষে **লক্ষ কোটি** সালাম দরুদ (পৃ. ১)

**ধীরে ধীরে** পুরী মধ্যে পৌছিল গিয়া* (পৃ. ৩)

তব **যোগ্য** কন্যা সেই **পরমা** সুন্দরী।। (পৃ. ৩)

পাইয়া **সুন্দরী** কন্যা জুলহাস সূজন (পৃ. ৩)

সাগর তরঙ্গ উঠে হইয়া **ভীষণ** (পৃ.  ৪)

**চাঁদের মতন** এক শিশু রহিয়াছে* (পৃ. ৪)

**পোষ্য** পুত্র রাণীর যেন সবে তারে মানে* (পৃ. ৪)

**ঘন ঘন** হাই আর মুখে উঠে জল।। (পৃ.  ৫)

**ঢলিয়া** পড়িল কুচ হয় কাল শির* (পৃ.  ৫)

আহারে **কু**পুত্র - মোর ঔরসে হইলে* (পৃ.  ৬)

এখন কাটিব তোরে করে **খান খান*** (পৃ. ৬)

**বড় বড় দশ** হাতী আন সাজাইয়া* (পৃ. ৬)

আল্লাকে ডাকেন গাজী হইয়া **কাতর** (পৃ. ৬)

চারি দিকে জ্বলে অগ্নি **দাউ দাউ** করি (পৃ. ৭)

আসিয়া পুছিল পীর **মধুর ব**চনে।। (পৃ. ৮)

আরও কয়েকটি বিশেষণ হল- **কাল** নিদ্রা (পৃ. ১০), **নির্জ্জন** কানন (পৃ. ১১), কান্দে **উচ্চশ্বরে** (পৃ.১১), **বিরস** বদন (পৃ. ১২)

**সমাস:**

সপ্তদ্বার (পৃ. ১০) (সংখ্যাপূর্ব বহুব্রীহি)

**অলংকার:**

**অনুপ্রাস:**

ক) ওগো আল্লা দয়াময় দয়া কর দীনে (পৃ. ৭)

এখানে ‘দ’ ধ্বনিটি তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। ‘দ’ ধ্বনির অনুপ্রাস ঘটেছে।

খ) মালিয়া মালিনী কান্দে মুখে নাহি বোল (পৃ. ১১)

‘ম’ ও ‘ল’ ধ্বনিটি তিনবার উচ্চারিত হয়েছে অর্থাৎ ‘ম’ এবং ‘ল’ ধ্বনির অনুপ্রাস ঘটেছে।

গ) পড়িয়া সঙ্কট পড়ে, ডাকিছে প্রভু তোরে, কৃপা করি কর মোরে পার* (পৃ. ১২)

‘প’ ধ্বনিটি পাঁচবার উচ্চারিত হয়েছে। ‘প’ ধ্বনির অনুপ্রাস ঘটেছে।

**চিত্রকল্প:**

চিত্রকল্পের প্রয়োগে কাহিনির ভাষা গতিময়তা লাভ করে। শব্দ নিয়ে ছবি এঁকেছেন কবিগণ। চিত্রকল্পের মাধ্যমে তাঁদের অনুভূতিগুলি প্রকাশের অভিমুখ খুঁজে পেয়েছে। *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে চিত্রকল্পের একটি নমুনা দেওয়া হল-

...তবে গাজী কৌতুহলে, মুখে আল্লা আল্লা বলে,
দিল আশা ফেলিয়া সাগরে।।
ভাসে আশা তরী হইয়া দোহে তবে তাতে গিয়া,
বসিলেক হরিস অন্তরে*
সে তরী ভাসিয়া জবে, পবনের আগে চলে,
পার হইয়া গেল নিমীষেতে।।
গাজীকে তটেতে দিয়া, গেল অরী আসা হইয়া,
তুলে গাজী লইলেন হাতে* (পৃ. ১২)

**খোদা নেওয়াজের *পির গোরাচাঁদ*-এর কাহিনির গঠনবৈশিষ্ট্য:**

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর মুদ্রিত কাহিনিটি পাঁচালির ঢঙে লিখিত। কবি প্রত্যেক দুটি চরণের অন্ত্যমিল করেছেন।

পহেলা আরজ করি নামেতে আল্লার।।
চৌদা ভুবন বিচে যার অধিকার*
খালেক মালেক সেই গুফরোর রহিম।।
জলিল জব্বার তিনি কুদরত আজিম*
তার কুদরতের সিমা কে কহিতে পারে।।
আমি কি লিখিব যাহা পয়ম্বর নারে* (পৃ. ১)

আল্লার-অধিকার, রহিম-আজিম, পারে-নারে শব্দগুলি ভেঙে দেখা যাক। আল্লার শব্দটি ভাঙলে দেখা যায় আ + ল্ + ল্ + আ + র্ এরপর 'অধিকার' শব্দটি ভাঙ্গলে দেখা যায়- অ + ধ্ + ই + ক্ + আ + র। 'রহিম' ও 'আজিম' শব্দ দুটি ভাঙলে দেখা যায়- র + হ্ + ই + ম্ এবং আ + জ্ + ই + ম্। 'পারে' ও 'নারে' শব্দ দুটি ভাঙলে দেখা যায়- প্ + আ + র্ + এ এবং ন্ + আ + র্ + এ। বিষয়টি আরেকটু সহজ করে দেখানো যাক। আল্লার ও অধিকার শব্দ দুটির শেষ দুটি শব্দের মধ্যে মিল লক্ষ করা যাচ্ছে, যেমন- আ+র।

| | | |
|---|---|---|
| আ + ল্ + ল্ + (আ + র) | র + হ্ + (ই + ম্) | প + (আ + র + এ) |
| অ + ধ্ + ই + ক্ + (আ + র) | আ+ জ্ + (ই + ম্) | ন+ (আ + র + এ) |

এইভাবে কবি দুটি করে চরণের মধ্যে অন্ত্যমিল দেখিয়েছেন সম্পূর্ণ কাহিনিতে। এটি করা খুব সহজ কাজ নয় তা অনেকেই স্বীকার করবেন। ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতা কিংবা ছন্দবোধ এক্ষেত্রে নজরে আসে।

সম্পূর্ণ কাহিনিটি পড়লে দেখা যায় অনুপ্রাসের প্রাধান্য। কিছুকিছু ক্ষেত্রে অন্ত্যমিল করাতে গিয়ে কবি অসমাপিকা ক্রিয়া চরণের শেষে নিয়ে চলে এসেছেন। অন্ত্যমিল করানোর জন্য জটিল শব্দ ব্যবহার করেছেন। ছন্দের মিলের জন্য শব্দের শেষে বিভক্তি যুক্ত করেছেন। একটি উদাহরণ দিয়ে নিম্নে দেখানো হল-

এই গান গায় মোমিন হয়ে দুঃখ মনে
শুনিয়া ছোন্দল গাজি চলিল তখনে (পৃ. ৭)

মনের সঙ্গে মেলাতে গিয়ে কবি 'তখন' কে 'তখনে' বলেছেন।

গ্রন্থে আরবি, ফারসি, শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে এবং সেই শব্দের ব্যবহারও বাংলায় বিশেষ দেখা যায় না। সে কারণে এই ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের কাছে পাঠ করা বেশ কষ্টসাধ্য। সেক্ষেত্রে আরবি, ফারসি থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরের অভিধান দরকার হয়ে পড়ে। কবির যে বাংলা ভাষার সঙ্গে অন্যান্য ভাষার দখল ছিল একথা বলা যেতে পারে। তাই অন্ত্যমিল করতে গিয়ে শব্দ ভাণ্ডারে খুব কমই টান পড়েছে। সবকিছুকে ছাড়িয়ে তাঁর

অন্ত্যমিল করার দক্ষতাকেই প্রশংসা করাই বোধহয় শ্রেয়। কবি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে পাঁচালি রচনা করেছেন বেহাগ রাগিণী ও আড়া[৭] তালে। এর থেকেই বোঝা যায় কবি গায়ক ছিলেন।

প্রভু বিনে ত্রিভুবনে কে আছে আমার।
অধীনের কৃপা করি করিবে নিস্তার (পৃ. ৭)
(রাগিণী বেহাগ তাল আড়া)

কবি ধুয়ারও ব্যবহার করেছেন। যেমন-

হায় বিধি কি হইল গো আমায়।
পড়িয়া সঙ্কটে মোর বুঝি প্রাণ যায়।। (পৃ. ১৪)

**শব্দদ্বৈতের ব্যবহার:**

বহুল শব্দদ্বৈতের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে খোদা নেওয়াজের পির গোরাচাঁদ-এর কাহিনিতে। যেমন- হায়২ (পৃ. ৬), ধীরে২ (পৃ. ৭), লড়িতে২ (পৃ. ১৩), তিলে২ (পৃ. ১৭) এছাড়া রয়েছে জার২, হায়২, জনে২, আপনা২। কবি মূল শব্দটি লিখে পাশে ২ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ শব্দটি দুবার পড়তে হবে।

**বিপরীতার্থক দ্বন্দ্ব:**

রাতদিন (পৃ. ২৫), ছোটো বড়ো (পৃ. ২৯), দিবস রজনী (পৃ. ২৯),

**প্রায় সমার্থক দ্বন্দ্ব:**

টাকা কড়ি (পৃ. ৩০), দানা পানি (পৃ. ২৮), গরীব কাঙ্গাল (পৃ. ৩০)

খোদা নেওয়াজ গোরাচাঁদের মাহাত্ম্য দেখাতে গিয়ে ভিন্ন খণ্ডকাহিনি নিয়ে এসেছেন। এখানেই কবির কৃতিত্ব। কবি হয়তো পালাগানের জন্যই এইভাবে নির্মাণ করেছেন। কিংবা সমাজে যেসব পালা করে গোরাচাঁদের মাহাত্ম্যগীত গাওয়া হত তা নিজের ভাষা দিয়ে প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

**বিশেষণের ব্যবহার:**

দোহাই দিয়া রাম হাজরা ডাকে **উচ্চস্বরে**।। (পৃ. ২৪)

যদি কেহ মোর তরে বলে **মন্দ** বাণী।। (পৃ. ২৫)

এতেক কহিল শাহা বচন **নিষ্ঠুর** (পৃ. ২৫)

**হেট** মাথায় বৈসে পেয়ার **বিরস** বদন।।(পৃ. ২৬)

উচ্চস্বরে, মন্দ, নিষ্ঠুর, বিরস এই পদগুলি বিশেষণ পদ।

**সাধু, চলিত, আঞ্চলিক ও অন্যান্য বিদেশি শব্দের প্রয়োগ:**

কোটালিয়া বলে মোমিন তোর তরে বলি।। বুঝিতে না পারি কিছু তেরা ঠালি ঠুলি *
না হইল ঝাড় কাম না হইল বাতি।। হেন বুঝি তোর দায় মজিল বসতি*
মোমিন বলে যাও তুমি আপনার ঘরে।। তিন সনের খাজনা পাঠাই একবারে* (পৃ. ৯)

সাধুভাষার শব্দ- বুঝিতে, তেরা, হইল।

চলিতভাষার শব্দ- তোর, বলি, বলে, যাও, পাঠাই।

আঞ্চলিক শব্দ- কোটালিয়া, ঠালি ঠুলি।

**ভাষারীতি:**

**কবির বিবৃতি:**

পহেলা আরজ করি নামেতে আল্লার।। চৌদা ভুবন বিচে যার অধিকার*

খালেক মালেক সেই গফুরোর রহিম।। জলিল জব্বার তিনি কুদরত আজিম*

তার কুদরতের সিমা কে কহিতে পারে।। আমি কি লিখিব যাহা পয়ম্বর নারে*

আমি অতি মুর্খ মতি কিবা বিদ্যা জানি।। (পৃ. ১)

কবি এখানে আল্লার মহিমা প্রকাশ করেছেন।

**উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সংলাপ:**

গোরায় কহ হকিকত হাতিয়া গড় যাইতে হবে কত দিনের পথ*

সত্য করিয়া তুমি কবে মোর কাছে।। হাতিয়া গড় যাইতে কত দূর আছে*

শুনিয়া কহেন রায় গোরাচাঁদের ঠাই।। হাতীগড় যাইবে ছাহেব বেশীদুর নাই* (পৃ. ৩)

**প্রকৃতির বর্ণনা:**

ঠাই২ পুষ্প বোন দীঘি মোনহর।।
নানা পক্ষী কলরব গুঞ্জরে ভ্রমর*
... ... ...
মধুলোভে অলিরাজ উড়িয়া বেড়ায় (পৃ. ৫)

বৈয়াকরণিক বিশ্লেষণের বিচারে *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি, বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি, পীর গোরাচাঁদ*-এর গ্রন্থগুলির ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা এমনকি আঞ্চলিক বাংলারও পার্থক্য বেশ স্পষ্ট। আব্দুর রহীম সাহেব ঊনবিংশ শতকের শেষপদে যখন কাহিনি রচনা করেন তখন বাংলা ভাষার মধ্যে আপাতভাবে স্পষ্ট দুটি বিভাজন লক্ষ করা গিয়েছে। এই বিভাজন দুটির একটি গ্রামের সাধারণ মানুষের মুখের ভাষা যা আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। অপরটি তৎকালীন শিক্ষিত সাহিত্যিকদের লেখ্য ভাষা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যিকদের মার্জিত ভাষা সাহিত্যাকারে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে থাকে এবং প্রতিষ্ঠা পায়। পরবর্তীকালে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্রের মৌখিক চলিতভাষা বাংলা ভাষায় নবজাগরণের মুক্তির স্বাদ আনে। এই সময়ের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখনীতে বাংলা ভাষায় মার্জিত ও বিশিষ্ট রূপ পায়। এরই ফলে ঊনবিংশ শতকে আঞ্চলিকভাষা এবং সেই ভাষায় লিখিত লোকদেবতা মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক গ্রন্থের জৌলুস কমে আসে। অথচ এই ভাষাই অদ্যাপি সাধারণ মানুষের মুখে স্ফুলিঙ্গের মতো বেরিয়ে আসে। ভাষার প্রবাহমানতায় ও সভ্যতার চড়াই উতরাই এ অনেক সময় স্বাভাবিক রূপের পরিবর্তন ঘটে যায়। নতুনের অভিঘাতে পাশ্চাত্যের অনুকরণ প্রবণতায় ভাষার স্বাভাবিক রূপের পরিবর্তন ঘটে। ওসমানিয়া, গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত পালাগানের গ্রন্থগুলি দেশ, কাল, পাত্রে ভাষার দলিল হিসেবে বিশেষ মর্যাদার দাবি রাখে। ভাষার পরিবর্তনের ইতিহাসের অনেক তত্ত্ব সূত্র এই গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায়।

আধুনিক সভ্যতা গড়ে ওঠার কালে নগরায়ণের বাইরে যে বিপুল জনসমষ্টির জীবনধারা ইতিহাসের নানা অমোঘ পরিণতিতে গড়ে উঠেছিল তা বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। তাই তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্যে ছত্রে ছত্রে শব্দচয়নে, বৈয়াকরণিক কাঠামো, অসচেতন ধ্বনিতাত্ত্বিক

রীতির প্রকাশে, শব্দ ও পদ গঠনের রীতি ও বাক্যের শৈলীর মধ্যে একটি পৃথকতা জন্ম নিয়েছিল। পালাগানের গ্রন্থগুলির প্রকাশনা ও তার সাজসজ্জা থেকে কাহিনি উপস্থাপনা, কাহিনির বিষয়বস্তু একটা বিশেষ সমাজের সন্ধান দেয়। যে সমাজটি নতুন করে গড়ে উঠছে একাধিক ধর্মীয় চেতনার সমন্বয়ে। কবির সচেতন একটি প্রয়াস যে এখানে রয়েছে তা স্পষ্ট। আরবি লেখার রীতি অনুসরণ করে গ্রন্থগুলির পৃষ্ঠাগুলিকে পেছন থেকে সামনে সাজানো তাঁর আরবি রীতির কথা যেমন স্মরণ করিয়ে দেয় তেমনি এর পেছনে যে বিশেষ ধর্মীয় জীবনদর্শন রয়েছে তাও বোধ হয় পরোক্ষে ভাবতে উৎসাহিত করে। বিষয়বস্তু যদিও সাহিত্যের মুখ্য বিষয়, এখানে তার প্রকাশভঙ্গি অর্থাৎ এক্সপ্রেশনের স্তরে একই জীবন দর্শনের প্রাধান্যকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ তাঁর দেশীয় জীবনকে একাত্ম ভাবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন নতুন ভাবনার সঙ্গে অর্থাৎ সংহতির প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাই ভাষার ব্যবহারে বিশেষ করে শব্দচয়নে সেই বিশেষতা স্পষ্ট হয়েছে। গ্রন্থগুলির শব্দভাণ্ডারে সেটি স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত। অধ্যাপক সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে শুধু ধর্মসংক্রান্ত ব্যাপারে নয় ঘরসংসারের কাজে এবং সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আরবি-ফারসি শব্দ চলিত ছিল। আজও মুসলমান জনবসতির মধ্যে এই ঝোঁক স্পষ্ট। 'এছলামী-বাঙ্গালা'র সূত্রপাত অংশে সুকুমার সেন বলেছেন-

> অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বাধীন নবাবি আমলের পূর্ব থেকে বাঙ্গালী মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা শিক্ষার প্রসার হতে থাকে। ... সে সময় বাঙ্গালা ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের প্রবেশ প্রায় অবধারিত ছিল। ... শুধু ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে নয় ঘর সংসারের কাজে এবং সমাজের ব্যবহারে বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে অনেক বিশেষ বিশেষ আরবী-ফারসী শব্দ চলিত ছিল। সেই সব শব্দ বাঙ্গালা এগুলি মুসলমান লেখকেরা পরিহার করতে পারে নি। হিন্দুস্থানী ভাষা ও বাঙ্গালা ভাষী মুসলমানের সামাজিক ও গার্হস্থ্য মিলনে কোনো জাতিভেদ ছিল না। সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা হিন্দুস্থানীকে দ্বিতীয় ভাষা রূপে ব্যবহার করতেন। তাই মুসলমান লেখকদের রচনায় সাধু ভাষা থেকে একটু স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছিল কিন্তু তাদের ভাষাকে 'ইসলামি বাঙ্গালা' বলা যায় না[৮]

তিনি আরও বলেছেন-

> ইংরেজ আমলের শুরু হইতে কলিকাতার মজদুর মুসলমানদের ব্যবহার্য গ্রন্থে যখন আরবী-ফারসীর সঙ্গে বাঙ্গালার ও হিন্দীর মিশ্রণ খুব ঘন হইয়াছিল তখনকার সেই গ্রন্থ-ভাষাই যথার্থ 'এছলামী বাঙ্গালা'[৯]

এছাড়াও হিন্দি ও উর্দুর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য থাকায় হিন্দির ব্যবহারেও একটা প্রবণতা ছিল। কবিগণ বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুকে সামনে রেখে নতুন ভাবে ইসলামীয় কাহিনির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সাধারণ ভাবে একটি পথ খুঁজেছেন। এই ধরনের সৃষ্টিতে অচেতন ভাবেই তাঁর নিজের দৈনন্দিন ব্যবহারের ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে দূরে রাখতে পারেননি। শ, স > ছ অর্থাৎ উষ্ম ধ্বনিকে ঘৃষ্ট ধ্বনিতে বা স্বরের অনুনাসিকতার বিলোপ বিষয়গুলি সেটিই প্রমান করে। শব্দ বা পদগঠনের ক্ষেত্রে এটি স্পষ্ট যে ক্রিয়া বা বিশেষ্য ইত্যাদির গঠনে প্রত্যয় বা বিভক্তির ব্যবহারে কখনও আরবি-ফারসি উপসর্গ, বিভক্তি বা প্রত্যয় বাংলার সঙ্গে মিলেমিশে নতুন শব্দ তৈরি হয়েছে। কখনও বিপরীত অবস্থাও দেখা গিয়েছে। অর্থাৎ বাংলার গঠনোপকরণগুলি আরবি-ফারসির সঙ্গে মিশেছে।

সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তুর নিরিখে গ্রাম বাংলার সাধারণের ভাবনারই প্রকাশ লক্ষ করা গিয়েছে। কিন্তু এর ভাষার ব্যাপারে একটি নিজস্বতা যে রয়েছে তা স্পষ্ট। আমাদের ভাষার বিবর্তনের ধারণায় এই ভাষা অন্যতম একটি জহুরানামার ভাষা। এতে যেমন মঙ্গলকাব্য, ভারতীয় সাহিত্যের বনবাসে পাঠানোর রীতির সাক্ষ্য, কষ্টের মধ্য দিয়ে সফলতা লাভ, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, তেমনি এর একটি নিজস্বতা আছে যা মান্য বাংলা দিয়ে ধরা যায় না। এর একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে যাতে একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের আকুতি-মিনুতি অন্যের কাছে পৌছে দিয়ে সমন্বয়ের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে।

*বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি, বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), গ্রন্থ দুটি আলোচনা প্রসঙ্গে সুন্দরবন অর্থাৎ আঠারো-ভাটির ভাষার প্রসঙ্গ এসে পড়ে।[১০] কল্যাণ মণ্ডল সুন্দরবনের ভাষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত তিনি বলেছেন সুন্দরবনের ভাষা সাধারণত পৌণ্ড্র, ক্ষত্রিয় ও অন্যান্য নিম্নবর্গের মানুষের মুখের ভাষা। সুন্দরবনের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা এটি। কিন্তু সমগ্র সুন্দরবনের ভাষাকে ‘জঙ্গলা ভাষা’ বলা চলে না কারণ সেখানে সংস্কৃত শব্দের ভাঙাচোরা ঈষৎ পরিবর্তিত রূপের ব্যবহার রয়েছে। তার সঙ্গে রয়েছে আরবি, ফারসি, তুর্কি, হিন্দি শব্দের মিশ্রণ। এছাড়াও রয়েছে বঙ্গালী ও রাঢ়ি উপভাষার প্রভাব। সুন্দরবনের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই ভাষাটিকে তিনি নাম দিতে চান ‘সুন্দরী ভাষা।’ সুন্দরবনের আরেকটি কথ্যভাষার ব্যবহার লক্ষ করা যায় যেটি দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ, মেদিনীপুর ও ওড়িশা থেকে আসা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা। এই ভাষাটি

‘মেদিনীপুরিয়া ভাষা’ বা ‘কাঁই কুটি’ বা ‘কাইটি-কুইটি’ ভাষা নামে পরিচিত।[১১] এই ভাষাটি চলিত বাংলা এবং সুন্দরীভাষার চাপে কোণঠাসা হয়ে গিয়েছে। সুন্দরবনের আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলন রয়েছে সাদ্‌রি ও মুণ্ডারিভাষা। এই ভাষাটি এখানকার আদিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

চতুর্থত এখানে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি কথ্যভাষার ব্যবহার রয়েছে। এঁদের এটি নিজস্ব কোনো ভাষা নয়। আদর্শ বাংলা ভাষা, সুন্দরীভাষা, কিংবা কাইটি-কুইটি ভাষা ছাঁদকে গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী বহু শব্দ এই ভাষায় প্রয়োগ করে থাকে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। এছাড়া রয়েছে গৃহস্থালি সংক্রান্ত শব্দ, সম্বোধনবাচক শব্দ। গওসিয়া ও ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত বহু গ্রন্থে এইরূপ ভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে। ইসলাম সম্প্রদায়ের গণ্ডির বাইরে এইরূপ শব্দের মিশ্রণ কম বলা যায়।

বর্তমানে আঞ্চলিক ভাষা তার অস্তিত্ব হারাচ্ছে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা। মানুষ কলকাতার আদর্শ চলিত বাংলা রপ্ত করতে শিখছে। শিক্ষা এখন প্রান্তিক অঞ্চলের দ্বারে চলে এসেছে। সেই সমস্ত ছেলেমেয়েরা আদর্শ চলিত বাংলায় লেখা বই পড়ছে। টিভিতে সংবাদ শুনছে এবং খবরের কাগজে সংবাদ পড়ছে। প্রান্তিক অঞ্চলের ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার জন্য শহরমুখী হয়ে যাচ্ছে। সেখানে তারা আঞ্চলিক শব্দ প্রয়োগ করে হাসির খোরাক হতে চায় না। তাই আদর্শ চলিত বাংলা তারা খুব তাড়াতাড়ি রপ্ত করে নিচ্ছে। যারফলে আঞ্চলিক ভাষা তার অস্তিত্ব হারাচ্ছে। ওসমানিয়া কিংবা গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত বিবি-পির-গাজিকেন্দ্রিক গ্রন্থগুলিতে সেই আঞ্চলিক ভাষারই নিদর্শন মিলেছে। এই দিক থেকে গ্রন্থগুলির গুরুত্ব রয়েছে। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ‘পুঁথি সাহিত্য’ কে ‘মুসলমানদের জাতীয় সাহিত্য’ বলেছেন। তিনি আরও জানিয়েছেন যে-

> যদি পলাশী ক্ষেত্রে বাংলার মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় না ঘটিত তাহা হইলে এই পুঁথির ভাষাই বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পুস্তকের ভাষা হইত।[১২]

সুকুমার সেন বলেছেন-

> ইসলামি বাঙ্গালায় লেখা বই অর্থাৎ কেচ্ছাকাহিনিগুলি শিক্ষিত মুসলমান পাঠকদের জন্য নয়। বিমিশ্র শ্রমিক ও কৃষকদের অবসর বিনোদনের জন্য রচিত হয়েছিল।[১৩]

উপরে ওসমানিয়া ও গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত ‘জহুরা-নামা’গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবার আলোচনা করা হয়েছে অন্যান্য প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত সত্যপিরের ‘মাহাত্ম্য-পাঁচালি’ নিয়ে।[১৪] সত্যনারায়ণের একাধিক মুদ্রিত পুথি পাওয়া যায়। এগুলি বিভিন্ন সময়ে লিখিত হওয়ায় ভাষার বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। সত্যনারায়ণের লেখক রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য একজন প্রসিদ্ধ লেখক, কিন্তু তিনি উচ্চশ্রেণির কবি ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তাঁর কাব্য পাঁজিতে রক্ষিত থাকে। বছরের পর বছর নতুন পঞ্জিকায় মুদ্রণ করা হয়। এ বিষয়ে শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বলেন-

> রামেশ্বরের কাব্যের গুণ তাঁহার ভাষায়। এই কবি অসামান্য ভাষা ও শব্দকুশলী। সংস্কৃত ত জানিতেনই, তাহার উপর ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষায় অসীম ক্ষমতা। এই ভাষা তিনি ফকিরবেশী সত্যপীরের মুখে দিয়াছেন। কথোপকথনে পাল্টাপাল্টি বাংলা ও উর্দ্দু ভাষায় সওয়াল জবাব পড়িয়া চমৎকৃত হইতে হয়। আগাগোড়া ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো ফেনাইবার ফাঁপাইবার চেষ্টা কোথাও নাই। বড় কবি না হইলেও বড় কথা, স্মরণীয় কথা আছে।[১৫]

### শ্রী কবিবল্লভ প্রণীত *সত্যনারায়ণের পুথি*-র গঠনবৈশিষ্ট্য:

শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত *সত্যনারায়ণের পুথি*-টি ১১৬২ সালের ১৮-ই বৈশাখ সমাপ্ত হয়। সংগ্রাহক এন জুলফিকার। বর্তমানে *দীপন* পত্রিকায় সত্যপির সংখ্যায় সংকলিত। মাহাত্ম্য-পাঁচালিটিতে ভাষার যে বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় তা নিম্নরূপ-

ক) ‘অ’ কারের ‘আ’ কার হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে কয়েকটি ক্ষেত্রে। যেমন-

অখণ্ড> আখণ্ড

অনেক> আনেক (পৃ. ৩১৫)

অবস্থা> আবস্থা (পৃ. ৩১৭)

খ) ‘অ’ এর ‘ই’ হিসেবে ব্যবহার দেখা গিয়েছে তবে তার উদাহরণ খুবই কম।

নর্তকী> নিত্যকী (পৃ. ৩০৬)

গ) ‘আ’ কারের ‘ই’ কার হিসেবে ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে।

নামাজ> নিমাজ (পৃ. ৩০৬)

ঘ) 'য' এর 'জ' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

যাইতে> জাইতে (পৃ. ৩০৫)

যদি> জদি (পৃ. ৩০৫)

যেই> জেই (পৃ. ৩০৯)

যেন> জেন (পৃ. ৩০৬)

যাব> জাব (পৃ. ৩০৬)

এছাড়া রয়েছে- যৌবন> জৌবন, যায়> জায়, যত> জত

অন্ত্য য, বর্গীয় জ হিসেবে লেখার মধ্যে যদিও উচ্চারণের বিশেষ পার্থক্য বোঝা যায় না।

ঙ) 'এ' কারের 'অ্যা' কার হিসেবে উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে।

বসে> বস্যা (পৃ. ৩০৫)

লিখে > লিখ্যা (পৃ. ৩০৫)

পড়ে> পড়্যা (পৃ. ৩০৫)

বসে> বস্যা (পৃ. ৩০৫)

ধরে> ধর্যা (পৃ. ৩১২)

এছাড়া রয়েছে এনে> আন্যা (পৃ. ৩০৫), এসেছি> আস্যাছি (পৃ. ৩০৫), হয়ে> হয়্যা (পৃ. ৩০৫), চলে> চল্যা, করেছি> কর্যাছি, দেখে> দেখ্যা

চ) 'ট' কারের 'ঠ' কার হিসেবে উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন-

ঘটক> ঘঠক (পৃ. ৩১৪)

ঘাটে> ঘাঠে (পৃ. ৩১৫)

ছ) তালব্য 'শ' এর দন্ত 'স' হিসেবে উচ্চারণ। যেমন-

শশধর> সসোধর (পৃ. ৩১১)

কিশোর> কিসোর (পৃ. ৩১০)

শিশুকাল> সিষুকাল (পৃ. ৩০৮)

দেশে> দেসে (পৃ. ৩০৭)

শহর> সহর (পৃ. ৩০৭)

গণেশ> গনেস (পৃ. ৩১১)

শ্যাম> স্যাম (পৃ. ৩১৩)

শুনি> সুনি (পৃ. ৩০৬), শীঘ্র> সিঘ্র (পৃ. ৩০৯) , দশ> দস (পৃ. ৩১৩), শাড়ি> সাড়ি (পৃ. ৩০৯), শিখিলেক> সিখলেক, শেষ> সেস

জ) আ- কারের অ্যা-কার হিসেবে উচ্চারিত হয়েছে। যেমন-

হলাম> হল্যাম (পৃ. ৩০৬), ছাড়া> ছাড়্যা, ধরা> ধর‍্যা

ঝ) য-ফলা উচ্চারণের প্রবণতা রয়েছে। যেমন-

হল্য (পৃ. ৩০৬), হয়্যা (পৃ. ৩০৬), খায়্যা (পৃ. ৩১০), লুকাল্য, পরিহাস্য (পৃ. ৩১৫),খাল্য (পৃ. ৩১৮) সুন্যা, আল্যা (পৃ. ৩০৭), লয়্যা, আন্যা।

ঞ) ইয়া প্রত্যয়ের ব্যবহার। যেমন-

হইয়া (পৃ. ৩১২), খুজিয়া, দেখিয়া (পৃ. ৩০৯) ইত্যাদি।

ব্রতী গায়েন 'ভাষাগত প্রাচীনতা ও শৈলীবিচার: প্রসঙ্গ সত্যপীরের পুথি' প্রবন্ধে কবি বল্লভের পুথি বিষয়ে বলেছেন-

> অনেক বেশি সংস্কৃত নির্ভর এবং আধুনিক বাংলার অনুসারী ভাষা গ্রন্থগুলির আধুনিকতা প্রমাণ করে।[১৬]

**মুন্‌শী ওয়াজেদ আলি রচিত *সত্যপীরের পুথি*-র গঠনবৈশিষ্ট্য:**

*সত্যপীরের পুথি*-টি সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ড. তপন বাগচী।[১৭] পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে লেখা মুদ্রিত পুথিটিকে কয়েকটি পঙ্‌ক্তিতে ভাগ করা হয়েছে। এখানে ধ্বনি পরিবর্তনের বেশ কিছু রীতি লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন-

ক) দন্ত-স 'ছ' ধ্বনিতে রূপান্তর।

সালাম> ছালাম (পৃ. ২৭৪), রসুল> রছুল (পৃ. ২৭৪), শির> ছির (পৃ. ২৭৪), আসমান> আছমান, সামান> ছামান, সেতার> ছেতার।

খ) অ্যা-কার এ-কারে রূপান্তর।

ব্যথা> বেথা

গ) ই-কারের 'এ' ধ্বনিতে রূপান্তর। যেমন-

দিল> দেল, কিনারে> কেনারে

ঘ) প্রথম লাইনের শেষপদটি যদি বিভক্তি থাকে তবে পরের লাইনের শেষপদে বিভক্তি ব্যবহার করেছেন আর যদি না থাকে তবে ব্যবহার করেননি।

প্রথম উদাহরণ-

আটকুড়ার পুত্র যদি হয় সত্য ভাবে।। নিধনের ধন হয় পীরের অভাবে*' (পৃ. ২৭৪)

এখানে 'ভাবে' এবং 'অভাবে' শব্দ দুটিতে 'এ' বিভক্তি রয়েছে। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া হল-

দিবসে থাকেন দোহে আপনার ঘরে।। নিশা ভাগে রাত্রে যার কাউর শহরে* (পৃ. ২৭৬)

কবি এখানে 'ঘরে' এবং 'শহরে' শব্দ দুটির সঙ্গে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার করেছেন।

দ্বিতীয় উদাহরণ-

সুন্দরে শুপিয়া দিল ঘর আর বাড়ী।। যেখানে যা ছিল তাঁর ধন আর কড়ি (পৃ. ২৭৫)

এখানে ‘বাড়ী’ এবং ‘কড়ি’ শব্দ দুটির সঙ্গে শূন্য বিভক্তি যুক্ত রয়েছে। এইভাবে কবি সুশৃঙ্খল ভাবে সুরের সামঞ্জস্য বজায় রেখেছেন।

চ) ‘কে’ বিভক্তির জায়গায় ‘রে’ বিভক্তির ব্যবহার রয়েছে। যেমন-

সুন্দরকে> সুন্দরেরে

ছ) তালব্য ‘শ’ এর দন্ত ‘স’ রূপে ব্যবহার।

শহর> সহর

জ) বিশেষণের প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছে।

সোনার প্রতিমা (পৃ. ২৭৮), সোনার গোবিন্দ (পৃ. ২৭৮), দয়ার সাগর (পৃ. ২৭৮)

**অনুপ্রাস:**

সমগ্র মুদ্রিত পুথিতে অনুপ্রাসের প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছে। ‘ব’ ধ্বনি তিনবার উচ্চারিত হয়েছে।

বারে বারে তিন বার মারিল আমারে।। (পৃ. ২৮১)

**সাধু চলিতের মিশ্রণ:**

সমগ্র কাহিনিতে সাধু, চলিতের মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে।

সুন্দরে ডাকিয়া কিছু কহে সওদাগর।। তোরে এক কথা বলি শুনহ সুন্দর*
তোমারে পাইনু সত্যপীর ধেয়াইয়া।। মরিবার কালে যাই সকলই কহিয়া* (পৃ.  ২৭৪)

**কৃষ্ণহরি দাস রচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*-র গঠনবৈশিষ্ট্য:**

চারি প্রাণে নারায়ণ অবতার করে।।　　সকল প্রমাণ নারায়ণ সত্যনাম ধরে*
যেই সত্যনারায়ণ সেই সত্যপীর।।　　দুই কুলে লইছে সেবা করিয়া জাহির*
দুই পথ নাহি যার এক পথ বিনে।।　　একি নামে তরে যাইবে বৈকুণ্ঠ ধামে* (পৃ. ৩২০)

কাহিনিটি পয়ার ছন্দে লেখা। প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের অন্ত্যমিল করেছেন কবি। সাধু ও চলিত ভাষার মেলবন্ধন লক্ষ করা গিয়েছে। এখানে কবি ছন্দের প্রয়োজনে সাধু ও চলিত রীতি প্রয়োগ করেছেন। সমগ্র মুদ্রিত পুথিতে এই একই রীতি ব্যবহৃত হয়েছে।

রাজপুরী ছাড়ি কন্যা যায় ধীরে ধীরে।।     নুর নদী পার হইয়া পেল হরি পুরে*

বল্লিয়া দিয়ড়ি গ্রাম তার আগে পায়।।     সেহি খান থাকি কন্যা ফিরে ফিরে চায় (পৃ. ৩২৪)

পয়ার ছন্দে লেখা হলেও কবি স্থানে স্থানে ত্রিপদী ছন্দের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

কোটাল আইল দেশে,     সন্ধ্যা রৈল বনবাসে,<br>
হৈয়া আইল আস্কাল বেলা।।<br>
বড় দুক্ষু তাপ পায়ে,     দুই দাসী সঙ্গে লয়ে,<br>
বসিলেক বটবৃক্ষ তলা* (পৃ.  ৩২৫)

অন্ত্যমিল ঘটানোর জন্য, ছন্দের সৌন্দর্য রক্ষার্থে কোথাও তিনি শব্দের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

কথা শুনে মহারাজ হইল কুপিত।।     এতক্ষণ দুষ্টকন্যা আছয় পুরিত* (পৃ. ৩২১)

'কুপিত' শব্দটির সঙ্গে মিল ঘটানোর জন্য তিনি 'পুরিত' শব্দটি ব্যবহার করেছেন।

প্রসব দারুন শীতে কে দিবে আগুনি।।<br>
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় কেবা দিবে অন্ন পানি* (পৃ. ৩২১)

পরের লাইন 'পানি'র সঙ্গে মেলাতে গিয়ে আগের লাইনের শেষে 'আগুন' শব্দটিকে 'আগুনি' বলেছেন।

শুনিয়া পখীর কথা রাজার ঝিয়ারি।।<br>
সুবর্ণের পিঞ্জেরা পক্ষী নিল হস্তে করি* (পৃ. ৩২২)

'করি' শব্দটির সঙ্গে মিল করতে গিয়ে 'ঝি' শব্দের সঙ্গে 'য়ারি' বিভক্তি যোগ করা হয়েছে।

এই মুদ্রিত পুথিতে ভাষার ক্ষেত্রে যে বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে তা নিম্নরূপ।

ক) ভাষার ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে 'আমি' শব্দের মোকে (পৃ. ৩২০), মোর (পৃ. ৩২০), মুঞি (পৃ. ৩২২) প্রভৃতি সর্বনামের ব্যবহার রয়েছে।

খ) শব্দের শেষে 'আ' বিভক্তির ব্যবহার রয়েছে।

শঙ্খ > শঙ্খা (পৃ. ৩২০), দুষ্ট> দুষ্টা (পৃ. ৩২৩)

গ) 'ঘ' এর 'গ' হিসেবে ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে।

বাঘিনী> বাগিনী

বাঘা> বাগা

ঘ) 'য়' বিভক্তির ব্যবহার

এতক্ষণ দুষ্টকন্যা আছয় পুরিত * (পৃ. ৩২১)

ঙ) শব্দের শুরুতে 'ও' ধ্বনির স্থানে 'উ' ধ্বনির ব্যবহার।

ওঠে> উঠে

চ) 'স' এর 'ছ' হিসেবে ব্যবহার।

সালাম> ছালাম

ছ) 'ব' এর 'ভ' হিসেবে ব্যবহার।

সবার> সভার

নিবারিয়া> নিভারিয়া

জ) 'য' এর 'জ' হিসেবে ব্যবহার।

যাব> জাব (পৃ. ৩২৩)

যেতে> জেতে (পৃ. ৩২২)

ঝ) 'আ' এর 'এ' হিসেবে ব্যবহার।

থালা> থালে

ঞ) ‘ন’ এর ‘ল’ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

নাও> লও,

নিল> লিল, (পৃ. ৩২৯)

নড়ে> লড়ে (পৃ. ৩২৯)

ট) ‘শ’ এর ‘স’ হিসেবে ব্যবহার দেখা গিয়েছে।

শুন> সুন (পৃ. ৩২৮)

ঠ) ‘স’ এর ‘হ’ হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে।

মসজিদ> মহজিদ  (পৃ. ৩২৮)

ড) চন্দ্র বিন্দুর (ঁ ) ব্যবহার নেই যেমন বাচি <বাঁচি

অপিনিহিতির ব্যবহার রয়েছে। যেমন- ভাজ> ভাউজ (পৃ. ৩২৮)

কৃষ্ণহরি দাস বিরচিত *সত্যপীর ও সন্ধ্যাবতীর পুথি*-তে আরবি, ফারসি, তুর্কি শব্দের মিশ্রণ লক্ষ করা গেলেও বহুল ব্যবহার নেই। কবি বাংলা ভাষায় কাব্যটি রচনা করেছেন। সেখানে অনেক আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ যেমন লক্ষ করা গিয়েছে তেমনি তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার রয়েছে। আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগগুলি হল- সুমুদ্দুর, বাপ, মাও, লাড়ল, বৈমুখ, ছাত্তাল (ছাওয়াল) তেমনি তৎসম শব্দগুলি হল- কাষ্ঠ, উদর, কন্যা, পালঙ্ক, পুত্র, পক্ষী, হস্ত, অন্ন, ভোজন, শয়ন, পবন, হংস, রজনী, উদিত, তপন, পিতা, মাতা, নিদ্রা, গমন প্রভৃতি।

**দ্বিজ রামধন প্রণীত *সত্য নারায়ণের পুথি*-র গঠনবৈশিষ্ট্য:**

এই মুদ্রিত পুথিটি পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে রচিত হয়েছে। সাধু ও চলিতভাষার মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে। কবি ‘আমি’ সর্বনাম পদের বিভিন্ন প্রয়োগ করেছেন। যেমন-  মোর, হমার, হাম, মেরা, আমার। তৎসম শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন- শশী, প্রভাত, হস্তী, বিপ্র, কন্যা, কানন, হেম, চন্দ্র, বদন, প্রভৃতি।

গওসিয়া এবং ওসমানিয়া লাইব্রেরি থেকে যেসব পির, গাজি, বিবি সংক্রান্ত 'জহুরা-নামা' প্রকাশ পেয়েছে এবং আত্মদীপের প্রজ্বলনভূমি *দীপন* পত্রিকায়, সত্যপির প্রসঙ্গে পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যায় যে কাহিনি বেরিয়েছে সেখানে শব্দগত পার্থক্যটি বেশি চোখে পড়ে। ওসমানিয়া, গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থে অনেক বেশি আরবি, ফারসি, তুর্কি, শব্দের মিশ্রণ লক্ষ করা গিয়েছে।

## ৫.খ. আরবি ও ফারসি শব্দ বাংলা ভাষায় প্রবেশের ইতিহাস এবং বাংলা ভাষায় তা ব্যবহারের ব্যাপকতা:

১৫৭৬ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন পাঠান সুলতান দাউদ খাঁ করবানীর পতন পর্যন্ত গৌড়ের দরবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কদর ছিল। সেই সময়ে স্থানীয় জনগণের সঙ্গে শাহি দরবারের লোকজনদের লেনদেন, ভাবের আদানপ্রদান চলতে থাকে। সেই কারণে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে আরবি, ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে।[১৮]

ভারতবর্ষে ইসলাম অনুপ্রবেশ ঘটার পর ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষা নানাভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ইসলামের ভাবধারার দ্বারা বাঙালির হিন্দুসমাজ ও বাংলা সাহিত্যের বিচিত্র পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। বাংলার মুসলমান অনুপ্রবেশের পর থেকে চট্টগ্রাম ও আরাকানে খাঁটি আরবীয় ও ইরানীয় মুসলমানদের ঐতিহ্য স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

মুসলমানরা এদেশে আসার পর হিন্দুদের মধ্যে ধর্মান্তরণ চলতে থাকে। হিন্দুসমাজে যারা অস্পৃশ্য ও শূদ্র বলে নিন্দিত হচ্ছিল তারা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। কেউ বা রাজ আনুকূল্য পাওয়ার আশায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। এই পরিস্থিতিতে হিন্দু সমাজজীবনে এক নতুন অবস্থার সূচনা হয়।

ইলিয়াস শাহী ও হোসেন শাহী বংশের নৃপতিরা হিন্দু প্রজার সহানুভূতিও সমর্থন লাভের জন্য যোগ্য হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে চাকুরি দেন এবং তাঁদের বাংলা ভাষায় কাব্যরচনায় উৎসাহিত করেন। ফলে হিন্দু প্রজারা মুসলমান শাসনের প্রতি তাঁদের আস্থা দেখাতে থাকেন এবং ফারসি ভাষা শিখে হিন্দু কবিরা কাব্যরচনা করতে থাকেন। ইলিয়াস শাহী বংশ দ্বিতীয়বার

যখন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৪৪২ সালে এই সময়কার (১৪৪২-১৪৮৭) সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষায় রচনা করা হয় মালাধর বসুর *শ্রীকৃষ্ণবিজয়*, কবি জৈনুদ্দীনের *রসুল বিজয়* এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের *মহাবংশাবলী*। হোসেন শাহী বংশ (১৪৯৩-১৫৩৮) আলাউদ্দীন হোসেন শাহ্ বিবাহসূত্রে বাঙালি পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল। বিজয়গুপ্তের *পদ্মাপুরাণ* (১৪৯৪) গ্রন্থে হোসেন শাহের ও বিপ্রদাস পিপিলাই-এর *মনসামঙ্গল* কাব্যে আলাউদ্দীন হোসেন শাহের প্রশংসা কীর্তিত হয়েছে। হোসেন শাহর সেনাপতি পরাগল খাঁর আদেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর *মহাভারত পাঁচালী* রচনা করেছেন। সেটি পরাগলী মহাভারত নামে পরিচিত হয়ে আছে।[১৯] বাংলার সুলতান এবং কর্মকর্তাদের প্রেরণায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা হতে থাকে। কাজী রফিকুল হক বলেছেন-

> মুসলমানগণ সংস্কৃত শিখতেন; সংস্কৃতে লিখিত সাহিত্য বাংলায় অনুবাদ করাতে উৎসাহ জোগাতেন। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ সংস্কৃত থেকে বাংলায় অনূদিত হয় সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায়।[২০]

বাংলাদেশে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে। তাতার-তুরকি-খোরাসানি-পাঠান মুসলমানেরা প্রথম শ'দুয়েক বছর চণ্ডমূর্তি ধারণ করে এদেশ শাসন করেন, কিন্তু পরে এই দেশকে ভালোবেসে ফেলেন। এদেশের ভাষা শিখতে থাকেন এবং সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী হন। কোনো কোনো পাঠান সুলতান হিন্দু কবি ও পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনি শোনার আশায় খেতাব, পারিতোষিক দিয়ে তা বাংলা ভাষায় রচনা করতে উৎসাহিত করতেন। রুক্‌নুদ্দিন বরবক শাহ্ কুলীন গ্রামের মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খান' উপাধি দিয়েছিলেন। 'ভাগবত' রচনার জন্য চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁ এবং তাঁর পুত্র ছুটি খান তাঁদের হিন্দু সভাকবিদের দ্বারা মহাভারত রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। বাংলাদেশে পঞ্চদশ শতকে রামায়ণ, মহাভারতের অনুশীলন হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতির বন্ধন স্থাপন করেছিল।

সুলতানি আমলে কোনো কোনো মুসলমান কবিও বাংলা ভাষায় কাব্যচর্চা করে। শাহ মোহাম্মদ সগীরের ইউসুফ জোলেখা (পনের শতক) মুসলমান রচিত প্রথম বাংলা কাব্য। বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান কাজী রফিকুল হক জানিয়েছেন- সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সে যুগে মুসলমান শাসনের প্রভাবে বাংলা ভাষায় বিস্তর আরবি, ফারসি

ও তুর্কি শব্দ প্রবেশ করে। আরবি, ফারসি শব্দ মিলিত হওয়ায় বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়। ফলে এই ভাষা বাঙালির নতুন ভাব প্রকাশের উপযোগী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশ পেয়ে তাঁর সভাকবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর *অন্নদামঙ্গল* (১৭৫৩) কাব্য এবং আড়রার জমিদার রঘুনাথ রায়ের অনুরোধে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচনা করেন *চণ্ডীমঙ্গল* (১৬৫৪) কাব্য। মুকুন্দরামের রচনায় তদ্ভব ও দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি ফারসি শব্দও স্থান পেয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'যাবনী মিশাল ভাষার' পাশাপাশি আরবি ফারসি শব্দের প্রয়োগ রয়েছে।

১৮০০ সালে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হয়েছে। সেখানে বাংলা বিভাগের প্রধান ছিলেন খ্রিস্টান মিশনারি উইলিয়ম কেরী। তাঁর হাতে বাংলা, মারাঠি, ও সংস্কৃতের সমস্ত ভার ছিল। তাঁর নির্দেশে কেউ বাংলা গদ্য গ্রন্থ লিখলেও সেগুলি সংস্কৃত ইংরেজি ও ফারসি থেকে অনূদিত। তাই সেই গ্রন্থগুলিতে আরবি ফারসি শব্দের স্বাভাবিক প্রয়োগ দেখা যায়।

কলকাতা মাদ্রাসা (১৭৮১) থাকা সত্ত্বেও ফারসির প্রভাব সঙ্কুচিত হতে থাকে এবং ইংরেজি ও সংস্কৃত শিক্ষা জোরদার হয়। তবুও আরবি, ফারসির প্রয়োগ উনিশ শতকের লেখাগুলিতে কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বিদ্যাসাগরের রচনায়, প্যারীচাঁদের আলালী ভাষায়, মধুসূদনের প্রহসনে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে, মুসলমান চরিত্রাঙ্কনে এই শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। বিদ্যাসাগরের শেষের দিকের বইগুলি এবং তর্কবিতর্ক মূলক বইগুলিতে আরবি ও ফারসি শব্দের সুন্দর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার করেছেন। এছাড়া সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম, ফররুখ আহমেদ প্রমুখ স্বনামধন্য কবি সাহিত্যিক সুন্দরভাবে তাঁদের সাহিত্যে এই শব্দ ব্যবহার করে বাংলার শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করেছেন। কাজী নজরুল ইসলামের কাব্য কবিতায় ব্যাপক হারে আরবি ও ফারসি শব্দের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেমন– বেহেস্ত, শরীফ, দুনিয়া, বান্দার, ফরমান, জানওয়ার ইত্যাদি শব্দ। কাজী রফিকুল হক বাংলা ভাষায় আরবী ফারসী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান বইতে জানিয়েছেন- ইংরেজি শব্দ ইংরেজ রাজত্বকাল থেকে বাংলা ভাষায় স্থান পেয়েছে। এছাড়া পর্তুগীজ, ফরাসি, হিন্দি, উর্দু, গুজরাটি, চীনা, জাপানি ইত্যাদি ভাষার শব্দও বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। সুলতানি যুগ থেকে

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিদেশী শব্দাবলি বাংলা ভাষার এক মূল্যবান সম্পদ। কেবল কবি, সাহিত্যিক নয়, সকল স্তরের বাংলাভাষী প্রতিনিয়ত তাঁদের কথায় ও লেখায় এই সব বিদেশী শব্দ ব্যবহার করেছেন। পুথির ভাষায় ফারসির চর্চা প্রসঙ্গে কাজী রফিকুল হক জানিয়েছেন-

> মুদ্রার পৃষ্ঠে ফারসি, মসজিদ-গাত্রে ফারসি, গৃহ নির্মাণ লিপিতে ফারসি, শাহী ফরমানে ফারসি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে ফারসি, রাজস্ব বিভাগে ফারসি, শিক্ষা-দীক্ষা ও আলাপ-আলোচনায় ফারসির ব্যবহার চলতে লাগল। বিদ্যাবত্তা, চাকরি বাকরি, এমনকি সভ্যতা-ভব্যতার মাপকাঠিও ফারসি হইয়া ওঠে। তাই হিন্দু-মুসলমান সকলেই ফারসি শিখিতে শুরু করেন।[২১]

ওসমানিয়া, গওসিয়া লাইব্রেরি থেকে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতে তুর্কি, হিন্দি শব্দের মিশ্রণ, সাধু চলিত এবং আঞ্চলিক শব্দের মিশ্রণ লক্ষ করার পাশাপাশি এখানে ভাষার নানান বৈচিত্র্য লক্ষ করা গিয়েছে। সে কারণে গ্রন্থগুলি গবেষণার বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থ থেকে জানা যায় পশ্চিম-বাংলার ইসলামি সংস্কৃতি ও সাহিত্য তথাকথিত ইসলামি বাংলায় নির্বাহ হতে লাগল। অনেকেই সেমেটিক রীতিতে উল্টো করে (ডান থেকে বাম দিকে) বাংলা বই ছাপাতে শুরু করেন। এই ধরণের অসংখ্য ছাপাখানা কলকাতায় গজিয়ে উঠল। কদর্য কাগজে কদর্যতর ছাপায় আরবি-ফারসি কিস্‌সা (অর্থাৎ গল্প), লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, আলফা-লায়লা (আরব্য উপন্যাস) এবং ইসলামি ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মাচার সংবলিত পুস্তিকা প্রকাশ পেতে লাগল। ছাপার রীতিতে মুসলমানি ঢং অনুসৃত হল। ভাষার মধ্যে প্রচুর আরবি, ফারসি শব্দ জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়ায় বইগুলি হিন্দুসমাজে অস্পৃশ্য হয়ে রইল। বৃহত্তর বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে এর কোনো সংযোগ থাকল না।[২২]

## ৫.গ. উপমা অলংকার প্রয়োগ:

### *পির গোরাচাঁদ*-এর গ্রন্থে উপমা প্রয়োগ:

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর কাহিনিতে অনুপ্রাসের প্রাধান্য যেমন আছে তেমনি উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগও লক্ষ করা গিয়েছে। কবি অনেক ক্ষেত্রেই পল্লিজীবন থেকে উপমা সংগ্রহ করেছেন। ঘটনার গুরুত্ব বোঝাতে তিনি বিশেষ কিছুর সঙ্গে তুলনা করেছেন। যেমন- রাগকে আগুনের সঙ্গে, কারও জোরে পড়ে যাওয়াকে পাহাড়ের পড়ে যাওয়া, অস্ত্রের ধার বোঝাতে

বিজলির সঙ্গে, কারও দয়াকে সাগরের সঙ্গে। এছাড়াও আরও অনেক উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ পাওয়া গিয়েছে। নিম্নে তা প্রদত্ত হল-

i) শুনিয়া কৌতুক হৈল মাতাঙ্গ মাতন* (পৃ. ৫)

ii) আসিয়া পাহাড়ে জোর করিলেক হাতী।।

ঝনঝনা গিরে যেন কাঁপে বসুমতি* (পৃ. ৫)

iii) শুনিয়া জ্বলিল গিধি আগ বরাবর (পৃ. ১১)

iv) দন্ত কড়মড় করে বহে যেন ঝড়ি (পৃ. ১১)

v) মহাতেজ ডাকে গিঠি বলে মার মার

ক্রোধিত হইল যেন জলন্ত আগুণ।। (পৃ. ১২)

vi) দুই খান হয়ে গিধি গিরে জমি পর*

পাহাড় সমান গিরে জমিন উপরে।। (পৃ. ১২)

vii) চারিদিকে ঘেরে যেন হেরে মেঘের ঘটা

নানা অস্ত্র ঝলমল বিজলির ছট* (পৃ. ১৩)

viii) গোরাই চড়িয়া ঘোরে, যেন বাওগতি উড়ে, (পৃ. ১৪)

ix) করুণা সাগর তুমি (পৃ. ১৭)

x) মুল্লুক ছাড়িয়া আইসে বাদসাই ছামান।।

ঘোড়া ডালে শিকার খেলে পাইয়া ময়দান*

xi) যত গোওয়ালার নারী, রূপে গুণে যেন পরী,

xii) এয়ছা জোরে পাহালওয়ান তলোওয়ার ঝাড়ে

কেলার বাগানে যেন দুই ভিতে পড়ে (পৃ. ১১)

কবি রূপের বর্ণনা সেভাবে করেননি। যতটা করেছেন *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি* রচয়িতা আব্দুর রহিম সাহেব।

### *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে উপমা প্রয়োগ:

*গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে কবি আব্দুর রহিম সাহেব ব্যাপক উপমা প্রয়োগ করেছেন। তাঁর উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তিনি একজন বাস্তবনিষ্ঠ কবি। সর্বদা উপমা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে পাঠককে তিনি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন। কারও দয়াকে সাগরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি যখন যা কিছু রূপ বর্ণনা করেছেন প্রকৃতির রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোনো কোনো সময় তিনি উপমা দিতে চান, কিন্তু সেই সৌন্দর্য কারও সঙ্গে তুলনা করা সম্ভব নয় কারণ তা এতটাই সুন্দর যে সেটার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা চলে না, তখন কবি বলেছেন-

i) সেরূপ বর্ণনা করা অক্ষম আমার।। দুনিয়াতে নাহি কিছু উপমা তাহার* (পৃ. ৫)

ii) জবাফুল যিনি জিহ্বা তাতে খায় পান/ না খাটে উপমা কিবা করিব বাখান। (পৃ.২১)

চাম্পাবতীর রূপের প্রশংসা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন-

সুগঠন হস্ত পদ কি কহিব মরি।। তাহার উপমা নাহি ত্রিজগত জুড়ি* (পৃ. ২১)

কবি তাঁর লেখায় প্রচুর উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ দেখা গিয়েছে। তিনি একসাথে পরপর প্রতিটি লাইনে উপমার প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যেমন-

i. পতিত পাবন প্রভু করুণা সাগর (পৃ. ১)

ii. চন্দ্রের সমান রূপ ঝলমল করে (পৃ. ২)

iii. পুত্রের সমান করে পালন প্রজার (পৃ. ৩)

iv. চাঁদের মতন এক শিশু রহিয়েছে (পৃ. ৪)

v. শশী ছটা নিন্দে রূপ অতি সুশোভন (পৃ. ৫)

চাঁদের উপমা কবি বহুবার ব্যবহার করেছেন। নরনারীর রূপ বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সর্বদা চাঁদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। চাঁদ কথাটি বহুবার ব্যবহারে কাব্যের সৌন্দর্য নষ্ট হবে ভেবে তিনি চাঁদের সমার্থক শব্দ ব্যবহার করেছেন যেমন- চন্দ্র, চন্দ্রিমা, বিধু, শশী, শশধর। আবার কখনও বা বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। চাঁদের সঙ্গে রূপের তুলনা সেই সময়কার প্রচলিত রীতিকে তিনি মনে করিয়ে দেন। চাম্পাবতীর রূপ বর্ণনা করতে গিয়ে কবি বলেছেন-

i. এক কন্যা আছে ওগো আমি তাহা জানি।।

নিন্দয় গগণ শশী সেই বিনোদিনী (পৃ.২১)

ii. মুখের লাবন্য যিনি কোটি শশধর (পৃ.২১)

iii. দাঁড়াইয়া চম্পাবতী চক্ষু মেলি হেরে।।

কটি শশী যিনি রূপ ঝলমল করে* (পৃ.২৩)

iv. দুই হাতে ধরি তাঁকে চন্দ্র মুখ দিয়া মুখে,

একবার দোয়া করি লেহ কোলে তুলি* (পৃ.২১)

v. বিধুমুখি চাম্পাবতী কাছে বসি।।

জ্বলিতেছে রূপ যিনি লক্ষ কোটি শশী (পৃ.২৪)

vi. ক্ষণে দেখে হস্ত পদ ক্ষণে দেখে মুখ *

লক্ষ কোটি চন্দ্র যিনি তার মুখ খান।। (পৃ.২৩)

vii. আহা মরি মন চোরা কি করি কি করি কহ।।

ধরিতে গগণ শশী গগণে হাত বাড়াতে চাহ।। (পৃ. ২৭)

viii. হেন সমে দেখি দুটি নয়ন মেলিয়া।।

যেমন শরৎ শশী পড়িয়া খসিয়া (পৃ. ৩৫)

ix. কোটি শশী যিনিয়া গোসে বিধু বদন।।

দেখিয়া ঢলিয়া পড়ি হইয়া অচেতন (পৃ. ৩৫)

x. কালু বলে গাজী তুমি বুদ্ধির সাগর।

এমন সপন দেখি, চমকিত বিধুমুখী (পৃ. ৪৪)

xi. তৈল কাকই বিনে কেশ হইছে জট।।

তবুও তাহার রূপ যিনি শশী ছটা* (পৃ. ৪৬)

xii. ঘাটের কুলেতে রামা দাড়াইল আসি।।
ঝলমল করে রূপ যেন কোটি শশী

xiii. দাড়াইয়া দেখে সবে কদমের তলে।।
লক্ষ কোটি শশী যিনি ঝলমল জলে (পৃ. ৪৮)

xiv. কবরি খুলিয়া কেশ দিক আউলাইয়া।।
কাল মেঘে চনদ্র যেন ফেলিল ঢাকিয়া* (পৃ. ৪৯)

xv. অন্তপূরে পাঁচতোলা চন্দ্রিমা বদনী*

xvi. আহা মরি প্রাণপ্রিয়ে ও প্রাণ বিধুমুখী (পৃ. ২৫)

xvii. ঊপরেতে মুখখানি শোভিছে এমনি।।

যেমন শারদ শশী লক্ষ কোটি যিনি* (পৃ. )

রূপ বর্ণনা কিংবা অঙ্গে অলংকার পরিধানে রূপ বর্ধিত করতে তিনি সূর্য কিংবা রবির উপমাও ব্যবহার করেছেন।

i. পরিয়াছে সকলেতে অঙ্গে অলঙ্কার
মণি মুক্ত জ্বলে যেন সুর্য্যের আকার* (পৃ. ৪৩)

ii. পরে সতী চাম্পাবতী নামে কণ্ঠ জলে।।

কোটি রবি যিনি অঙ্গ জল মধ্যে জলে (পৃ. ৪৯)

iii. পরশ মানিক গাথা বসন পরিল।।
সূর্য্য যিনি ঝলমল করিতে লাগিল* (পৃ. ৭৫)

কেবলমাত্র চন্দ্র কিংবা সূর্য নয় চাম্পাবতী কিংবা গাজির রূপ বর্ণনা করতে কবি প্রকৃতির নানা উপাদান ব্যবহার করেছেন। যেমন- তারা, জবাফুল, মৃগের নয়ন, পর্বত প্রভৃতি। উদাহরণগুলি নিম্নরূপ।

i. আর হে বত্রিশ দাঁতে মিশি লাগাইছে।
লক্ষ কোটি তারা যিনি উজ্জল করিছে* (পৃ. ২১)

ii. জবাফুল যিনি জিহ্বা তাতে খায় পান।। (পৃ. ২১)

iii. মৃগের নয়ন তুল্য শোভিত লোচন।।
যিনিয়া চন্দ্রের ছটা তাহার কিরণ* (পৃ. ২১)

iv. জেলেখার কটি তুল্য কটি তাঁর সরু।।
তাদৃশ নিতম্ব আর পেট পিঠ উরু* (পৃ. ২১)

v. সুগঠন হস্ত পদ কি কহিব মরি।।
তাহার উপমা নাহি ত্রিজগত জুড়ি* (পৃ. ২১)

vi. বার হাত ছিল লম্বা চুল তার মাথে*
ভয়ঙ্কর অঙ্গ অতি পর্ব্বত আকার।। (পৃ. ৬৭)

vii. সোনার কলসী কাখে হাতে আর ঝারি।।
ঝলমল করে রূপ যিনি বিদ্যাধরি* (পৃ. ৪৩)

বহুবার সাগরের উপমা কবি দিয়েছেন। সাগরের বিশালতার সঙ্গে তিনি রূপ, সুখ, দুঃখ, করুণার বিশালতা তুলনা করেছেন।

i. শোকের সাগর মধ্যে দিলেন সাতার, (পৃ. ১১)

ii. যায় যায় জিনদা গাজী যায় যায় শোকের সাগরে ফেলি বাপ আর মা, (পৃ. ১২)

iii. আহা মোর মনচোর কঠীন হইয়া অবলা দাসীরে গেলে সাগরে ফেলি
পার হইয়া গেল চামপা রূপের সাগর, (পৃ. ৩৭)

iv. ডুব দিয়া চামপাবতী প্রেম সাগরেতে, পাইল যতেক কষ্ট সব পাশরিল
ডুব দিয়া দুইজনে সুখের সাগরে, (পৃ. ৩৮)

v. রূপের সাগর গাজী রূপ ঝরে পড়ে।। (পৃ. )

vi. তার কন্যা চাম্পাবতী রূপের সাগর, (পৃ. ২১)

বিশালতা বোঝাতে সাগরের উপমা কবি বারবার পছন্দ করেছেন। এছাড়াও নানান উপমা লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন-

ধরিতে গগণ শশী গগণে হাত বাড়াতে চাহ* গোবরিয়া পোকা হইয়া পদ্মমধু খেতে চাহ।। (পৃ. ২৭)

জালে মীনের আটকে থাকার সঙ্গে কবি মানুষের জীবনের বন্দিদশার তুলনা করেছেন।

হয়েছি মীনের মত আটক জালেতে
বাচিবার পথ কিছু না দেখি চক্ষেতে,
মোর নাম গাজী তোমার মন্দিরে আজি,
মীন মত হৈছি জালে গাথা

ভ্রমরের রঙ এবং স্বভাবের সঙ্গে মানুষের তুলনা কবি করেছেন। চাম্পাবতীর মাথার চুলের কালো রঙের গাঢ়ত্ব বোঝাতে ভ্রমরের কালো রঙের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন। আবার মানুষের স্বভাবের উৎশৃঙ্খলতা বোঝাতে ভ্রমরের এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ এনেছেন।

i) ভ্রমরের বর্ণ যিনি লম্বা কেশ মাথে/দাঁড়াইলে পড়ে কেশ পায়ের পাতাতে* (পৃ. ২১)

ii) ধীক তারে প্রেম শিক্ষা যে দিল তোমায়
আহা মরি একি রীতি, যেমন ভ্রমরের প্রীতি,
খাইয়া ফুলের মধু ফুল ছাড়ি যায়,
আমি কি ফুলের ওলি অন্য ফুলে যাব চলি,
লম্পট পুরুষ যারা, তাহাদের মত।। (পৃ. ৮১)

এছাড়াও কবি ভিন্ন প্রসঙ্গে উপমা অলংকারের প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। সেগুলি নিম্নরূপ-

i) যখন হইল গাজী তিন বছরের*
মিঠা মিঠা কথা কয় যেন মধু সূধা।। (পৃ. ৫)

ii) হীরা ও মানিক রাজা কড়ি সম গণে* (পৃ. ২১)

iii) গোসাই তাহার সমান বীর সংসারেতে নাই* (পৃ. ২১)

iv) বুকেতে এমন শ্বর হানিল মদন।।
যেমন ঘৃতের মধ্যে পড়িল আগুন (পৃ. ২৩)

v) দাসী হেন জ্ঞান বামা মনেতে করিয়া

বিবস্ত্র হইয়া উঠে তেগ হাতে নিয়া (পৃ. ২৩)

vi) কেমনে আসিল চোর আমার মন্দিরে*

যেমন পতংগ গিয়া পড়ে আগুনেতে।। (পৃ. ২৩)

vii) হেনকালে কহে কন্যা মধুর বচনে* (পৃ. ২৪)

viii) হৃদয় সিন্দুক মোর তুমি যে খুলিয়া।। (পৃ. ২৫)

ix) কত ভয় দেখাইলা, যেমন শিশুর খেলা, করিতেছ মোর সংগে, অংগে ধুলা মাখি।। (পৃ. ২৫)

x) আমিই তোমার দাসী হইবেক জানা।।
একসাথে থাকে যেমন মেঘ আর পানী* (পৃ. ২৮)

xi) ক্ষণে উঠে ক্ষণে লোটে যেমন হৈল পেটে সন্তান প্রসবের ব্যথা।। (পৃ. ৩১)

xii) জিজ্ঞাসেন মধুশ্বরে মুছায়ে নয়ন (পৃ. ৩৩)

xiii) দশ মাস উদরেতে আমাকে যেমন রাখিয়া ছিলেন মাতা করিয়া যতন*

সেই মত কথা মোর উদরে রাখিবে (পৃ. ৩৪)

xiv) লোটন বান্ধিতে কেশ যখন ঝাড়িল।।

শিলা বৃষ্টি গগনেতে যেমন গর্জ্জিল* (পৃ. ৪৯)

xv) সাজে বাঘ ভিংগরাজ পর্বত আকার (পৃ. ৫৪)

xvi) কাষ্ঠের সমান শও কুমীরের কায় ( পৃ. ৬৩)

xvii) কুমীরের অংগ শক্ত লোহার আকার (পৃ. ৬৩)

xviii) ভুজঙ্গের মত ক্ষণে ধরে পেচ দিয়া (পৃ. ৬৬)

xix) বার বার খড়ম যে পড়ে আর ঊঠে।।
যেমন ধানের চীড়া নারী লোকে কোটে* (পৃ. ৬৬)

xx) হাতির কানের মত কান দুটি তার *

xxi) পুত্রের সমান জানি তোমরা আমার (পৃ. ৭২)

xxii) নারিকেল কুচ কেহ কাটি এক সাথে

xxiii) শোভিত নগর খানি, ইন্দ্রের উদ্যান যিনি, হীরা লাল গড়াগড়ি যায়।। (পৃ. ৮৪)

xxiv) শূনিয়া অজুপা রাণী হরিষ আপার।।
কাংগাল পাইল যেন সিন্দুক সোনার*

xxv) দেখিল প্রহরী সব আছেন শুইয়া।। মৃত্যুর আকার হইয়া রহিছে পড়িয়া* (পৃ.২২)

এই মুদ্রিত পুথিতে আগুনের উপমা টানা হয়েছে। সেখানে সোনার সঙ্গে আগুনের উপমা টানা হয়েছে।

রাজার বিরাট ঘর ছিল যে সোনার।।
দুরে থাকি দেখা যায় অগ্নি আকার* (পৃ. ২১)

***বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে উপমা প্রয়োগ:**

আব্দুর রহীম সাহেবের *বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ লক্ষ করা গিয়েছে।

i. খবর শুনিয়া এয়ছা, আগ হেন জ্বলে যেয়ছ, আপনার মন্ত্রিকে থাকিয়া' (পৃ. ১৬);

ii. তিন বান রায়মণী, ছাড়ে যেন ছোটে অগ্নি, বোন বিবী হইল সাবধান' (পৃ. ১৭)

এখানে দুটি উপমাই আগুনের সঙ্গে করা হয়েছে। প্রথমটিতে রাগকে আগুনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে বান ছোটাকে অগ্নির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই গ্রন্থে অলঙ্কারের প্রয়োগ কম থাকলেও কিছু রয়েছে।

উপমা অলংকার ছাড়াও এই গ্রন্থে অন্য অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- প্রচলিত শব্দের ব্যবহার।

বিনা শ্রমে পেলে রতন, কে করে তারে যতন, ভাল নহে ভাল নহে, একি বকাবকি* (পৃ. ২৫)

অন্তানুপ্রাসের প্রাধান্য লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন-

দশমাস যে সময় পুরা হয়ে আইল।।
ফুল বিবী এবরাহিমে বলিতে লাগিল * (পৃ. ৬)

শেষ দুটি শব্দ 'আইল' এবং 'লাগিল' এদের মধ্যে 'ইল' শব্দের মিল রয়েছে। অর্থাৎ 'ইল' শব্দের অন্তানুপ্রাস হয়েছে। এই পুথিতে ইল শব্দের অন্তানুপ্রাস রয়েছে অনেক। যেমন-

দশমাস যে সময় পুরা হয়ে আইল/ ফুল বিবী এবরাহিমে বলিতে লাগিল; (পৃ. ৬)

হাটিয়া বিবীর পেটে দরদ ধরিল।। এক গাছ তলে বিবী যাইয়া বসিল* (পৃ. ৮)

আল্লাতালা ঘরে মেরা ফরজন্দ না দিল।। জেন্দেগীর ফল মেরা নাহিক ফলিল* (পৃ. ২)

একথা শুনিয়া ছেরে ঝনঝনা গিরিল।। বলে হায় একি দায় কপালে ঘটিল* (পৃ. ৬);

আব্দুর রহিম সাহেব প্রনীত *বনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে আমরা এইরকম উপমা অনেক দেখেছি। নিম্নে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল-

সুখের সাগরে কেহ নিরবধি ভাসে, দয়ার সাগর তুমি পাক ছোবহান,

দয়ালু দয়ার সিন্ধু দাতা দয়াময়

## ৫.ঘ. প্রবাদের ব্যবহার:

মুখের ভাষা থেকেই প্রবাদের জন্ম। সেক্ষেত্রে জানা বিষয়ই গুছিয়ে বলার প্রবণতা থাকে এর মধ্য দিয়ে। এগুলির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের রুচিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রাম বাংলায় কী ধরণের প্রবাদ প্রচলিত ছিল তা গ্রন্থগুলিতে লক্ষ করা গিয়েছে। এই সমস্ত প্রবাদ ঘটনাকে সজীব করে তোলে।

খোদা নেওয়াজের *পীর গোরাচাঁদ*-এর কাহিনিতে বিভিন্ন প্রবাদ বা লোকজ উক্তি লক্ষ করা গিয়েছে। বাস্তব ধর্মিতা প্রবাদের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমসাময়িক বহু প্রচলিত কথা, মানুষের আচার-আচরণ, রীতিনীতি, সমাজসংস্কার ব্যক্ত হয়েছে প্রবাদের মধ্য দিয়ে। যেমন-

i. সর্ব্ব শাস্ত্রেতে শুনি সকলেতে বলে।।
আপনারে দেখিলে পরের তরে ফলে* (পৃ. ১০)

এই প্রবাদটি বর্তমানেও সমাজে প্রচলিত আছে।

ii. নিকট মরণ সবের না যায় খণ্ডনা* (পৃ. ১০)

দ্বিতীয় প্রবাদটি অর্থ হল কারও মৃত্যু খণ্ডন করা যায় না। মৃত্যু যদি কারও ঘনিয়ে আসে যে-কোনো কারণেই তার মৃত্যু হতে পারে।

iii. পুরুষের দশ দশা এক দশা ফলে।।
তিন কোন পৃথিবী জেনে নিজ বাহু বলে*
যখন দশা বাম হয় নাহি পায় টের।।
দূরে বনে বাঘে ধরে দশার এমন ফের*(১০)

iv. মরণ নিকট যার কথা নাহি ধরে
ডাকে হেন মহামানি সেহ ডুবে মরে* (পৃ. ১০)

v. নেমক হারাম মোরে কবে সর্ব্বজনে।
দিঘীতে পড়িয়া মরি পরিবার সনে* (পৃ. ২৬)

পাঁচ নম্বর প্রবাদটির অর্থ হল কারও উপকার পেয়ে যদি কেউ সেই উপকার ভুলে যায় তবে তাকে লোকে নেমক হারাম বলে।

vi. মুল্লুক ছাড়িয়া আইসে বাদসাই ছামান।।
ঘোড়া ডালে শিকার খেলে পাইয়া ময়দান* (পৃ. ২৬)

আব্দুর রহীম সাহেবের *বোনবিবি জহুরানামা কন্যার পুথি*-তে কিছু প্রচলিত শব্দ অর্থাৎ প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। যেমন-

i. বুঝিনু এ দুনিয়াতে কেহ কার নয়
আল্লা ছেওয়া আর কেহ নাহি দয়াময় (পৃ. ৯)

ii. বসিয়া খাইলে টুটে রাজার ভাণ্ডার, (পৃ. ২০)

iii. ধোনা কহে হেগে বেটা পানি নাহি লয়।।
দুখের উপর বনবিবি হইবে সদয় (পৃ. ২৮)

iv. বহু লোকে মান্য বড় করিত তাহারে।।
কেননা বিদ্যান ছিল হরেক প্রকারে* (পৃ. ২)

v. আটকুড়া মরিয়ে যাবে যাহানেতে।।
গাছ নাহি শোভা পায় বেগর ফলেতে* (পৃ. ২)

vi. যদি সে কারার মেরা পুরা না করিবে।।
আল্লার দরগায় শক্ত গোনাগার হবে* (পৃ. ৪)

vii. যদি নাহি মানি আমি দরগায় খোদার
কারার খেলাক দায়ে হব গোনাগার (পৃ. ৪)

viii. আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িল (পৃ. ২৪)

কিছু প্রচলিত শব্দ অর্থাৎ প্রবাদ কবি আব্দুর রহিম সাহেব *গাজি কালু চাম্পাবতী কন্যার পুথি*-তে ব্যবহার করেছেন।

i. বিনাশ্রমে পেলে রতন,
কে করে তারে যতন, (পৃ. )

ii. তুমি যদি মার তবে মরণ আমার
পীরিতে ডুবিছে প্রাণ ভয় কার আর (পৃ. ২৬)

iii. বসিয়া হাজার সাল খেলে না ফুরাবে (পৃ. ২০)

iv. দুক্ষের অভাব নাহি বসিয়া খাইলে*
বসিয়া খাইলে টুটে রাজার ভাণ্ডার (পৃ. ২০)

v. আক্কেল খারাপ হয় পিইলে শারাব (পৃ. ২০)

vi. দয়ালু মা বোন বিবী লিবে উদ্ধারিয়া (পৃ. ২৬)

এখানে প্রবাদের ব্যবহার নতুন কিছু নয়। এর আগেও প্রাচীন যুগ মধ্যযুগের সাহিত্যে প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। শ্রী কবিবল্লভ বিরচিত *সত্য-নারায়ণের পুথি*-তে একটি প্রবাদ বাক্য পাওয়া যায়।

জর্ন্ম বিভা মৃত্যু দেখ কপালে লিখন।। (পৃ. ৩১০)

পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিতে দু-একটি স্থানে প্রবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা গেলেও ব্যাপক প্রয়োগ নেই।

## তথ্যসূত্র ও টীকা

১। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ *বাংলা সাহিত্যের কথা* (২য় খণ্ড, পৃ.- ২৮৫) গ্রন্থে এই মন্তব্য করেছেন।

দ্রষ্টব্য: হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান,* ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. এগারো

২। যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা, পৃ. ১১৪

৩। দ্রষ্টব্য: পরিশিষ্ট– ১

৪। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৬৬

৫। দাশ, শিশির কুমার, 'আখ্যানের বাক্য', *উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব,* অঞ্জন সেন ও উদয়নারায়ণ সিংহ (সম্পা.), আগস্ট ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, পৃ. ২৯

৬। সরকার, শ্যামাপ্রসাদ, 'সংলাপ', *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য,* ২০০৬, পৃ. ২৫২

৭। আড়া-ঠেকা সঙ্গীতের তাল বিশেষ।

দ্রষ্টব্য: দাস, শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন, *বাংলা ভাষার অভিধান,* ১৯৭৯, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

৮। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৬৫।

৯। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৫

১০। মণ্ডল, কল্যাণ, 'সুন্দরবনবাসীর ভাষা-ভাষা-বৈশিষ্ট্য', *সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* সনৎকুমার নস্কর ও ছন্দারায় (সম্পা.), ২০০৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পৃ. ২৭

১১। পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৭

১২। হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান,* ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ভূমিকা অংশ।

১৩। সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা, পৃ. ৪৬৬

১৪। সুকুমার সেন, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য* গ্রন্থে 'আঠারো-ভাটির পাঁচালী' অংশে বনবিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক কাহিনিগুলিকে 'জহুরা-নামা', 'মাহাত্ম্য-পাঁচালি' বলেছেন। পৃ. ৭৩

১৫। ভট্টাচার্য্য, রামেশ্বর, *সত্যপীরের কথা,* শ্রী নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (সম্পা.) ১৩৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা 'রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ' অংশ। গ্রন্থটি ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।

দ্রষ্টব্য: https://ebin.pub/satya-pirer-katha.html

১৬। নাগ, ড. রমাপ্রসাদ, জুলফিকার, এন (সম্পা.), *দীপন* (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা), অক্টোবর ২০১২, পৃ. ২২৩

১৭। পূর্বোক্ত, *সত্যপীরের পুথি*-টি সংগ্রহ করেছেন ঢাকা বাংলা একাডেমীর উপ-পরিচালক ড. তপন বাগচী। পৃ. ২৯৫

১৮। হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান,* ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ভূমিকা অংশ।

১৯। পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ।

২০। পূর্বোক্ত, ভূমিকা অংশ।

২১। কাজী রফিকুল হক, (সম্পা.) *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান* গ্রন্থ থেকে নেওয়া। তিনি ড. মুহম্মদ এনামুল হক *মুসলিম বাঙ্গালা সাহিত্য* ১৯৫৭ (পৃ. ১৩৪) গ্রন্থের প্রসঙ্গ এনেছেন। পৃ. ৯

২২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ১৯৫

# উপসংহার

তুর্কি আক্রমণের কিছুকাল আগে থেকে মুসলমান সাধু এবং সুফি পিরের আগমন ঘটেছে বাংলায়। তারপর থেকেই প্রচলন হয়েছে পির-পুজো। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ দূর হয়ে গিয়েছে। সুফি ধর্মের গুরুবাদ চৈতন্যদেবের ধর্মেও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। সুকুমার সেনের *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৬) গ্রন্থ থেকে জানা গিয়েছে চৈতন্যদেব মুসলমান পিরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর ভেদাভেদ ঘুঁচিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। ফলে মুসলমান সাধুদের কাছে হিন্দুদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বাধা থাকেনি। এরপর জনসাধারণদের মধ্যে পির ভক্তি প্রবেশ করেছে। পির-মাহাত্ম্য কথা পঞ্চাদশ-ষোড়শ শতাব্দী থেকেই জনসমাজে প্রচলিত আছে। তার প্রমাণ পাওয়া যায় সেক শুভোদয়ার পির সেখ শাহজলালের তিনটি ছড়ায় পিরের প্রসঙ্গ থেকে। সপ্তাদশ শতাব্দী থেকে পিরের গাথা কিংবা পিরের ব্রতকথা রচনা শুরু হয়েছে। সুকুমার সেন আরও জানিয়েছেন যে পির সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের ভয়ভক্তি লক্ষ করা গিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তা সুফি মত কিংবা গোঁড়া ইসলাম ধর্মের প্রভাবজাত নয়। যোগী কিংবা তান্ত্রিকদের প্রতি এদেশের জনসাধারণের মনোভাব এবিষয়ে কাজ করেছে।

পির-দরবেশদেরকে নিয়ে কাল্পনিক কেরামতি ও মাহাত্ম্যের কাহিনি জনসাধারণের মনে একটি ভক্তি ও আস্থামূলক স্থান অধিকার করেছে। যেসব পির-দরবেশ বাংলায় ধর্মপ্রচারে এসেছেন তাঁদের অনেকেই এখানে দেহত্যাগ করেছেন। তাঁদের কবরগুলি অসংখ্য দরগায় পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে এই সমস্ত দরগাকে কেন্দ্র করে পিরের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে এবং তাঁরা হিন্দু ইসলাম ধর্মসমন্বয়ী দেবতায় পরিণত হয়েছেন। পির দেবতা এবং পির সাহিত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে আছে। বাংলায় পির-গাজি-বিবির জনপ্রিয়তা এবং তাদের প্রসার মানুষের মধ্যে একসময় বেশ প্রভাব ফেলেছিল। তারফলে সৃষ্টি হয়েছে একাধিক মাহাত্ম্য-কাহিনি কাব্য। এই দিক থেকে কাহিনিগুলিতে সত্যের অপলাপ নেই। একধরণের মানুষ আছে যারা এই সমস্ত দেবদেবীকে ভক্তি এবং ভরসা করতো। তাদেরই উৎসাহে সৃষ্টি হয়েছে এই গ্রন্থ। আরেক ধরণের মানুষ সমাজে ছিল যাদের কাছে পির-গাজি-বিবির কোনো গুরুত্ব ছিল না। এই দুই

ধরণের মানুষের কথাই এই সাহিত্যগুলিতে উঠে এসেছে। শিল্পের খাতিরে কাহিনির মধ্যে প্রবেশ করেছে কল্পনা। সেই কল্পনা আবর্তিত হয়েছে মানুষের দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে।

ষোড়শ শতাব্দীর দিক থেকে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টার ফলে সত্যপির, মানিকপির, গোরাচাঁদ প্রভৃতি বেশ কয়েকজন কাল্পনিক পির-দেবতার এবং তাঁদেরকে নিয়ে পির-সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন গাজি, পির, বিবি লৌকিক দেবতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত লোকদেবতার মাহাত্ম্য-কথা, ধর্মবিশ্বাস, কামনা, বাসনা গানে, ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালি আকারে জনসমাজে প্রচলিত হয়ে আছে। সেগুলিই যখন সাহিত্যে রূপ পেয়েছে তা লৌকিক সাহিত্য হয়ে উঠেছে। লোকের সঙ্গে ঘণিষ্ঠতার কারণে সমসাময়িক সমাজজীবন এই সমস্ত লৌকিক সাহিত্যে উঠে এসেছে।

গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ বিপদে পড়লে অথবা ইহলৌকিক সুখসুবিধা প্রার্থনায় এই সমস্ত দেবদেবীকে স্মরণ করে। তাদের ধারণা অন্তর দিয়ে ডাকলে তাঁরা ভক্তের ডাকে সাড়া দেন এবং মনস্কামনা পূরণ করেন। ভক্তরা কাজ উদ্ধার হলে তাঁদের নামে পুজো কিংবা হাজত দেন এবং সামর্থ্য থাকলে মাহাত্ম্য প্রচারমূলক পালাগান বা গীতিনাট্যের আসর বসান। গৃহের মঙ্গলকামনায় সত্যপিরের পুজো করে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা ব্রতকথা পাঠ করা হয়।

পালাগায়কেরা গুরুশিষ্যপরম্পরায় গানগুলি গেয়ে থাকেন। মূল ঘটনা বা কাহিনি এক রেখে তাঁরা গানের মধ্যে নিজস্বতা দেখান। কোনো কোনো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এই গানের কাহিনিগুলি লিখে রেখেছেন যেগুলি পুথি, পাঁচালি, গান, কেচ্ছা-কাহিনি, জহুরানামা নামে পরিচিত। পাঁচালি পালার ধারাটি মুখ্যত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত এবং কেচ্ছা-কাহিনির ধারাটি প্রধানত পির, গাজি, বিবি মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক হলেও উভয় প্রকার পালাগানই লোকসমাজে ‘পালাগান’, ‘পাঁচাল গান’ বা ‘পিরুলী গান’ বলে এবং এই গানের দলকে পালাগান, পাঁচাল গান বা পিরুলি গানের দল বলে। অখণ্ড চব্বিশ পরগনায় বহু লৌকিক দেবদেবী থাকলেও সবাইকে নিয়ে মাহাত্ম্য-কাহিনি রচিত হয়নি। তবে পালাগায়কগণ ভাঙটা বা টনসা পদ্ধতিতে যে-কোনো লোকদেবতাকে নিয়ে পালাগান গেয়ে আসর বজায় রাখেন।

ষোলো শতকের শুরু থেকে পিরের মাহাত্ম্যমূলক কাব্য লেখা শুরু হয়েছে। সতেরো শতক থেকে অনেক মুসলমান কবি পির বন্দনা করে কাব্য লেখা শুরু করেছেন। দোভাষী পুথি

রচয়িতারা লৌকিক পিরকে অবলম্বন করে কাব্য লেখার পাশাপাশি পির স্তুতি করেছেন। বনবিবি, গাজি-কালু, সত্যপির, মানিকপির, প্রভৃতি মুদ্রিত কাহিনিগুলিতে মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি মধ্যযুগীয় কাব্যগ্রন্থের ছাপ লক্ষ করা গিয়েছে। এছাড়া রূপকথাধর্মী হয়েও ভিন্নস্বাদের গ্রন্থ হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু গ্রন্থ আধুনিক যুগে লেখা হলেও আধুনিকতার কোনো চিহ্ন বর্তমান নেই। এখানে হিন্দু-ইসলাম ধর্মীয় সমন্বয় সাধনের চেষ্টা লক্ষ করা গিয়েছে। এছাড়াও জোর করে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরণের কথা উঠে এসেছে।

কবিগণ গতানুগতিক কাহিনিকে নিজের মতো করে গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। সমসাময়িক সমাজ ও জীবনের বাস্তবনিষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে। বনবিবি, নারায়ণী, দক্ষিণরায়, গাজি, কালুর পরিচিত কাহিনি এখানে মানবিক হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকটি চরিত্রই তাদের আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল। তাঁদের অনেকেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু জীবনের দাবিগুলি মেটাতে অনেক কঠিন মুহূর্তের সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির মধ্যে মানুষের অভাবজর্জর, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত হয়েছে। কবিগণ দক্ষতার সঙ্গে কঠোর বাস্তবচিত্র তুলে ধরেছেন। মানুষের জীবনসংগ্রামের কথা পাঠকের হৃদয়কে তড়ান্বিত করেছে। বাস্তবচিত্র ফুটিয়ে তুলতে কবিদের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণশক্তি, সহানুভূতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশানিরাশা, প্রেমপ্রীতির কথাও উঠে এসেছে।

সার্থক শিল্পের পর্যায়ে গড়ে তুলতে গিয়ে বেশকিছু গানের ব্যবহার লক্ষ করা গিয়েছে। গানগুলির মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষের সম্পর্কের বাস্তবতা চিত্রায়িত হয়েছে। কাহিনি গান করার উদ্দেশ্যে রচিত তা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। গীত, রাগিণী, তাল, দুয়া, ধুয়া এই সমস্ত প্রসঙ্গ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে 'গীত রাগিণী তাল আদ্ধা', 'গীত তাল আদ্ধা', 'গীত তাল আড়া', 'গীত তাল ঠেকা'। 'গীত তাল আদ্ধা' কথা বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। সংলাপের মধ্যদিয়ে কাহিনিগুলির বিশেষত্ব তার ভাষায়, ছন্দে, বিষয়বস্তু, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ, অলংকার প্রয়োগে। সরল প্লটে কাহিনির বিন্যাস করা হয়েছে। সাবলীলভাবে কাহিনির বিন্যাস হয়েছে। দক্ষতার সঙ্গে উপমা ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন যা খুবই প্রশংসনীয়। মিশ্রভাষার দলিল হিসেবে যেমন কাজ করেছে তেমনি সমাজ ও ধর্মসমন্বয়ের ইতিহাসও উঠে এসেছে। একটি ভিন্নস্বাদের সাহিত্য হিসেবে পির-গাজি-বিবিকেন্দ্রিক মাহাত্ম্য-কাহিনিগুলির গুরুত্ব অপরিসীম।

মধ্যযুগীয় সাহিত্য যেমন- শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, আরাকান রাজসভার সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য, চৈতন্যজীবনী সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারত নিয়ে ব্যাপক চর্চা হলেও পির-গাজি-বিবির মাহাত্ম্যকেন্দ্রিক সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক চর্চা হয়নি। এই গবেষণা নিবন্ধে বাংলা সাহিত্যে সেইটুকু খামতি পূরণের চেষ্টা রয়েছে। মধ্যযুগের বিভিন্ন গ্রন্থ কিংবা মান্য সাহিত্যের সঙ্গে এই সমস্ত গ্রন্থের যেমন তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে তেমনি পির-গাজি-বিবি প্রভৃতি গ্রন্থের মধ্যেও তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কাহিনি, চরিত্র, সমাজ, কাহিনি নির্মাণের উদ্দেশ্য, ইতিহাস চেতনা, গানের ব্যবহার, ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার প্রবাদ প্রভৃতি বিষয় উঠে এসেছে। এই সমস্ত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে কাহিনিগুলি কিভাবে শিল্পসম্মত হয়ে উঠেছে এবং এই সমস্ত কাহিনির পরিবেশনগত দিক নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা পত্রটি গ্রহণযোগ্য হলে শ্রম স্বার্থক মনে করব।

## পরিশিষ্ট: শব্দার্থ

পুথিগুলিতে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু, তুর্কি, ভাষার প্রয়োগ দেখা যায়। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি বোঝার সুবিধার জন্য কতিপয় শব্দ ও শব্দার্থ নিম্নে প্রদত্ত হল। পাশাপাশি কোনটি কোন শব্দ এবং কোন পদ তা বর্ণনা করা হল।

অজুদ (ওজুদ), (ফা.)- দেহ

অদুল/ওদুল (আ.)- বিচ্যুতি, বদল, পরিবর্তন, প্রত্যাবর্তন

অধীন লাচার (লাচার-আ. + ফা.)- নিরুপায়, সহায়হীন

অনঙ্গ- দেহহীন, কন্দর্প

অবনী মণ্ডল- পৃথিবী

অস্তরে (ফা.)- চুন-সুরকি-বালির প্রলেপ

আইওদেগের (প্রা. ও ম. বাংলা/আধুনিক বা.)- মহিলাদের, মায়েদের

আঊলাইয়া (আউলিয়া) (আ.)- সিদ্ধ তাপস

আওকত (আওকাত) (আ.)- সময়, অবস্থা, দশা

আওয়াল (আ.)- প্রথম

আওরত (আ.)- মহিলা, নারী, স্ত্রীলোক

আখের (আ.)- শেষ

আগ (প্রা. ও ম. বাংলা )- অগ্রভাগ/অগ্নি

আজিম (আ.)- বিরাট

আটকুড়ি- সন্তানহীনা

আড় (সং.)- অন্তরাল

আদম (আ.)- প্রথম সৃষ্ট মানুষের নাম

আরজ (আ.)- আবেদন, প্রার্থনা

আল ও আওলাদ (আ.)- সন্তান সন্ততি

আলম (আ.)- দুনিয়া

আলমিন (আল-আমিন)- বিশ্বাসী

আশু (আ.)- শীঘ্র

আসরফ (আশরফ) (আ.)- সম্ভ্রান্ত, ভদ্র,

আহ্মার- (আমার)

উখাড়ে (হি.)- উপড়ে ফেলা?

উশুহা (আ.)- আদায়

একিদা (আ.)- ধর্ম-বিশ্বাস

এয়ছা (হি.)- এইরূপ

এলাহি (আ.)- খোদা, ঈশ্বর

ওজর (আ.)- আপত্তি

ওয়ালেদ (আ.)- পিতা

কবুল (আ.)- বিবাহে সম্মতি

কলেমা (আ.)- ইসলামের মূলমন্ত্র

কাফন (আ.)- মুসলমানদের মৃতদেহ আবৃত করবার সাদা কাপড়

কামিনী- কাম যুক্তা নারী

কারার (আ.)- শর্ত, চুক্তি

কালাম (আ.)- বাক্য, বাণী, কথা

কিন্নর- দেবলোকের গায়ক

কুচ- পয়োধর

কুদরত (আ.) ক্ষমতা, বিপুল শক্তি

কুফর/কোফর (আ.) আল্লাহ্‌য় অবিশ্বাসী

কুম্ভ- জলাধার

কেলশে (ক্লেশে)- কষ্ট

কোটাল (ফা.)- শহরক্ষী

খড়ম- কাঠের জুতা

খনন- গর্ত

খয়রাত (আ.)- ভিক্ষা, দান

খশম/খছম (আ.)- স্বামী, পতি

খাতের (খাতির) (আ.)- সম্মান, মর্যাদা

খালেক- সৃষ্টিকর্তা/নাম

খায়েস/খাহেস (ফা.)- ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা

গলুই- নৌকার দুই প্রান্তের সঙ্কীর্ণ স্থান

গাজি (আ.)- আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী ইসলামের জন্য যুদ্ধ করে

গিঠি (সং.-গ্রন্থি, হি.-গিঠা)- গেরো

গিধি- (হি.)- গিধ শৃগাল

গুজার (ফা.)- অতিপাত, যাপন

গোনা (গুনা) (ফা.)- পাপ

গোনাগার (গুনাগার) (ফা.)- পাপী

গোর (ফা.)- সমাধি, কবর

গোসাই (গোঁসাই)- প্রভু

ঘুসন (হি.)- প্রবেশ করানো

চৈয়দ (সৈয়দ) (আ.)- সম্ভ্রান্ত কুলীন

ছওয়ার (সোওয়ার) (ফা.)- আরোহী, অশ্বারোহী

ছাদেক বা সাদেক- সত্যবাদী

ছামান (সামান) (ফা.)- সাজ সরঞ্জাম

ছালাম (সালাম) (আ.)- নিরাপত্তা

ছেপাই (সেপাই) (ফা.)- সৈনিক

ছেফাত- সৈন্য?

ছোববান (প্রা. বাং.)- লেলিয়ে দেওয়া

জনাব (আ.)- সম্মান সূচক সম্বোধন বিশেষ, হুজুর, মহাশয়

জব্বার (আ.)- সর্বশক্তিমান আল্লাহ

জরু (হি.)- পত্নী, স্ত্রী

জলদে (জলদি)- দ্রুত

জহুরা (আ.) অলৌকিক শক্তি

জাকান্দানি (ফা. + হি.)- মৃত্যুকষ্ট

জায়গীর (ফা.)- পুরস্কারস্বরূপ প্রাপ্ত নিষ্কর ভূমি

জালিম (আ.)- জুলুমকারী বা অত্যাচারী

জালেম বাতাজ (আ.)- অত্যাচারী

জাহের বিণ. (আ.)- প্রকাশিত

জিনে (ফা.)- চামড়ার গদি যেটি ঘোড়ার পিঠে পাতে

জিবরিল (আ.)- স্বর্গীয় দূত

জিয়ারত (আ.)- পুণ্যাত্মার কবর বা পুণ্যস্থান দর্শন

জুড়ি (হি.)- দোসর, সাথী

জুদা (ফা.)- পৃথক, ভিন্ন, আলাদা

জুব্বা (আ.)- লম্বা বুক খোলা অঙ্গাঁবরণ বিশেষ

জুম্মা (আ.)- শুক্রবার জোহরের সময় সম্মিলিত নামাজ

জেন্‌দেগী (জিন্দিগি) (ফা.)- জীবিতকাল, আয়ুষ্কাল

জেলাখা (ফা.)- ব্যভীচারী

ঝান্ডা (হি.)- পতাকা, নিশান

ডঙ্কা (হি.)- ঢাক

ডর (হি.,উ.)- ভয়

ডিঙা/ডোঙা (হি.)- সরু নৌকা বিশেষ

তক্ত তাজ (আ.)- তক্ত-সিংহাসন, তাজ-মুকুট

তছবি (তসবি) (আ.)- মুসলমানি জপমালা

তদবির (আ.)- ব্যবস্থা

তামাম (আ.+ফা.)- সমগ্র

তেগ (ফা.)- তলোয়ার

থোড়া (হি.)- অল্প, সামান্য

দরগা (ফা.)- মাজার

দরদ (ফা.)- ব্যথা, বেদনা

দরুদ (আ.)- শান্তিবাণী

দাড়িম (আ.)- মৃতদেহ সৎকার

দাড়ী মাদ্ধি- দড়ি কাছি ?

দাফন (আ.)- মৃতদেহ সৎকার

দারাজ (ফা.)- উদার

দাহপড়ি- জলে পড়ি?

দিগম্বরী- বস্ত্রহীনা

দেউলে- মন্দির

দেও (ফা.)- দৈত্য

দেগার (দীগর) (ফা.)- সত্তা

দেমাগ (ফা.)- অহঙ্কার

দেল (ফা.)- হৃদয়, মন, আত্মা

দেহাজ- শরীর ?

দোওয়া (দোয়া) (আ.)- মঙ্গল কামনা, আশীর্বাদ

দোছরা (দোসরা) (হি.)- দ্বিতীয়

দোজখের (দোজখ) (ফা.)- নরক ?

দোয়াগীর- দয়া দাক্ষিণ্য

দোসর (হি.)- সঙ্গী

দোস্ত (ফা.)- বন্ধু

দোহাই (হি.)- শপথ, দিব্য

দোহার- সহকারী গায়ক

নওশা (ফা.)- বর

নছিব (আ.)- ভাগ্য , কপাল

নফজ (আ.)- নিশ্বাস, জীবন

নফর (আ.)- ভৃত্য

নবি (আ.)- পয়গম্বর, রসুল

নিরজন- জনহীন স্থান

নিরাকার- আকার নেই

নুরনবী  (আ.)- পয়গম্বর

নেকজাত  নেক (ফা.)- পুণ্য, ভালো

পয়গম্বর (ফা.)- বার্তাবাহক

পয়দা (ফা.)- জন্ম, উদ্ভব

পয়াদাসের বয়ান- পয়গম্বরের দাস

পরওয়ারেশ (ফা.)- পালন

পরওার  (ফা.)- প্রতিপালক

পহেলাতে (হি.)- প্রথম, অগ্রে

পাকজাত (পাক- ফা. পবিত্র)- পবিত্র মুসলমান

পাবাতন- অনুগত বা নিষ্ঠাবান ?

পায়ে গেরে- পায়ে পড়ে

পাশরিল- সহ্য করা

পাসবন (পাসবান)- অভিভাবক বা রক্ষক

পিন্দে (পিন্ধে)- পরিধান করে

পিয়ারা- প্রেম, প্রীতি

পিরুলী (ফা.)- বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ শ্রেণি

পীরনি (ফা.)- সিদ্ধা মুসলমান নারী?

প্রতিলিপি- অনুলিখন

ফকিন্নি- সন্ন্যাসিনী

ফকির (আ.)- সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষ

ফজল/ফছল (আ.)- দানশীলতা, অনুগ্রহ

ফরজন্দ (ফা.)- সন্তান

ফরমান  (ফা.)- হুকুম, আদেশ

ফরিয়াদ (ফা.)- প্রার্থনা

ফিকির (আ.)- কার্যোদ্ধারের উপায় চিন্তা

ফুক (ফুকার) (হি.)- চিৎকার

ফেরেস্তা/ফিরিশ্‌তা (ফা.)- আল্লাহর আজ্ঞাবহ

বরকত (আ.)- কল্যানকর ব্যক্তি

বহুলী (বহাল) (ফা.)- নিযুক্ত

বাওগতি- বায়ুর গতি ?

বাখান- বর্ণনা

বারা- নিবারণ করা?

বিছে- পাশে

বিদরে- প্রস্ফুটন

বিদ্যাধর (সং )- জাদুকর ক্ষমতা জানা প্রাণী

বিনোদিনী- রাধা

বিবজ্জিত- সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত

বিবসন- বিবস্ত্র

বিয়াবন (ফা.)- জনমানবশূন্য স্থান

বিরান (আ.)- পরিত্যক্ত, জনমানবহীন

বুজরগান- ফকিরিগান/কপট মুসলমানের গান ?

বুজরগি (ফা.)- অলৌকিক শক্তির ভান।

বেওফা (আ.)- অকৃতজ্ঞ

বেগর (আ.)- ব্যতীত, বিনা

বেহদ্দ (আ.)- অত্যন্ত

বেহেস্ত (ফা.)- মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মাদের বাসস্থান

ভজন- আরাধনা

ভঞ্জিনু- নিরসন করা

ভুজঙ্গ- সর্প

মউত/মওত (আ.)- মৃত্যু

মকছেদ/মকসেদ (আ.)- উদ্দেশ্য

মদিনা (আ.)- মৃত্যু

মদ্দগার- হালাক ?

মমিন বা মুমিন (আ.)- অনুগত মুসলমান যে দৃঢ়ভাবে ইসলামের কর্মকাণ্ড মেনে চলে

মহড়া গায়ক- অগ্রভাগ

মাফিক (আ.)- রুচি অনুযায়ী

মার্দ্দ (মর্দ) (ফা.)- পুরুষ

মাহার- মাস

মাহুত- হাতি আরোহী বা প্রশিক্ষক

মুছীত/মরসেদ/মুরশিদ? (আ.)- মুসলমান ধর্মগুরু

মুনসী (ফা.)- লেখক

মুরত (আ.)- ক্ষমতা, সামর্থ্য

মুরপিদ মুরশিদ-ধর্মগুরু/মুরীদ- ভক্ত, শিষ্য

মুরসিদ (আ. +ফা.)- আধ্যাত্মিক গুরু

মেহেরবান (ফা.)- দয়ালু

মোনাজাত (আ.)- প্রার্থনা, আরাধনা

যাহানেতে- জীবন?

রওজা (আ.)- সমাধি প্রাঙ্গণ

রব্বানা- মেহেরবান প্রভু ?

রাতা- লাল

রামা- সুন্দরী স্ত্রীলক

রোখছত রুখছাত- বোরখা, হিজাব পড়বে কিন্তু মুখ, হাত খোলা রাখতে পারবে। ?

রোয়াক- অঙ্গন বা বাড়ির সামনে খোলা স্থান।

লালানের ছাতে- বসার স্থান?

লাচার (আ.)- নিরুপায়

শরিফ (আ.)- ভদ্র, মহানুভব

শারাব (আ.)- মদ্য, সুরা

শূপে- অর্পন করা

শোকরানা (আ.)- সাহায্যকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখানো

শ্বাপদ- শ্বা (সং)- হিংস্র এবং মাংসাশী প্রাণী

সব্যসাচী- দুই হাতে সমান কাজ করতে পারা ব্যক্তি

সাকার- আকৃতি বিশিষ্ট, মূর্তিবিশিষ্ট

সামান (ফা.)- আসবাবপত্র

সায়েরি (শায়েরী) (আ.)- কবিত্ব, কাব্যচর্চা

সালাম (আ.)- শান্তি, নিরাপত্তা

সাহচার্য- সহায়তা

সুতা- কন্যা

সুপে- অর্পণ করা

সৃজন- সৃষ্টি

সেদ্দতে (আ.)- কষ্ট

স্বঙরন- স্মরণ করা

স্বঙরে- স্মরণ

হরিলা- হরণ করা

হসরেতে (আ.)- দুঃখ বেদনায়

হাকিম (ফা.)- বিচারপতি

হাজত (আ.)- বিচারাধীন আসামীদের পুলিশি পাহাড়ায় রাখা।

হামদ নাত- আল্লাহর প্রশংসা করে বাদ্যবিহীন পরিবেশিত সঙ্গীত?

হাসরে (আ.)- একত্র হওয়া

হুর (আ.)- অতিশয় সুন্দরী

হুশ/হুঁশ (ফা.)- চেতনা

হেকমত (আ.)- সাধারণ জ্ঞান

# গ্রন্থপঞ্জি

## মুখ্য গ্রন্থপঞ্জি

ওঝা, কৃত্তিবাস, *রামায়ণ*, ২০১৬, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

খোদা, নেওয়াজ, *পীর গোরাচাঁদ* (প্রকাশকাল অজ্ঞাত), গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা

মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র (সম্পা.), *কাশীদাসী মহাভারত*, ১৯৪৫, প্রবোধচন্দ্র মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, কলকাতা

সাহেব, আবদুর রহিম, *গাজি কালু ও চাম্পাবতী কন্যার পুথি*, মোহাম্মদ নরুল ইসলাম (প্রকা.) ১৩৯৩, ওসমানিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা

সাহেব, আবদুর রহীম, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি*, মোহাম্মদ নরুল ইসলাম (প্রকা.) ১৩৯৩, গওসিয়া লাইব্রেরী, কলকাতা

সাহেব, মরহুম মুনশী মোহাম্মদ খতের, *বোন বিবী জহুরা নামা* (নারায়ণীর জঙ্গ ও ধোনা দুখের পালা), নুরুদ্দীন আহম্মদ (প্রকা.), ১৩৯৪, গওসিয়া লাইব্রেরি, কলকাতা

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *ভাষা বিচিত্রা*, ২০১৬, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা

আচার্য্য, দেবেশ কুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (আদি ও মধ্যযুগ), ২০০৯, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা

আহমেদ, ওয়াকিল, *বাংলার লোক-সংস্কৃতি*, অক্টোবর ১৯৬৫, বাংলা একাডেমী, ঢাকা-২,

আহমেদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ১৯৮৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

কর্মকার, কালি চরণ, *শিকড়ের খোঁজে* (প্রবন্ধসংকলন), অক্টোবর ২০১৯, রোহিনী নন্দন, কলকাতা

গঙ্গোপাধ্যায়, মুনমুন, *কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল জীবনবীক্ষার আলোকে,* ২০১০, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

গুপ্ত, শ্রীনগেন্দ্রনাথ (সম্পা.) *সত্যপীরের কথা,* ১৩৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ঘোষাল, ইন্দ্রাণী, *সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য,* ২০০৬, পুস্তক বিপণি, দক্ষিণ গড়িয়া

চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ, *দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণরায়,* অক্টোবর ২০০৫, নন্দন মিলন বীথি পল্লী পাঠাগার, হরিনাভি (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

চক্রবর্তী, অমরকৃষ্ণ, *ঘুটিয়ার শরীফের পীর মোবারক গাজী,* ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১, রোহিনী নন্দন, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* ১৯৬১, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার, *সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ,* ২০০৩, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (প্রকাশক), রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী, নতুন দিল্লী

চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপ রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* ২০০৯, রত্নাবলী, কলকাতা

চট্টোপাধ্যায়, সাগর, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার পুরাকীর্তি,* ২০০৫, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার (তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার), কলকাতা

চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ,* ২০১৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

ছাটুই, তুহিনময়, *লৌকিক সমাজ ও সংস্কৃতি দর্পণে পীর-গাজি-বিবি,* ১৯৯৮, পত্রপুট, কলকাতা

ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ, *বাংলার ব্রত* , ১৪১৭, বিশ্ব ভারতী, কলকাতা

দাস, গিরীন্দ্রনাথ, *বাংলা পীর-সাহিত্যের কথা,* ১৯৭৬, শেহিদ লাইব্রেরী, কলকাতা

দাস, শ্রী জ্ঞানেন্দ্রমোহন, *বাংলা ভাষার অভিধান,* ১৯৭৯, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা

নস্কর, দেবব্রত, *চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী: পালাগান ও লোকসংস্কৃতি জিজ্ঞাসা,* ১৯৯৯ দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নস্কর, দেবব্রত, *সুন্দরবন সভ্যতা ও লোকসংস্কৃতি অন্বেষণ,* ২০১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

নস্কর, সনৎকুমার (সম্পা.), *অক্ষয়কুমার কয়াল,* ১৪১৩, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

নস্কর, সনৎকুমার ও রায়, ছন্দা (সম্পা.), *সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি,* ২০০৯, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

পাল, শ্রাবণী, *মাইকেল মধুসূদন দত্ত বীরাঙ্গনা কাব্য,* জানুয়ারি ২০০৫, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

পুরকাইত, মনোরঞ্জন, *মাতলা পারের গল্প,* ২০১৪, দক্ষিণবঙ্গ শিশু সাহিত্য পরিষদ, বারুইপুর

বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পা.), *প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা,* ২০১৪, উর্বী প্রকাশন, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, *বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত,* ১৯৯০, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রী হরিচরণ, *বঙ্গীয় শব্দকোষ,* ১৯৯৬, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *দৌলত কাজি লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না,* ২০১২, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা. লি., কলকাতা

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবনাথ (সম্পা.), *আলাওলের পদ্মাবতী* (২য় খণ্ড), জানুয়ারি ২০১৭, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা

বসু, গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, *বাংলার লৌকিক দেবতা,* ১৩৯৪, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

বসু, শ্রী সত্যেন্দ্রনাথ (সম্পা.), *শ্রীচৈতন্যভাগবত,* (প্র. কাল অজ্ঞাত) দেব সাহিত্য কুটীর,

ভট্টাচার্য, শ্রী সত্যনারায়ণ, *কবি কৃষ্ণরাম দাসের গ্রন্থাবলী,* ২০১১, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

ভট্টাচার্য, আশুতোষ, *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, ১৯৯৮, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন, *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন সমগ্র,* ২০১১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

ভট্টাচার্য, দেবব্রত (সম্পা.), *দক্ষিণেশ্বর দক্ষিণরায়-অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তী,* অক্টোবর ২০০৫, দে বুক স্টোর, কলকাতা

ভট্টাচার্য, পণ্ডিত শ্যামাপ্রসাদ (সম্পা.), শ্রীমদ্ভাগবত গীতা, (প্রকাশকাল-অজ্ঞাত), নির্মল বুক এজেন্সী, কলকাতা

ভট্টাচার্য, বিজনবিহারী (সংকলিত ও সম্পা.), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, মনসামঙ্গল, ২০১৫, সাহিত্য অকাদেমি, কলকাতা

ভট্টাচার্য, হংসনারায়ণ, *হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ,* ১৯৬০, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

ভৌমিক, তাপস (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা,* জানুয়ারি ২০১৩, কোরক, কলকাতা

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, *সাহিত্য ও সমালোচনার রূপ-রীতি,* ১৪২৫, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

মণি, কালীপদ (সম্পা.), *বাদাবনের পাঁচালি,* ২০০৭ , প্রিয়নাথ প্রকাশনী, দ. ২৪ পরগনা

মণ্ডল, কৃষ্ণকালী, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী ও মূর্তিভাবনা* (প্রথম পর্ব), জানুয়ারি ২০০১, নব চলন্তিকা, কলকাতা

মন্ডল, সুজিত কুমার (সম্পা.), *বনবিবির পালা,* ২০১০, গাঙচিল, কলকাতা

মণ্ডল, বরেন্দু (সম্পা.), *দ্বীপভূমি সুন্দরবন,* ২০২০, বিশাখা আর্ট প্রেস, কলকাতা

মণ্ডল, ভবশেখর (সম্পা.), *অভিমুখ সুন্দরবন,* ২০২০, অভিমুখ প্রকাশনী, কোদালিয়া (দক্ষিণ ২৪ পরগনা)

মুখোপাধ্যায়, সুখময় (সম্পা.), *চণ্ডীমঙ্গল পরিক্রমা,* জুলাই ২০০৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, সুখময় ও গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দুসুন্দর (সম্পা.), *ময়মনসিংহ-গীতিকা,* জানুয়ারি, ২০১০, ভারতী বুক স্টল, কলকাতা

মুখোপাধ্যায়, তরুণ, *হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বিরচিত বৃত্র-সংহার,* জুন ২০১০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা

যাকারিয়া, আবুল কালাম মোহাম্মদ (সম্পা.), *বাঙলা সাহিত্যে গাযী কালু ও চাম্পাবতী উপাখ্যান,* ১৯৯২, সারস্বতকুঞ্জ, কলকাতা

রায়চৌধুরী, শক্তি (সম্পা.), *অমরকৃষ্ণের অমরসৃষ্টি ও জীবন* (প্রত্ন পুথি গবেষক অমরকৃষ্ণ চক্রবর্তীর জন্ম শতবার্ষিকী সংকলন), ১৫ আগষ্ট ২০২১, রোহিনী নন্দন, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

লশকর, ধূর্জটি, *বাদাবনের বংশধর,* ২০১৬, দেবলা প্রকাশনী, কলকাতা

লশকর, ধূর্জটি, *সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ,* জানুয়ারি ১৯৯৭, শ্যামলী পাবলিকেশন, কলকাতা

শ', রামেশ্বর, *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা,* ১৯৯৬, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

নস্কর, সনৎকুমার, *অক্ষয়-সঞ্চয়,* ১৪১৩, আত্মজা, কলকাতা

সমাদ্দার, শেখর, *দুই শতাব্দীর বাঙালির নাট্যচিন্তা,* ২০২০, এবং মুশায়েরা, কলকাতা

সরকার, পবিত্র, মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ, দাশগুপ্ত, প্রশান্তকুমার (সং), *আকাদেমি বানান অভিধান,* জানুয়ারি ২০০৯, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা

সরকার, রত্না, *বাংলা প্রবাদ প্রবচন,* ২০০১, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ, কলকাতা

সরকার, শ্যামাপ্রসাদ, *সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য,* ২০০৬,

সেন, সুকুমার, *ইসলামি বাংলা সাহিত্য,* ১৯৯৩, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা

সেন, প্রবোধচন্দ্র, *নতুন ছন্দ পরিক্রমা,* ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা

সেন, সুকুমার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস* (দ্বিতীয় খণ্ড), ২০০৭, আনন্দ, কলকাতা

হক, কাজী রফিকুল, *বাংলা ভাষায় আরবী ফার্‌সী তুর্কী হিন্দী উর্দু শব্দের অভিধান*, ২০০৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা

হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা* (প্রথম খণ্ড), ২০০১, চতুর্থ দুনিয়া, কলকাতা

হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার যাত্রাগান: ইতিহাস ও আলোচনা* (প্রথম খণ্ড), ২০১১, প্রিয়নাথ প্রকাশনী, সোনারপুর

হালদার, বিমলেন্দু, *দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কথ্যভাষা ও লোকসংস্কৃতির উপকরণ* (দ্বিতীয় খণ্ড), জানুয়ারি ২০১৯, প্রিয়নাথ প্রকাশনী, কলকাতা (সোনারপুর)

## পত্রিকাপঞ্জি

### মুখ্য পত্রিকা

নাগ, ড. রমাপ্রসাদ ও জুলফিকার, এন, *দীপন*, (সত্যপীর, পঞ্চদশ বর্ষপূর্তি সংখ্যা) অক্টোবর ২০১২, লিটল ম্যাগাজিন সংগ্রহশালা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

### সহায়ক পত্রিকাপঞ্জি

পাল, শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র (সম্পা.), *ভারতীয় লোকযান*, ১৯৬৩, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, কলকাতা

ভৌমিক, তাপস, *কোরক সংকলন* (পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা), ২০১৩, বাগুইআটি (কলকাতা)

মণ্ডল, নাজিবুল ইসলাম (সম্পা.), *সমকালের জিয়নকাঠি* (সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড) ২০১০, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা

হালদার, বিমলেন্দু, *নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র* (জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি সংখ্যা- ৬), ২০১৩

# বৈদ্যুতিন তথ্য


1. https://www.upgradeyourself.in/2021/12/blog-post_72.html?m=1
   https://bnglapedia.org

2. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%82%E0%A6%B2%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9A%E0%A7%8D%E0%A6%9B%E0%A6%BE

3. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B0#:~:text=%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B6%E0%A7%87%E0%A6%B7%E0%A6%9C%E0%A7%8D%E0%A6%9E%E0%A6%B0%E0%A6%BE%20%E0%A6%AE%E0%A6%A8%E0%A7%87%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A7%87%E0%A6%A8%20%E0%A6%AF%E0%A7%87%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AE,%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%9B%E0%A7%81%20%E0%A6%AE%E0%A7%81%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A6%93%20%E0%A6%8F%E0%A6%87%20%E0%A6%AA%E0%A7%82%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A6%9F%E0%A6%BF%20%E0%A6%95%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A5%A4

4. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AF%E0%A6%BC%E0%A6%A3

5. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Satya_Pir

6. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%A4%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B0

7. https://bn.m.wikisource.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A7%87%E0%A6%96%E0%A6%95:%E0%A6%AB%E0%A6%95%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%97%E0%A6%B0%E0%A7%80%E0%A6%AC%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%B9

8. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pir_Gorachand

9. https://drishtibhongi.in/2023/03/16/north-24-parganas-haroa-pir-gorachand-mela/

10. https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/goraachand-pir-and-chandraketugarh-fall

11. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AA%E0%A7%80%E0%A6%B0 _%E0%A6%97%E0%A7%8B%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%9A%E0%A6%BE%E0%A6%81%E0%A6%A6

12. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF

13. https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/local-people-want-developed-museum-1.147451?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR3PgSw1mmi8q-U2oAA19s9EfOz4gcuMv02VFe79n9ofnPMFsV_gbluVUJ0_aem_AayP1gGgYtRCThVsm-ytWOhEVqH7rGeK8e1cvdJAFfxYtnQzBCt7Wj2cNMiHWN69qvnyeizA-oMXrO6tFywwstrW

14. https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF

15. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:8c76bc36-2641-4590-90d8-99b5b87ff929

16. https://jagobangla.in/myths-of-gods-and-goddesses-of-the-sundarbans-symbols-of-harmony/

17. https://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%B0_%E0%A6%9C%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%B0%E0%A6%A8%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BE

18. https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:AP:f01525b6-92fa-4dc7-86fe-0a074ddeabb5

19. https://www.anandabazar.com/culture/book-reviews/review-of-book-on-sundarban/cid/1285087

20. https://daakbangla.com/2021/02/aranyer-pnachali/

21. https://www.bongodorshon.com/home/story_detail/old-gausia-library-in-kolkata

22. https://bangla.staycurioussis.com/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF/

23. https://bn.m.wiktionary.org/wiki/%EO%A6%B9%EO%A6%BE%EO%A6%AE%EO%A6%A6

24. https://www.bengaliguidence.com/2021/06/blog-post_5.html?m=1

25. https://www.banglasahitto.in/2019/01/Prothom-Mudrito-Monosa-Mangal-Banglasahitto.html

26. https://steemit.com/life/@powerupme/5gv78t

27. https://www.dailynayadiganta.com/daily/619546/%E0%A6%A4%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%8B%E0%A6%9F-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%9C-

28.https://bn.m.wiktionary.org/wiki/%E0%A6%B9%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%A6

29.https://bn.m.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B6%E0%A7%80%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE_%E0%A6%A6%E0%A6%BE%E0%A6%B8

30. https://www.bengaliguidence.com/2021/06/blog-post_5.html?m=1

31. https://www.banglasahitto.in/2019/01/Prothom-Mudrito-Monosa-Mangal-Banglasahitto.html

32.https://ebin.pub/satya-pirer-katha.html

33.https://archive.org/download/in.ernet.dli.2015.338189/2015.338189.Puthi - parichay-.pdf

## সাক্ষাৎকার

দেবপ্রসাদ ঘোষ (নায়েক পার্টি), আটঘরা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স-৬০, ২০১৭

সুধীনকুমার মণ্ডল, পালাগায়ক, বেগমপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স- ৮০, ২০১৭

গোষ্ঠ মণ্ডল, পালাগায়ক, আটঘরা (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স-৬৩, ২০১৮

অনিল হাজরা, পালাগায়ক, বেগমপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স-৭০, ২০১৮

অন্নপূর্ণা মল্লিক, গৃহকর্ত্রী, নন্দনপুর (পূর্ব বর্ধমান), বয়স-৮৭, ২০২০

ফাল্গুনীকুমার নস্কর, বেগমপুর (দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা), বয়স-৭২, ২০২০

## সহায়ক গবেষণাপত্র


দাস, অরুণাভ, *শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের ভুবন ও তার শিল্পরীতি*, ২০১৭, পিএইচ.ডি (বাংলা বিভাগ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

নস্কর, রত্নমালা, *বোনবিবি জহুরা নামা কন্যার পুথি: বৈয়াকরণিক পর্যালোচনা,* মে ২০১৭, এম. ফিল (বাংলা বিভাগ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

রায়, প্রদীপ, *স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা কথাসাহিত্যে উত্তরবঙ্গের জনজাতিদের (রাভা, মেচ, টোটো, তামাঙ) জনজীবন, লোক ঐতিহ্য: বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন*, ২০২১, পিএইচ.ডি (বাংলা বিভাগ), যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

# চিত্রপঞ্জি

চিত্র- ১ পালাগায়কের দল (আটঘরা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, ২০১৭)

চিত্র- ২ পালাগায়ক সুধীনকুমার মণ্ডল (দেবপ্রসাদ ঘোষের গৃহ প্রাঙ্গণ, আটঘরা, ২০১৭)

চিত্র- ৩ সত্যপিরের থান (আরামবাগ-পিরতলা, হুগলি)

চিত্র-৪ সত্যপিরের নামে মাঙ্গন (আরামবাগ, হুগলি)

চিত্র-৫ মাথায় সত্যপিরের চামর ঠেকিয়ে আশীর্বাদ (আরামবাগ, হুগলি)

চিত্র-৬ নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের বারা মূর্তি (বেগমপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)

চিত্র-৭ নারায়ণী ও দক্ষিণরায়ের পুজো (বেগমপুর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)

## চিত্রপঞ্জির তথ্যসূত্র

১। গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ। কৃতজ্ঞতা- দেবপ্রসাদ ঘোষ, খেত্রসমীক্ষা ২০১৭

২। পূর্বোক্ত

৩। গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ। খেত্রসমীক্ষা- ১৭ ডিসেম্বর, ২০২২

৪। গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ। গৃহপ্রাঙ্গণ (হুগলী), ২২ জানুয়ারি, ২০২৩

৫। পূর্বোক্ত

৬। গবেষকের নিজস্ব সংগ্রহ। চিত্র সৌজন্য- ফাল্গুনীকুমার নস্কর, ২০২৩

৭। পূর্বোক্ত